বর্ষ-সূচী।

(১৩০৬)

আহিরিণী।

আষাঢ়ের নব ঘন করী-শিশু প্রায়
ক্ষুদ্র শুণ্ডে গিরিদেহ করিছে চুম্বন;
নব বরষার স্নিগ্ধ নীলিম শোভায়
জননী করিণী ভ্রমে আদর-লেহন!
পদতলে আঁকি বাঁকি সিত সিকতায়
নদীরেখা ধীরে গ্রামপ্রান্তে বহি যায়!

নদীপারে প্রসারিত নবদুর্ব্বাদলে
বিস্তৃত প্রান্তর শেষে গ্রাম দেখা যায়;
তাল খর্জ্জুরের কুঞ্জ, শীর্ষ ভেদি তার
উন্নত মন্দির-চূড়া নিজ মহিমায়!
দ্রুত লঘু চরণেতে সে দেউল পানে
দুগ্ধ-ভাণ্ড শিরে বালা ধায় এক মনে।

সে বাল-বিধবা, পিতৃহীনা আহিরিণী
যোগায় সেবার দুগ্ধ নিত্য সে মন্দিরে;
গৃহে অন্ধ মাতার সে যষ্টি-স্বরূপিণী,
সেবে তাঁরে আর দুটী সবৎসা গাভীরে।
সেই ব্রতে ভোর তার ক্ষুদ্র প্রাণ মন,—
আপন অজ্ঞাতসারে আত্মবিসর্জ্জন!

উৎসাহ।

প্রতিবাসী বিপত্নীক আহীর যুবক
চাহে বরিবারে এই বিধবা যুবতী ;
অন্ধ মাতা আগ্রহেতে করে অনুরোধ,—
তরুণী না মানে কোন মিনতি যুকতি !
পরিণয়ে মাতৃসেবা-বিঘ্ন হবে তার—
তার চেয়ে ধর্ম্ম-হানি কিবা আছে আর ?•

দিন যায়, মাস যায়, বর্ষ চলি যায়,
দুগ্ধ যোগাবার বেলা নিত্য যায় চলি ;
গোপন মাঠের ধারে, নদীর সৈকতে
মুগ্ধ আঁখি চায় যুবা পরাণ ব্যাকুলি,
দৃক্‌পাতো নাহি করি আসে যায় বালা,
পাষাণে খোদিত যেন লতিকা সরলা।

আষাঢ়ের নবমেঘ করিল পলকে
সুনীল শিখরে ঘন কালিমা সঞ্চার ;
গোপিনী না প্রবেশিতে মন্দির-প্রাঙ্গণ
মেঘমন্দ্রে, অন্ধকারে ভরিল সংসার !
তমাল দ্রুমের ছায়ে, তামসী দিবায়,
গোবিন্দের অভিসার মনে পড়ি যায় !

ঘন বর্ষণের মাঝে ফিরিল যুবতী
সিক্ত বস্ত্রে আলু থালু কবরী-বন্ধন ;
ধায় বেগে নদীতীরে, যেতে হবে পারে
গৈরিক প্রবাহ ধারা না হ'তে পতন।
কি হবে উপায় হায়, আসে যদি বাণ !.
অনশনে জননীর বাহিরিবে প্রাণ !

কিন্তু আসিয়াছে বন্যা। ভরিয়া দুকূল
মহা কোলাহলে ছুটি চলে প্রবাহিণী ;
তীরলগ্ন শিলাতলে ঘূর্ণিত সলিলে
শত জলদের রবে জাগে প্রতিধ্বনি !
কে শুনিবে অভাগীর করুণ-রোদন,
মাতৃ-বৎসলার তীব্র হৃদয়-বেদন !

এই ভাবে কাটে দিন। শ্রান্ত গোপাঙ্গনা
করলগ্ন কপোলেতে বসি শিলাতলে ;
সন্ধ্যার তরল ছায়া আসিছে ঘনায়ে
স্তিমিত প্রকৃতি মুখ আবরণ ছলে !
কদাচিৎ কেকারব পশিছে শ্রবণে,
মত্ত দাদুরীর রোল উঠিছে সঘনে !

হেনকালে ভেলা লয়ে কে আসিল পারে ?
মাথালিতে ঢাকা তার নয়ন বদন ;
বিকৃত অথচ ক্ষীণ কণ্ঠে সে কাণ্ডারী
ডাকে——"কে গো পারে যাবি মায়ের সদন ?"
চমকি উঠিল বালা,—নাহিক সংশয়
নিজে গোপীনাথ আসি দিলেন অভয় !

বিনা বাক্যে, বিনা দানে কে করিল পার ?
সসম্ভ্রমে গোপকন্যা করে প্রণিপাত।
"অবলা অনাথা প্রভু, কি বুঝিবে ছলা,
কি দানে তুষিতে পারে জগতের নাথ।"
কাণ্ডারী কহিছে——"ধনি, এক দান চাই,
পার যদি বলি, নাহে ঘরে ফিরি যাই।"

কহে বালা——"প্রভু তুমি বাঁচাইলে আজি
অনশন-মৃত্যু হতে জননী-জীবন;
কি অদেয় আছে মোর,—আমি কাঙ্গালিনী?"
হাসিয়া যুবক কহে "কর পাণিদান।"
লাজে অবনতমুখী, মৌনেতে সম্মতি!
পরে তারা হ'য়েছিল সুখের দম্পতী!

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

দেশ ভ্রমণ।

একবার একজন খাঁটী কলিকাতাবাসী নব্যযুবক পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণ করিবার জন্য বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন। তাঁহার তেইশ বৎসরব্যাপী দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় তিনি ওদিকে হাবড়ায় ষ্টেসন, এদিকে বেলিয়াঘাটা; আর সে-দিকে কালিঘাট এবং ঐদিকে চিৎপুরের খাল দেখিয়াছিলেন। এত বৃহৎ দীর্ঘ-প্রস্থ চৌহদ্দি-বিশিষ্ট মহাভূভাগ তাঁহার দৃষ্টতঃ পৃথিবী; অবশিষ্টটা Geography নামক মহাভীতিজনক শাস্ত্র বিশেষের অন্তর্গত; এবং প্রবেশিকা পরীক্ষারূপ কাঁটার বেড়া ডিঙ্গাইয়াই তিনি উপরোক্ত মহাশাস্ত্রখানি পুরাতন পুস্তকের দোকানে দাখিল করিয়া দিয়াছিলেন। এ হেন অভিজ্ঞ ব্যক্তি-প্রবরের দেশভ্রমণে বাহির হওয়া ভারত-ইতিহাসের না হউক, বঙ্গদেশের ইতিহাসের একটী অতি স্মরণীয় ঘটনা হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমার ন্যায় একজন ক্ষুদ্রব্যক্তি ব্যতীত কোন ঐতিহাসিকই এই মহাব্যাপারের একটা নোট পর্য্যন্তও রাখেন নাই। অতএব সাধারণের অবগতির জন্য, এবং ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখকগণের স্মৃতিশক্তির উন্মেষের জন্য আমি এই অভূতপূর্ব্ব দেশভ্রমণ কাহিনী যথাযথ লিপিবদ্ধ করিলাম।

যে দিন কলিকাতা ত্যাগ স্থির হইল, তাহার ১৫ দিন পূর্ব্ব হইতেই বন্ধুবর ভাবিয়া অস্থির। কি কি দ্রব্য সঙ্গে লইতে হইবে, কয়খানি কাপড়

চাই, বিছানা কতগুলি লইতে হইবে, সঙ্গে খাবার জিনিস কি কি লইয়া যাওয়া দরকার, এই সব অত্যাবশ্যকীয় প্রশ্ন এবং সুগম্ভীর ভাবে অনতিদীর্ঘ নোটবুকে সেগুলি যথাযথ লিখিয়া রাখা হইতে লাগিল। দিন নাই, রাত্রি নাই, সময় নাই, অসময় নাই, যখন আমার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে, তখনই সেই নোটবুক বাহির হইয়াছে এবং প্রায় এক ঘণ্টা, কোন কোন দিন তাহা অপেক্ষাও অধিক সময় ধরিয়া তাহার সমস্ত প্রশ্নের জবাব লিখিয়া দিতে হইয়াছে। আর সেই সমস্ত প্রশ্নের উপর আবার জেরা; আমি ত একেবারে হয়রান্ হইয়া গিয়াছিলাম। তবুও যাহা হউক মনে একটা বিশ্বাস ছিল যে, বন্ধুবর পূর্ব্ববঙ্গে ভ্রমণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইয়াই প্রকাণ্ড এক খানি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিবেন, এবং তাহাতে পাঠক সাধারণের না হউক কাগজওয়ালা, প্রেসের স্বত্বাধিকারী ও দপ্তরী মহাশয়ের কিছু লাভ নিশ্চয়ই হইবে; এবং সংবাদপত্রের সম্পাদক মহোদয়গণ দুই এক মাস ক্রমাগত অনেক তোষামোদ শুনিতে পাইবেন।

সে কথা থাক, বহুকষ্টে অনেক পরিশ্রমে, বড়বাজার, চিনেবাজার, রাধাবাজার, চাঁদনী, বহুবাজার প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া বন্ধুবর তাঁহার ভ্রমণের সমস্ত সরঞ্জাম সংগ্রহ করিলেন। আমি কিন্তু তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, আমাকে যদি পশ্চিম কি দক্ষিণ ভারতে যাইবার জন্য এই দণ্ডে অনুরোধ আসে, তাহা হইলে আমি মণিব্যাগে কয়েকটী টাকা লইয়া এবং আলনা হইতে ঐ উড়নী চাদর এবং একখানি পিচের ছড়ি লইয়া এখনই বাহির হইতে পারি; এবং নিরাপদে অক্লেশে সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া যথাসময়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিতে পারি। বন্ধুবর একথা মোটেই বিশ্বাস করিতে চান না, বিভুঁই বিদেশে কোন জিনিসের দরকার হইলে, মনে কর একখানি সাবান দরকার, তখন কোথায় তাহা পাওয়া যায়? বলিতে চাহিয়াছিলাম, এত যার জঞ্জাল, যার এতগুলি উনকুটি চৌষট্টি দরকার, তাহার পক্ষে ক্ষুদ্র গৃহকোণ এবং আফিসের চেয়ারই প্রশস্ত স্থান। কিন্তু বন্ধুবরকে সে কথা বলা তখন উচিত মনে করি নাই। যাহা হউক নির্দ্দিষ্ট দিনে তাঁহাকে লইয়া শিয়ালদহে গোয়ালন্দ মেলের সময়ে গেলাম। তাঁহার সঙ্গের লটবহর দেখিলে সহসাই মনে হয়, যেন তিনি বৎসর দুই তিনের জন্য কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইতে-

ছেন। সঙ্গে পুরাতন ভৃত্য রামকৃষ্ণ। আমি জানিতাম বন্ধুবর একাকীই যাইবেন, কিন্তু ষ্টেসনে রামকৃষ্ণের বেশভূষা দেখিয়াই বুঝিলাম, রামকৃষ্ণ তাঁহার সঙ্গী।

নিজের জন্য একখানি দ্বিতীয়শ্রেণীর এবং রামকৃষ্ণের একখানি মধ্যম শ্রেণীর রিটার্ণ টিকিট কিনিয়া তাঁহারা ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে গেলেন। বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি একটু পিছাইয়া পড়িলাম, এবং ঢাকার একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর রিটার্ণ টিকিট কিনিয়া বন্ধুবর যে গাড়ীতে জিনিস পত্র উঠাইয়া বসিয়াছেন, ধীরে ধীরে যাইয়া আমিও সেই গাড়ীতে বসিলাম। তিনি তখনও জানেন না যে, আমিও তাঁহার সঙ্গী, তিনি মনে করিলেন প্ল্যাট্‌ফরমে দাঁড়াইয়া থাকা কষ্টকর মনে করিয়াই আমি গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছি। পাঁচ মিনিটের ঘণ্টা পড়িল, আমি তখনও স্থিরভাবে গাড়ীতে বসিয়া। এমন সময়ে একটী বাবু একজন স্ত্রীলোক সঙ্গে তাড়াতাড়ি আসিয়া আমাদের গাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। এতক্ষণ পর্য্যন্ত এ গাড়ীতে অপর কেহই উঠেন নাই। বাবুটীর সঙ্গেও জিনিসপত্র নিতান্ত কম ছিল না; কুলীরা তাড়াতাড়ি সেগুলি গাড়ীর মধ্যে তুলিয়া দিল, এবং শেষে বাবুর সঙ্গে পয়সা লইয়া মহা গণ্ডগোল বাধাইয়া দিল। বাবুও প্রত্যেককে দুই পয়সার বেশী কিছুতেই দিবেন না, তাহারাও দুই আনার কম ছাড়িবে না। একবার মনে হইল মধ্যস্থতা করিয়া গোলমাল মিটাইয়া দিই, কিন্তু আবার নানা কথা ভাবিয়া নিরস্ত হইলাম। আমাদিগকে আর মধ্যস্থতা করিতে হইল না; বাবুর সঙ্গিনী স্ত্রীলোকটীই অতি অল্প আয়াসে গোলমাল নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন। বাবুর মণিব্যাগটী কাড়িয়া লইয়া স্ত্রীলোকটী তাহার মধ্য হইতে একটী টাকা লইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলেন। কুলীগণ সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল। বাবু যেন কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু রমণী তাঁহাকে বাধা দিয়া পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় বাবুকে বলিলেন "কুলী মজুরের সাথে দুইডা পয়সা লইয়া ঝগরা করিতে লজ্জা হৈল না?" বাবু আমাদের দিকে চাহিয়া রমণীর নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন।

শেষ ঘণ্টা বাজিতে দেখিয়া বন্ধুবর আমাকে শীঘ্র নামিতে বলিলেন। আমি বলিলাম "বাঃ! তুমি ত বেশ লোক। ঢাকায় যাইব বলিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর রিটার্ণ টিকিট কিনিয়াছি, তুমি বল কি না নামিয়া যাও।" বন্ধু ত

আমার কথা শুনিয়া অবাক্! সঙ্গে জিনিসপত্র নাই, দ্বিতীয় বস্ত্রখানি পর্য্যন্ত নাই, অথচ আমি তাঁহার সঙ্গে ঢাকা যাইতেছি, একথা তিনি মোটেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; মনে করিলেন আমি তামাসা করিতেছি, এখনই নামিয়া যাইব। কিন্তু গাড়ী ছাড়িল, তবুও আমি বসিয়া রহিলাম। তখন বন্ধু বুঝিলেন আমি সত্যসত্যই তাঁহার সঙ্গী। তিনি ত ভাবিয়া অস্থির; আমার নানাপ্রকার অসুবিধা হইবে মনে ভাবিয়াই তিনি বিশেষ চিন্তিত হইলেন। আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম যে, তাঁহার দুইটী ষ্টীলট্রাঙ্কে যে কাপড় চোপড় আছে, তাহাতে ঢাকা কেন, আমাদের দুইটী প্রাণীর ভূ-প্রদক্ষিণ চলিতে পারে। বিছানার বিশেষ দরকার নাই। বিনা বিছানায়, ভূমিশয্যায়, অনাবৃত মস্তকে, অনন্ত বিস্তৃত নক্ষত্রখচিত নীলচন্দ্রাতপতলে অনেক বিনিদ্র রজনী আমার অতিবাহিত হইয়াছে। তরুমূলে আশ্রয় পাইলে যে সুখশয্যা মনে করিত, রেলগাড়ীর দ্বিতীয় শ্রেণীর গদিমোড়া আসন তাহার নিকট সম্রাটের শয়ন শয্যা। তাহার পর পকেট হইতে ব্যাগটী বাহির করিয়া তাহার মধ্যে দশটী টাকা আছে দেখাইয়া বলিলাম, 'অবশিষ্ট অসুবিধা এই কয়েকখণ্ড রৌপ্যের সাহায্যে দূর হইবে।'

আমি তাহার সঙ্গী হইব একথা পূর্ব্বে বলিলে, তিনি তাহার বন্দোবস্ত করিতেন, অর্থাৎ আরও দুই তিনটী লগেজ বাড়িত, বিশেষ উৎকণ্ঠার সহিত তিনি এই কথাই বারম্বার বলিতে লাগিলেন; যাহা হউক, গতস্য শোচনা নাস্তি, এই ঋষিবাক্যে নির্ভর করিয়া তিনি নিরস্ত হইলেন।

এতক্ষণ আর গাড়ীর মধ্যস্থ তৃতীয় ভদ্রলোকটী ও তাঁহার সঙ্গিনীর দিকে চাহিবার আমাদের অবকাশ ছিল না, তাঁহাদেরও ছিল না। তাঁহারা দুইজনে জিনিসপত্র সমস্ত বেঞ্চের নীচে ও অন্যান্য স্থানে গোছাইয়া রাখিতেই এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলেন। গাড়ী যখন সিয়ালদহ ছাড়িয়া খানিকদূর গিয়াছে, তখন তাঁহারা কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহারা কোথায় যাইবেন, কি বৃত্তান্ত প্রভৃতি জানিবার জন্য আমাদের বিশেষ আগ্রহ হইল। কিন্তু বর্ত্তমানক্ষেত্রে তাঁহারই জিজ্ঞাসা করা উচিত; কারণ তাঁহার সঙ্গে রমণী; আমরা দুইটী অপরিচিত যুবক তাঁহাদের সঙ্গে এক প্রকোষ্ঠের আরোহী; এ অবস্থায় আমাদের সঙ্গে আলাপ করা তাঁহারই কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু তাঁহার

সে প্রকার আগ্রহ দেখিলাম না, রমণীও এতক্ষণ গাড়ীর জানালাতে মুখ দিয়া প্রকৃতির শোভা বা তেমনি কিছু দেখিতেছিলেন।

আমরা সকলেই নির্ব্বাক্! বোধ হয় রমণীর এ ভাব ভাল লাগিল না, তাই তিনি একটু বড় গলায় তাঁহার সঙ্গীকে বলিলেন, "তুমি কেমন বেটা-ছেলে; বাবুদের সঙ্গে পরিচয় কর না? তোমার মত মেয়েমুখো ত দেখি নাই?" এমন মধুর বচন শুনিয়া আমাদের মনে খট্‌কা লাগিল। শয়নকক্ষে স্বামীস্ত্রীতে এরকম কথাবার্ত্তা মন্দ নহে, বোধ হয় অনেকের হইয়াও থাকে। কিন্তু গাড়ীর মধ্যে, দুইজন অপরিচিত ভদ্রলোকের সম্মুখে একজন ভদ্র-গৃহস্থের বধূ—এমন ভাবে, এমন ঢঙ্গে কথা বলিতে পারেন, তাহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না। আমার মনে হইল রমণী কুলবধূ নহেন, বন্ধুবরের কর্ণ-মূলে আমার এই সন্দেহ অনুচ্চস্বরে প্রবেশ করাইয়া দিলাম। তিনিও তাহাই স্থির করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের কথাবার্ত্তা বলিবার স্পৃহা একেবারেই কমিয়া গেল। পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণে সঙ্গী ভালই জুটিল!

এদিকে রমণীর উপদেশে বাবুটী আমাদিগের নিকটে আসিয়া বসিলেন, এবং আমরা কোথায় যাইব জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববঙ্গের রীতি অনুসারে "নিবাস" "আপনারা" প্রভৃতি প্রশ্ন হইল। বন্ধুবর এ প্রকার প্রশ্নের অর্থই বুঝিতে পারিলেন না, আমি তাঁহার সকল কথারই জবাব দিলাম। এবং অতি সংক্ষেপে তাঁহার পরিচয় লইলাম। বাবুটী ঢাকাজেলার অন্তর্গত একটী পল্লীগ্রামের জমিদার, বিষয় কার্য্য উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, এখন ঢাকায় যাইতেছেন, ঢাকায় তাঁহার বাসা আছে। আমরা ঢাকায় বেড়াইতে যাইতেছি শুনিয়া তিনি খুব আনন্দিত হইলেন এবং সেখানে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন, এ কথাও জানাইয়া দিলেন।

বোধ হয়, পুরুষপুঙ্গব আলাপটী ভাল করিয়া জমাইতে পারিলেন না দেখিয়া তাঁহার সঙ্গিনী আর একটু অগ্রসর হইয়া বসিলেন, এবং "বাবুরা ইতিপূর্ব্বে বুঝি আর ঢাকায় আইসেন নাই" বলিয়া আমাদের উপর প্রশ্ন-বর্ষণ করিলেন। বন্ধুবর জবাব দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু আমি গা টিপিয়া নিষেধ করায় তিনি চাপিয়া গেলেন; রমণীর প্রশ্নের কোন উত্তর দেওয়া হইল না। কিন্তু তিনিও ছাড়িবার পাত্র নন, "শোন্‌ছেন নি" বলিয়া আবার

প্রশ্ন করিলেন। তখন ঈষৎ বিরক্তির স্বরে আমি একটা "উঁহু" দিয়াই সারিয়া দিলাম। রমণীও বেগতিক দেখিয়া রণে ভঙ্গ দিলেন। স্ত্রীলোকের অশেষ গুণের মধ্যে একটা প্রধান গুণ এই যে, তাহারা পুরুষের কথার ভাবেই তাহাদের মন অনায়াসে বুঝিতে পারে।

কথাবার্ত্তার সুবিধা হইল না দেখিয়া, তাঁহারা উভয়েই বিছানা পাতিয়া শয়নের ব্যবস্থা করিলেন। আমরা সেরাত্রে নিদ্রা যাইব না স্থির করিলাম; দুইজনে গল্প করিয়াই রাত্রি কাটাইব। মনে করিয়াছিলাম, আজ রাত্রে আর এ গাড়ীতে অপর কেহ উঠিবে না। কিন্তু আমাদের সে আশা বৃথা হইল। বগুলাষ্টেশন হইতে গুটিতিনেক ভদ্রলোক আমাদের গাড়ীতে উঠিলেন, এবং একটা প্রকাণ্ড হৈ চৈ বাধাইয়া দিলেন। তাঁহাদের চেঁচা-মেচিতে নিদ্রিত বাবু ও বাবুর সহচরীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; তাঁহারা উভয়েই উঠিয়া বসিলেন।

নবাগত বাবুত্রয় খুব চালাক চতুর; কথাবার্ত্তায়ও খুব সাকুব বলিয়া বোধ হইল। তাঁহারা বঙ্গদেশীয় বাবুটীর পরিচয় লইতে বসিলেন, এবং ভাব-গতিকে বুঝিতে পারিলেন যে, সঙ্গিনী গৃহিণী নহেন; সুতরাং তাঁহারা ধীরে ধীরে রসিকতা আরম্ভ করিলেন। সকল দ্রব্যেরই—সকল কর্ম্মেরই—একটা সময় অসময় আছে। দুই এক সময় আছে, যখন একটু আধটু রসিকতা বেশ মিষ্ট বোধ হয়। কিন্তু রাত্রি একটা দুইটার সময়ে কতকগুলি ভদ্র-লোকের সম্মুখে কুলটার সঙ্গে রসিকতা নিতান্তই যেন অভদ্রোচিত বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু আমাদের ভদ্রাভদ্রে কি যায় আসে। বাবুত্রয় বেশ ঠাট্টা তামাসা আরম্ভ করিয়া দিলেন। এদিকে দেখি রমণীও নিতান্ত কম নহেন; তিনিও বেশ দুই একটী উত্তর দিতে লাগিলেন; কাজেই তাঁহাদের কথা-বার্ত্তা বেশ জমিয়া আসিল; এমন কি দুই একস্থানে শ্লীলতার সীমাও অতিক্রম করিতে লাগিল। আমার সঙ্গী বন্ধু ত লজ্জায় অধোবদন হইলেন। রেলের গাড়ীতে এ প্রকার অভদ্র-ব্যবহার দর্শন আমার পক্ষে এই নূতন নহে, সুতরাং আমি এমন দুই দশটা ব্যাপার উপেক্ষা করিতে শিখিয়া-ছিলাম। কিন্তু বন্ধু ত তাহা নহেন; তিনি কখনও বিদেশে যান নাই; কলিকাতার গৃহকোণে পিতা মাতা ভগিনীর স্নেহাদরে প্রতিপালিত, বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের উদার ছায়াতলে শিক্ষিত, পুষ্ট; তাঁহার মধ্যে নাগরিক উশৃঙ্খলতার কোন চিহ্নই ছিল না; তাঁহার হৃদয়ে অসৎভাবের বিকাশই হইতে পায় নাই। তিনি এই সব দেখিয়া বড়ই চটিয়া গেলেন, এবং যদি সুবিধা হয়, তাহা হইলে অন্য গাড়ীতে যাইতেও প্রস্তুত। কিন্তু তাহা এক প্রকার অসম্ভব, এত জিনিস পত্র টানিয়া লইয়া দ্বিতীয় গাড়ীতে যাওয়া কম ব্যাপার নহে। "বন্ধুবর অগত্যা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখে যেন কেমন একটা বিষণ্ণতার ছায়া দেখিলাম। এ উপলক্ষে নহে, কলিকাতা হইতে গাড়ী ছাড়িবার পর হইতেই যেন তাঁহার দেশভ্রমণের স্ফূর্ত্তি একটু একটু করিয়া কমিয়া আসিতেছিল। নির্জ্জন অন্ধকার প্রান্তরের ভিতর দিয়া যখন আমাদের লৌহশকট শশব্দে ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিল, তখন অনভ্যস্ত ভ্রমণকারীর মনে যে কেমন একটা ভাবের উদয় হইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। চির-পরিচিত গৃহপ্রকোষ্ঠ, কুসুমকোমল শয্যা, পিতা মাতার শত সহস্র আদর যত্নের চিহ্নে পরিপূর্ণ শয্যাগৃহের কথা মনে হইয়াই সঙ্গী বোধ হয় এমন বিষণ্ণ হইতেছিলেন।

এবার এইস্থানেই শেষ। বারান্তরে অবশিষ্ট বলা যাইবে।

শ্রীজলধর সেন।

স্বদেশে ইংরেজ।

আজকাল ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের সম্বন্ধ যেরূপ ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িতেছে, আর ভারতবাসী ও ব্রিটনবাসীর অবস্থা পরস্পরের নিকট যে প্রকার সাহায্য-সাপেক্ষ্য—তাহাতে ইংরেজজাতির গুণাগুণ উত্তমরূপে অবগত হওয়া আমাদের একান্ত আবশ্যক। কিন্তু ভারত ও বিলাতের মধ্যে যেমন অসীম প্রভেদ, আর বাঙ্গালী ও ইংরেজদের মধ্যে যে রকম সম্বন্ধ, তাহাতে স্থিরচিত্তে ব্রিটিষ জাতির দোষ গুণ পর্য্যালোচনা করা আমাদের পক্ষে কতদূর কঠিন ব্যাপার, তাহা পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারেন।

তবে ডাক্তার কবিরাজেরা যেমন চিরেতা, সিঙ্কোনা থেকে অরারি সংগ্রহ করেন, আফিম্ ক্লোরোফরম্ হ'তে ঔষধ বাহির করেন—আমিও সেইরূপ অনেক দোষ-গুণযুক্ত ইংরেজ চরিত্র হ'তে আমাদের এ মৃতপ্রায় জীবনের জন্য সঞ্জীবনী আহরণে প্রবৃত্ত হইলাম। আমরা প্রায় দেড় শ বৎসর ইংরেজ-শাসনে রহিয়াছি; যথা, অযথা, অনেক কারণে ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে সম্বন্ধ ক্রমশঃই বিরোধী হইয়া দাঁড়াইতেছে। আর অধিকাংশ ইংরেজ নিজদেশ ছাড়িয়া বিদেশে আসিবার সময় নিজেদের অনেক সদ্‌গুণ পশ্চাতে রাখিয়া আসে। স্বার্থই তখন উহাদের প্রধান উদ্দেশ্য, সুতরাং বিদেশে উহাদের স্বার্থপর প্রবৃত্তিগুলি অধিক প্রখর হইয়া উঠে। বিশেষ, পরাধীন ভারতের বাতাসে উহাদের ভয়ানক রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। সেজন্য আমরা এদেশে ঐ সব অ্যাংগ্লো ইণ্ডিয়ানদের কেবল মন্দদিকটা দেখিয়া সমস্ত ব্রিটিষ জাতিকে মন্দ মনে করি।

আবার বহুদিন পরাধীন আছি বলিয়া অনেক সময় আমরা স্বাধীন জাতিদের সদ্‌গুণসমূহ দেখিতে পাই না বা বুঝিতে পারি না। স্বাধীন জাতি কেন, আমরা নিজেদের মধ্যেই লোকের ভাল গুণের দিকে একেবারে অন্ধ হইয়া থাকি। কিন্তু কোন স্বদেশবাসীর চরিত্রে একটু খুঁৎ দেখিতে পাইলে দশজনে যেন শতমুখে তাহার আন্দোলন করিয়া বেড়াই। কোন লোকের বা জাতির ভাল বৃত্তিগুলি উপেক্ষা করিয়া কেবল দোষের চর্চ্চা করা সাধুর কাজ নয়। দয়ার মাহাত্ম্য যেমন, যিনি দান করেন তিনিও আশীর্ব্বাদ পান, যে দান গ্রহণ করে সেও আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয়। পরনিন্দা দোষ সেই রকম, যে উহা করে সেও নিজের অপকার করে, আর যার করা যায় তারও মহা অপকার হয়। সেজন্য ইংরেজজাতির উল্টাদিকটা একেবারেই ঢাকিয়া ভাল দিকটাই দেখা যাক।

অনেকেই জানেন, ইংরেজজাতির অনেক সদ্‌গুণ আছে বলিয়াই ইহারা এত বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সেই ভাল বৃত্তিগুলি কি তাহা আমরা উত্তমরূপে জ্ঞাত নহি। কেন না, "যার সঙ্গে ঘর করিনি, সে বড় ঘরণী"——ইংরেজদের সঙ্গে ভারতবাসীদের পৃথক বাসই সেই অজ্ঞতার কারণ। আর যত দিন আমাদের মধ্যে জাতিভেদ ও ইংরেজদের মধ্যে বর্ণভেদ থাকিবে,

ততদিন এ অজ্ঞতা সম্যক্ দূর হ'বারও আশা নাই। তাই বহুদিন তাদের দেশে থাকিয়া তাদের সঙ্গে মিশিয়া ইংরেজজাতি সম্বন্ধে যাহা দেখিয়াছি ও বুঝিয়াছি, তাহাই পাঠকদের জন্য লিখিতেছি।

ইংরেজদের প্রধান গুণ কার্য্যক্ষমতা। কর্ম্ম ইংরেজজীবনের সঙ্গীর মত; জল বায়ুর গুণেই হউক, অথবা স্বাভাবিক গুণেই হউক, ইহারা অতিশয় কর্ম্মপ্রিয়। ইহারা কোন কঠিন পরিশ্রম করিতে ভয় পায় না বা শীঘ্র উহাতে কাতর হয় না। আমাদের এদেশে গ্রীষ্মের জন্য বা অলসতা বশতঃ লোকে দুই তিন ঘণ্টা কাজ করিয়াই একেবারে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে, কিন্তু ইংরেজরা পাঁচ ছয় ঘণ্টার মধ্যে বিশ্রাম লয় না। রাস্তা-খনন, বাড়ী-নির্ম্মাণ প্রভৃতি কাজে দুই চারদিন মনোযোগ দিয়া দেখিলেই জানিতে পারা যায়, উহারা প্রথম ঘণ্টাতে যতখানি কাজ করে, দিনের শেষ দশম ঘণ্টাতেও সেইরূপ অধ্যবসায়ের সহিত ততখানি কর্ম্ম করে। ইহারা কর্ম্মে যেমন পটু, কথাতে ও কাজের নিয়মে সেইরূপ ঠিক্‌ঠাক্। ইংরেজরা নিজের সময় নষ্ট করিতে ভাল বাসে না, সেইজন্য বৃথা বাক্যব্যয় করিয়া অন্যেরও সময় নষ্ট করে না। কাহাকে কোন বিষয়ে বিরক্ত করিতে বা কাহার দ্বারা নানা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইতে ইচ্ছা করে না। এই সব কারণে ইহাদের সঙ্গে কাজকর্ম্ম করিতে সুখ আছে।

উদ্যম ইংরেজদিগের আর একটী শ্রেষ্ঠ গুণ। এই উদ্যম ও কার্য্য-ক্ষমতার বলেই বাণিজ্যে ব্রিটনবাসীরা পৃথিবীতে অদ্বিতীয় হইয়াছে। বাণিজ্য-প্রভাবেই ইহারা এত ধনশালী ও ইহাদের রাজ্য জগতের চতুর্দ্দিক ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ইহারা সর্ব্বদা চারিদিকে চক্ষুঃ রাখিয়া চলে, কোথাও বাণিজ্য কিম্বা শিল্পের সূত্র দেখিলে সকলে তৎক্ষণাৎ উৎসাহের সঙ্গে তাহাতে যোগ দেয়। ইহারা প্রতি বৎসর কত নূতন কল আবিষ্কার করে, এবং সদা-সর্ব্বদাই শিল্প ও কারুকর্ম্মের কত উন্নতি সাধিতেছে। আবার বিদেশে কোন নূতন দ্রব্যের আবিষ্কার বা শিল্পকর্ম্মের কোন উন্নতি হ'লে তাহার সমস্ত সংবাদ রাখে ও উহা স্বদেশে প্রচলিত না করিয়া ক্ষান্ত হয় না। সাহস ও পরাক্রমেও ইংরেজরা ইউরোপের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। ইহারা জীবনের প্রথম পদ হ'তে শেষ পদ পর্য্যন্ত সাহসে নির্ভর করিয়া কাজ করে।

ইংরেজদের বল, তেজ ও সাহসের কথা অধিক লেখা অনাবশ্যক; কেন না ইতিহাসের প্রতি অধ্যায়েই তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়।

একদিকে ইংরেজরা যেমন স্বার্থপর, অন্যদিকে সেইরূপ আত্মমর্য্যাদা বুঝে ও আত্মনির্ভর করিতে জানে। নিজে কোন কর্ম্ম সাধিতে পারিলে প্রাণ থাকিতে কখন অন্যের সাহায্যের অপেক্ষা করে না, ও পরের সাহায্য লইতে লজ্জা বোধ করে। তাহারা বেশী যেমন পরের সহায়তা করে না, তেমনি পরের সহায়তা চাহেও না। কোন ইংরেজের নিকট কিছু জিজ্ঞাসিলে তিনি—নিজের সাহায্য নিজেই কর—এই উপদেশ দেন। সেজন্য বিলাতে ছোট বড় সকলেই নিজ নিজ সংস্থান দেখে। সেদেশে একান্নবর্ত্তী পরিবারের ব্যবস্থা নাই। পুত্রেরা কি ভ্রাতারা বয়সপ্রাপ্ত হইলেই নিজেদের জীবিকা উপার্জ্জনের পথ খোঁজে। অবিবাহিতা কন্যারা পর্য্যন্ত নিষ্কর্ম্মা হ'য়ে পিতৃগৃহে বাস করিতে নিজেদের হীন বোধ করে, এবং আত্মীয় কুটুম্বেরা কাহারও গলগ্রহ হইয়া অলসভাবে থাকিতে লজ্জা পায়। অতি বাল্যকাল থেকে ইহারা আত্মনির্ভর করিতে শিখে। আমি রাস্তায় কি বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে অনেক সময় দেখিয়াছি, ছোট ছেলেদের মধ্যে চলিতে চলিতে কেহ পড়িয়া গেলে, সে তার মার দিকে চাহিয়া না কাঁদিয়া, যতদূর পারে নিজে উঠিতে চেষ্টা করে, আর সে ইহাতে কৃতকার্য্য হ'লে তার সঙ্গীরা ও মা বাপ তাহাকে বাহবা দেয়।

ইংরেজদের মধ্যে চমৎকার একতা দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় একতার বলে বিলাতে বহুসংখ্যক বড় বড় কোম্পানী, ব্যবসায়, শিল্পকার্য্য ও যৌথকারবার স্থাপিত হইয়াছে। এই একতা না থাকিলে উহাদের সমস্ত রাজ্য ও বাণিজ্য একদণ্ডে ধ্বংস হইয়া যাইত। একতার বলে এই ক্ষুদ্র দ্বীপবাসীরা কি না করিতেছে, আর এই জাতীয় একতার অভাবে আমরা কোন বড় কাজই করিতে পারিতেছি না। পৃথিবীতে অনেক কর্ম্ম একাকী সম্পন্ন করা যায় না; একজন লোক সমস্ত দেশকে উন্নত বা কোন দেশ জয় করিতে পারে না। একগাছা ছড়ি কেহ অনায়াসে ভাঙ্গিতে পারে, কিন্তু দশগাছা লাঠি একসঙ্গে করিলে তাহা ভাঙ্গা দুঃসাধ্য হয়—এ প্রাচীন বাক্য আমরা সকলেই জানি। কিন্তু জানিলে কি হবে, ইংরেজরাই এ বাক্যের সার্থকতা দেখায়। ইংরেজজাতি এক সঙ্গে মিলিয়া সামান্য ধোবার দোকান

(Washing Company) হ'তে এই বিস্তৃত ব্রিটিষ সাম্রাজ্যের শাসন পর্য্যন্ত—সকলেই করিতেছে।

ইংরেজদের মধ্যে যেমন জাতীয় একতা, সেইরূপ স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি দৃঢ় অনুরাগ আছে। এই দেশভক্তি ও স্বজাতিপ্রিয়তার দরুণ উহারা জন্মভূমির কোন অমঙ্গল দেখিতে বা স্বদেশবাসীদের অপমান সহিতে পারে না। ইহারা যেমন আত্মমর্য্যাদা রাখিতে ব্যস্ত, সেইরূপ স্বজাতির নাম রক্ষা করিতে সর্ব্বদা যত্নবান। স্বাধীন জাতি, স্বাধীন দেশ বলিয়া ইহাদের মনে আত্মাভিমান আছে, সেই জাতীয় অভিমান বশতঃ ইহারা স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি কোন কু-ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয় না। স্বদেশীয় কোন লোকের প্রতি কেহ অত্যাচার করিলে নিজের অপমান মনে করিয়া সকলে মিলিয়া তৎক্ষণাৎ তার প্রতিশোধ দিবার চেষ্টা পায়। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কোন বিদেশীয় রাস্তায় কোন লোককে মারিলে প্রায় কুড়িজন ইংরেজ দৌড়িয়া এসে স্বদেশীয়ের পক্ষ লইবে ও বিদেশীয়কে মারিতে উদ্যত হ'বে। বিদেশে গেলেও ইংরেজরা এই স্বজাতিপ্রিয়তা ভুলিয়া যায় না। এদেশেও আমরা দেখিতে পাই, তাহারা সকলেই একত্র বাস করে ও পরস্পরের সাহায্য করে। বিজাতীয় অপেক্ষা স্বজাতীয়ের উপর তাহাদের অধিক বিশ্বাস। ইংরেজরা স্বদেশীকে ফেলিয়া কখন বিদেশীকে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করে না। আর স্বজাতি মধ্যে শঠতা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যাকথা প্রভৃতি দুর্ব্যবহার করিতে লজ্জিত হয়। ইহারা বরং অন্য জাতির নিকট জুয়াচুরি করিবে, তথাপি স্বদেশী লোকদের সঙ্গে নীচ ব্যবহার করিবে না! তা ছাড়া, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা প্রায়ই দেখা যায় না। আর ইহারা কখন স্বজাতিকে হেয়জ্ঞান করে না ও অন্যের কাছে অবনতশির হইয়া চলে না।

কর্ত্তব্যকর্ম্মের জ্ঞান ইংরেজাতির আর একটী অতি উৎকৃষ্ট গুণ। প্রধান মন্ত্রী হইতে সামান্য মজুর পর্য্যন্ত সকলেই একাগ্রচিত্তে নিজ নিজ কর্ত্তব্যকর্ম্ম সাধন করিয়া থাকে। একজন উচ্চ পদবীর রাজকর্ম্মচারী নিজের নির্দ্দিষ্ট কাজ যেরূপ মনোযোগের সহিত সম্পন্ন করেন; একজন সামান্য কেরাণীও নিজের কাজ সেইরূপ মন দিয়া করে। একটা ছুতার মিস্ত্রী ডাকিয়া কোন কাজ করিতে দাও, সে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজটী সুচারু-

রূপে শেষ করিয়া দিবে। একজন চাকর বা চাকরাণী নিযুক্ত কর, সে প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে ঠিক্‌ঠাক্ কাজগুলি করিয়া রাখিবে। এ বিষয়ে ইংরেজ মনিবকে আমাদের মত দিক্ হ'তে হয় না। আমি ইহাদের এই কর্ত্তব্যের জ্ঞান দেখিয়া অনেক সময় আশ্চর্য্য হইয়াছি। কি ঝড়, কি বৃষ্টি, কি তুষারপাত—কোন কালেই ইংরেজরা উচিত কর্ম্ম অবহেলা করে না। আবার ইহারা যেমন অধিক কথা কহে না, তেমনি কোন কাজের জন্য ইহাদের সঙ্গে বকিয়া সময় নষ্ট করিতে হয় না। ইহারা গালাগালি বা তিরস্কারকে অতিশয় ঘৃণা করে; এবং কি বড়, কি ছোট, কেহই ভৎর্সনা খাইতে চায় না, বা খাইবার কাজও করে না।

বিদেশীয়দের প্রতি স্নেহশীল না হ'লেও বিনা কারণে ইংরেজরা কাহারও উৎপীড়ন বা অনিষ্ট করিতে অগ্রসর হয় না। কত বিদেশী লোক ধর্ম্মসম্বন্ধে বা অন্য কোন কারণে স্বদেশে উৎপীড়িত হ'য়ে ইংলণ্ডে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। উহারা অনেক সময় ঐ সব লোকদের প্রতি সদাশয়তা দেখাইয়া থাকে। সেদেশে যেমন ভয়ানক স্বার্থপর ও দুরাকাঙ্ক্ষ লোক আছে, সেই রকম অতি অমায়িক ও উদারব্যক্তিও বিরল নহে। অনেক ধনী সর্ব্বদা পরহিতে রত থাকেন ও পরোপকারের জন্য রাশি রাশি অর্থ দান করেন। ইংরেজ বড়মানুষদের বদান্যতা জগৎপ্রসিদ্ধ। ইঁহারা অহরহঃ নিজদেশে নানা কারণে প্রভূত অর্থ বিতরণ করেন, আর সময়ে সময়ে অতি দূরদেশেও বিপদ-কালে প্রচুর দান পাঠাইয়া থাকেন।

সচরাচর ইংরেজ বিনয়ী না হ'লেও রুক্ষ নহে; আর নির্ম্মম হ'লেও ইহাদের মনে নীচ প্রবৃত্তি অতি বিরল। ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা অতি কঠিন, কিন্তু একবার মিত্রতা হইলে, ইংরেজবন্ধুর মত বিশ্বাসী, উপকারী ও চিরজীবনস্থায়ী বন্ধু পৃথিবীতে অতি অল্পই দেখা যায়। সুশিক্ষিত ইংরেজ-দের মধ্যে অধিকাংশ অতিশয় ভদ্র; ইঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিলে, ইংরেজ জাতির সমস্ত দোষ ভুলিয়া তাদের প্রতি ভক্তিভাবের উদয় হয়। ইঁহারাই ইংলণ্ডের প্রধান অবলম্বন এবং ইঁহারাই ব্রিটনের গরিমা ও মাহাত্ম্য বর্দ্ধন করেন।

শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস।

প্রেম-বৈচিত্র্য।*

প্রথম পরিচ্ছেদ।

১ম। "কিলো আজ তোরা ঘাটে যাবিনে? তোদের যে আর বার হয় না!"

২য়। কি করি বোন্, এই তোর সইয়ের জন্যইত যত দেরী!

১ম। সইয়ের জন্য দেরী কেন?

২য়। ওঁর আর আজ চুল বাঁধা মনস্তর হচ্ছে না!

১ম। কেন লো সই?

৩য়। দূর,—তুইও যেমন, বৌয়ের কথা শুনিস্ কেন? বউ, তুমি কিন্তু ভাই ভারি মিচ্‌কতারি!

বৌ মৃদু মৃদু হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন "তা সত্যি কথাইত বল্‌চি ঠাকুরঝি, তোর যে ভাই পেটে খিধে মুখে লজ্জা! তা সইকে আর অত লজ্জা কেন?

১ম। কি লা সই?

৩য়। বৌয়ের মাথা!

২য়। আমার মাথাই হোক্ আর মুণ্ডুই হোক্, কথাটা কেন সইকে খুলেই বল না? ওলো, আজ রাত্রে আমার এই ঠাকুরঝি ঠাকুরাণীর পূজা হবে, তাই আমি প্রতিমাখানিকে যত্ন কোরে সাজাচ্চি!

সম্বন্ধে ননদ ভাজ তবু উভয়ে বড় ভাব। ঠাকুরঝির সই বলিয়া, কুসুমের সঙ্গেও বৌয়ের বেশ প্রণয়; তিনজনেই সমবয়স্কা, তিনজনেই যুবতী!

---

* সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধ, এক বৎসরের মধ্যেই উপন্যাস খানি শেষ হয়, সেজন্য বিজ্ঞাপিত "ভিখারিণীর" দীর্ঘকাহিনী উৎসাহে প্রকাশ করিতে সাহসী না হইয়া একখানি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র উপন্যাসের অবতারণা করা হইল। আশা করি, "ভিখারিণীর" ভার বহন করিতে হইল না বলিয়া, বরং উৎসাহ সম্পাদক মহাশয়ের এবং ভিখারিণীকে ছারহ না দেখিয়া পাঠক মহোদয়গণেরও কোন আক্ষেপের কারণ ঘটিবে না।

লেখক।

কুসুম। পূজো কি না? নে ভাই ওসব হেঁয়ালি, মেয়ালি রাখ! কথাটা কি সত্যি বল না?

বৌ। আ, আমার কপাল, এটাও বুঝলিনে? আজ যে ঠাকুর জামাই আসবেন?

কুসুম। মাইরি? হ্যালা সই, কই, তুইওত ওবেলা আমাকে কিছু বল্লিনে? ধন্নি মেয়ে যাহোক কিন্তু! আমার সঙ্গেও লুকোচুরী!

সই সইয়ের কথার উত্তর দিতে না দিতে, বৌ বলিয়া উঠিল, তা ভাই, বলেনি কি সাধে? কতদিনের পর আজ ঠাকুরজামাই আস্‌চেন, পাছে আবার তোরা এসে রাত্রে সময় নষ্ট করিস্! তা, আজ আর তোদিকে ভাগ দেবে না, কাল হ'তে যা হয় করিস্! ঠাকুরঝি একটু হাসিয়া বৌকে চিমটী কাটিয়া বলিল—"মরণ আর কি?"

বৌ। মলে বুঝি নিষ্কণ্টক হস্?

কুসুম। নে এখন রঙ্গ রাখ! প্রভাতবাবু কখন আস্‌বে, বলনা ভাই? এ খবরটা কি আমাকে বল্‌তেও নেই? এই বলিয়া কুসুম সইয়ের দিকে চাহিল। মধুর অধরখানি অভিমানে একটু ফুলিয়া উঠিল!

সই সিন্ধু এতক্ষণ বৌয়ের সঙ্গে সইয়ের রঙ্গ দেখিতেছিলেন, আর টিপিটিপি হাসিতেছিলেন, কিন্তু সইয়ের অভিমান বুঝিয়া, তাঁর আসন টলিল। ব্যাপারখানা সইকে জানাইবার জন্য সিন্ধুর হৃদয়টুকু আকুল হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু মুহূর্ত্তে বৌ ঠাকুরাণী, এই বিপদ হইতে সিন্ধুকে মুক্ত করিলেন। বৌ আসলে লোকটী মন্দ নন!

বৌ। তা কুসুম তুই ভাই রাগ করিস্‌নে। প্রভাতবাবু আজ রাত আট্‌টার গাড়ীতে আস্‌বেন। তোকে বল্‌বে কি, আমরাই একটু আগে খবর পেলাম। তবে ভাই তোমার সইয়ের মনের খবর রাখিনে, যদি তিনি, মনে মনে আগে জেনে থাকেন, তা এখন তোমাদের সইয়ে সইয়ে বুঝা পাড়া।

কুসুম আবার সইয়ের দিকে চাহিল, এ চাহনি, হাসি আহ্লাদে ভরা ভরা। চারি চক্ষে মিলিল! চোখে চোখে কি কথা হইল জানি না, কিন্তু উভয়ে উভয়ের মনোভাব বুঝিলেন! সহস্র কথায় যাহা প্রকাশ পায় না,

সময়ে, একটু হাসি, একটু অপাঙ্গের দৃষ্টি, তাহা বুঝাইয়া দেয়। চুল বাঁধা শেষ হইল। এবার পরস্পরে সিন্দুর দেওয়ার পালা। সিন্দুর পরান শেষ হইলে, তিন জনে, গামছা কাঁধে, কাপড় কাচিতে বাহির হইলেন।

পথের আশে পাশে ছোট ছোট আম কাঁটালের বাগান। মাঝে মাঝে দুই চারিটা বাঁশ ঝাড়। জ্যৈষ্ঠ মাস, বেলা অপরাহ্ণ। পাখীর দল গাছে বসিয়া, কাকলি করিতেছে। দূরে কোকিল পাপিয়ার উচ্ছ্বাস পরদায় পরদায় উঠিতেছে। যেন তপনের আসন্নবিরহে কাতর হইয়া, দিবারাণী প্রকৃতির কোলে বসিয়া উচ্ছ্বাসে আপনার মর্ম্ম-গান গাহিতেছে। ঘাটে যাইতে যাইতে এই কোকিল পাপিয়ার ডাক উপলক্ষ করিয়া বৌ ও কুসুম মাঝে মাঝে সিন্ধুকে লইয়া, নানা রঙ্গ করিতেছিলেন। পথে তাঁহাদের সঙ্গে বামা, রামা, শ্যামা অনেকেরই দেখা হইল। সকলেই এক তীর্থের যাত্রী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রসন্নপুর ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামের প্রান্তরে, 'তালপুকুর' নামে একটী পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর ঘাট বাঁধান। ঘাটের উপর দুই পাশে দুইটী অশ্বথ ও বটের গাছ। অনেক তালপুকুরের কথা শুনা যায়, কিন্তু সে সব পুষ্করিণীর চারি ধারে তালগাছের নাম গন্ধও নাই। মানুষ যায় নাম থাকে, সুখ যায় স্মৃতি থাকে, এই সব পুষ্করিণী বুঝি তাহারই উদাহরণ স্থল। কিন্তু আমাদের এই পুষ্করিণীর নামের মূলে, কোন ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত ছিল না। ইহার চারি ধারে বড় বড় তালগাছের সারি, পুষ্করিণীটী কিছু বৃহৎ, জল বড় পরিষ্কার।

অপরাহ্নে কয়টী রমণী গা ধুইতে ঘাটে নামিলেন। জল যেন শিহরিয়া উঠিল। পুষ্করিণীতে পদ্মবন নাই, কিন্তু জলাশয়ের সৌভাগ্যগুণে, দুটী বেলায় অনেকগুলি কমল ইহার বক্ষে ফুটিয়া উঠে! সদ্যপ্রস্ফুটিতা এই পদ্মিনী-কুলের বর্ণনা লইয়া আমার একটু গোলে পড়িতে হইয়াছে। ইহার মধ্যে কাহারও বয়স পনর বৎসরের অধিক নহে। তবে ইহাদের যুবতী, কি

কিশোরী কি বলিব? কবিগণ ষোড়শীকেই যুবতী বলিয়া বর্ণনা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু কালের স্রোতে সে দিনকাল ভাসিয়া গিয়াছে। বঙ্গ-ললনার যৌবনের নিতান্তই 'অকালবোধন'। এখন যুবতীর বর্ণনা করিতে গেলে, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী বলিয়াই করিতে হয়। তারপর যেন অমাবস্যার দিকে ঢলিয়া পড়ে।

আজ অনেকদিনের পর সিন্ধুবালার স্বামী আসিতেছেন, তাই তার সমবয়সী মহলে একটা হুলস্থূল বাধিয়াছে। তামাসার সময় সিন্ধু কাহাকেও ছাড়ে না, তাই আজ সিন্ধুকে কেন্দ্রীভূত করিয়া এই যুবতীর দল, হাসি তামাসা, রঙ্গরসে পুষ্করিণীর আসর গুলজার করিয়া তুলিয়াছেন। সিন্ধু যে ইহাতে আনন্দ অনুভব না করিতেছে, তা নয়; তবে সে সহসা ধরা দিতে রাজি নহে! কিন্তু মনের এ উচ্ছ্বাস চাপিয়া রাখা সরলা বালিকার কাজ নয়। তার প্রতি কথায়, প্রতি হাসিতে সে আনন্দহিল্লোল খেলিতেছিল।

সিন্ধুর অমায়িকতায় সবাই তাকে বড় ভাল বাসে। আজ তামাসার বেলায় কিন্তু কেহই তাকে ছাড়িতেছে না। সই যে সই, সেও আজ থাকিয়া থাকিয়া চোরাবাণ মারিতেছে। সিন্ধু, মাঝে মাঝে সইকে ভ্রূভঙ্গ করিতেছিল, আর কুন্দদন্তে বিম্বাধরখানি টিপিয়া ক্ষুদ্র হস্তে ক্ষুদ্র কিল দেখাইতেছিল। কিন্তু সইত আর পুরুষমানুষ নয়! এসব সে হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছিল।

এইরূপে সুন্দরীগণের কাপড়কাচা শেষ হইল। তখন যাঁহাদের জল লইবার প্রয়োজন, তাঁহারা কলসী লইয়া জল পূরিতে লাগিলেন। পূরিবার সময় চারিধার হইতে ছুটিয়া ছুটিয়া নাচিয়া নাচিয়া জল আসিতে লাগিল। তারপর পূর্ণকলসী কক্ষে যুবতীর দল, যখন ধীরে ধীরে গজেন্দ্রগমনে চলিতে আরম্ভ করিলেন, কলসীর জল তখন আনন্দে তালে তালে নাচিতে লাগিল। জল কি সৌন্দর্য্য ভাল বাসে? শুনিয়াছি, শতযোজন দূরে, চন্দ্র দেখিয়া সমুদ্র উথলিয়া উঠে, ইহার সত্যাসত্য প্রত্যক্ষ করি নাই, কিন্তু রমণীর মুখ-চন্দ্র দেখিয়া কক্ষস্থ কলসীর জল যে উছলিয়া উঠে, তাহা নিতান্ত কবি-কল্পনা নহে।

সহসা এই যুবতীদলের গতিরোধ হইল। বিপরীত দিক হইতে আর একদল রমণী, তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন। ইহাদের অধিকাংশই যৌবনের

শেষসীমায় পা দিয়াছেন। উভয়দলে দুই চারিটা কথার পর, বয়স্থার দল অগ্রসর হইলেন। কিন্তু "ডাক্তারগিন্নি" তখনও নবীনাদের সহিত কথা কহিতে রত! ডাক্তারগিন্নি—ডাক্তার হরকালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী। সমবয়সী মহলে তিনি ডাক্তারণী বলিয়া পরিচিতা। ডাক্তারগিন্নির বিলম্ব দেখিয়া তাঁর দলের একজন, তাঁকে ডাকিয়া বলিলেন, "বলি, ও ডাক্তারণী তুই যে দেখি, সিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে মিশলি?" ডাক্তারগিন্নি তখন নাত্‌নীদের সঙ্গে রঙ্গরসে মগ্না, হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন, "সিং ভাঙ্গতে হবে কেন লো, আমি যে নেড়ি, তা, তোরা না হয় একটু এগো, আমি যাচ্চি।" এইখানে ডাক্তারগিন্নির আর একটু পরিচয় দিয়া রাখি। তিনি নিঃসন্তান, কিন্তু সেজন্য তাঁর কোন অশান্তি নাই। সেই স্বামিসোহাগিনী,—সদাই হাস্যময়ী, সদাই প্রফুল্ল! লেখা পড়াও তাঁর মোটামুটি জানা আছে। রামায়ণ, মহাভারত, অন্নদামঙ্গল, চণ্ডীদাস প্রভৃতি তাঁর একরূপ কণ্ঠস্থ বলিলেই হয়। নবীনাদলের অধিকাংশই তাঁহার নাত্‌নী বা নাত্‌বৌ। ঠাকুরাণীদিদি কিন্তু কেবল এই সম্বন্ধেই সন্তুষ্ট নন্, নাত্‌নী ও নাত্‌বৌদের সঙ্গে তিনি কত রকমের কত নূতন নূতন সম্বন্ধ পাতাইতেন। সিন্ধু তাঁর "সাধের বাগান" আর সিন্ধুর সই কুসুম হচ্চেন তাঁর "আতরদানি।" তা ছাড়া কেহ "দেখন হাসি" কেহ "মাইডিয়ার" কেহ "লেবেন্‌ডার" কেহ বা "ওডিকলম!" নাতীর দলে বিশেষতঃ নাত্‌জামাই মহলেও তাঁর কম পসার নয়! ডাক্তারগিন্নি সিন্ধুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কি লো সাধের বাগান! আজ নাকি মালী আস্‌চে? আমি ত ভাই ভাবছিলাম—"ফুটিয়ে কলি, পড়্‌ছে ঢলি, কইত অলি এলোনা!" তা এতদিনে বুঝি তার মনে পড়েছে। কাল গিয়ে মালীগিরি ঘুচিয়ে দিয়ে আস্‌ব। সিন্ধু নতমুখে একটু হাসিল, সই কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নয়। সে ঠাকুরাণীদিদির কথার ছল ধরিল, "সইয়ের মালীগিরি ঘুচিয়ে দিয়ে নিজের মালী ক'রে নেবে বুঝি আতরদানি? তা হ'লে যে ডাক্তার ঠাকুরদাদাতে আর প্রভাতে চুলোচুলি বেধে যাবে গো?" ডাক্তারগিন্নিও বড় সোজা নন, বলিলেন, দুর নেকী, তোর ঠাকুরদাদার ত তা হ'লে ভালই হবে। পুরান বাগান গিয়ে তার আবার নূতন বাগান হবে, সঙ্গে সঙ্গে ফুটন্ত কুসুমকলিটীও পাবে।

কুসুম। না গো না, আতরদানি! সাজান বাগান ছেড়ে দিয়ে কেউ কি আর নূতন বাগান চায়?

ডাক্তারগিন্নি। আ মর্! ঐ দেখ,—"রোগী মেরে, ঘোড়ায় চড়ে, আস্‌চে আমার বর।"

বাস্তবিক, দূরে ডাক্তারবাবু ঘোড়া ছুটাইয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নবীনার দল তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল! ডাক্তার ঠাকুরদাদার সাম্‌নে পলেই ত সর্ব্বনাশ! এখনি কি না কি বলে বস্‌বে। ঠাকুরাণীদিদিটীও হাসিতে হাসিতে, মরালগতিতে চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে একবার একটু ফিরিয়া বলিলেন,—"কাল দুপুরবেলায় যাব লো বাগান। তোর তো ভাই, এখন পাথরে পাঁচ কিল!"

এইরূপে আমোদে-আহ্লাদে কাটাইয়া সকলে আপন আপন গৃহে ফিরিলেন। পল্লিগ্রামের রমণীগণ বিশেষতঃ যুবতীর দল এই উপলক্ষে দিনান্তে একবার একত্রিত হন। এসময় তাঁহাদের বড় সুখে কাটে, প্রণয়ী যেমন প্রণয়িনীর মিলনের আশাপথ চাহিয়া থাকেন, চিরপ্রবাসী বাঙ্গালী যেমন শারদীয়া পূজার ছুটীর অপেক্ষা করেন, বালিকা বধূ যেমন পিত্রালয় যাইবার দিন গণিতে থাকেন, ইঁহারাও বুঝি সেইরূপ সতৃষ্ণনয়নে, একাগ্রমনে এই সময়টুকুর প্রতীক্ষা করেন।

ক্রমে সন্ধ্যা অতীত হইল, গৃহে গৃহে দীপ জ্বলিল, সিন্ধুর হৃদয়েরও আশার দীপ জ্বলিয়া উঠিল। সারাটী বৎসর ধরিয়া, সিন্ধু স্বামীর আশাপথ চাহিয়া আছে। এর পূর্ব্বে সে স্বামীর সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিত না, আজ কি পারিবে?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঠিন্ ঠিন্ ঠিন্ শব্দে সহসা সিন্ধুর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু ঘুমের ঘোরে সে শব্দটা যে কিসের, তা বড় 'ঠাওর' করিয়া উঠিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি স্বামীর শিথিল বাহুপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া, উঠিয়া বসিল। অসংযত বেশ, আলুথালু কেশ একটু সংযত করিয়া লইল। তখন

নিদ্রালস চক্ষু মুছিতে মুছিতে মুক্ত বাতায়ন পথে দেখিল, সবেমাত্র ভোর হইয়াছে। তবু রক্ষে! সে ত ভেবেছিল, না জানি কত বেলাই বা হ'য়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরাণীদিদিদের বিদ্রূপের দারুণ বিভীষিকাও বুঝি তার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল। ঘর হইতে যাইবার পূর্ব্বে, এই সুযোগে নিদ্রিত স্বামীকে একবার ভাল করিয়া দেখিবার লোভটুকু সিন্ধু সম্বরণ করিতে পারিল না। রাত্রে লজ্জায়, সে ভাল করিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিতে পারে নাই। এখন স্বামীর অজ্ঞাতে সিন্ধু অনিমেষে সে মূর্ত্তি দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে দেখিল, কপালে তাঁর বিন্দু বিন্দু স্বেদ ঝরিতেছে। সিন্ধুর বড় সাধ হইল, ঘাম মুছাইয়া একটু বাতাস করে, কিন্তু কেমন বাধ বাধ ঠেকিতেছিল, "কি জানি যদি ঘুম ভেঙ্গে যায়, তবে ত ধরা পড়্‌ব, সে যে বড় লজ্জার কথা!" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যেন কতকটা আপনার অজ্ঞাতেই সিন্ধু ধীরে ধীরে স্বামীর কপাল মুছাইতে লাগিল। বাঁ হাতে, পাখাখানিও তুলিয়া লইল। কোমল অঙ্গুলীর কোমল স্পর্শে, প্রভাতের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, অমনি চারি চক্ষে মিলিল। সিন্ধুর হাত হইতে পাখা পড়িয়া গেল। সে তখন লজ্জায় জড়সড় হইয়া মুখখানি নীচু করিল। প্রভাত সেই ব্রীড়ানত মুখখানি দেখিবার জন্য আদরে সিন্ধুর চিবুক ধরিলেন,—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কে যেন আবার ঠিন্ ঠিন্ ঠিন শব্দে বাহিরে শিকল নাড়িল। সিন্ধু লজ্জাবনত নয়ন-পল্লবদুটী স্বামীর পানে একটু তুলিয়া বলিল,—"এখন তবে যাই।" * * * *

কপাট খুলিয়া সিন্ধু দেখিল, সে যাহা ভাবিয়াছে ঠিক তাহাই বটে! সম্মুখে হাসিমুখে দাঁড়াইয়া সই! পোড়ারমুখী সই নইলে, রাত পোয়াতে না পোয়াতে এত মাথাব্যথা আর কার? সিন্ধু বাহিরে আসিলে সই একমুখ হাসিয়া বলিল 'কি লো!' তখন দুই সইয়ে হাত ধরাধরি করিয়া নিভৃতে চলিল।

দেখিতে দেখিতে বৌ এবং আর আর সমবয়সীরা জুটিতে লাগিল, ক্রমে—

"শ্যামলা বিমলা, মঙ্গলা অবলা,
আইলা সিন্ধুর পাশে।
যদি স্বতন্তরে, তথাপি সিন্ধুরে,
পরাণ অধিক বাসে॥

সিন্ধুমুখ দেখি, হৈয়া মহাসুখী,
কহয়ে কৌতুক কথা।
রজনী-বিলাস, শুনিতে উল্লাস,
অমিয় অধিক গাঁথা॥
হাস পরিহাসে, রসের আবেশে,
মগন হইল সিন্ধু।
সে নিশি-কাহিনী, রস-নির্ঝরিণী,
কবি মাগে এক বিন্দু॥

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

প্রলয়ের ধূমকেতু।

অনেকদিন হইল বঙ্গের সুসন্তান কবি হেমচন্দ্র ধূমকেতুর সংঘর্ষণে পৃথিবীর আকস্মিক ধ্বংসের কথা শুনিয়া লিখিয়াছেন :—

"আসিছে অনল ব্রহ্মাণ্ড উজলি,
(দেখেছে শূন্যেতে পণ্ডিতমণ্ডলী)
জগত ব্রহ্মাণ্ড করিবে গ্রাস।
একি ভয়ঙ্কর——বিশ্ব চরাচর
সোম, শুক্র, বুধ, মহী শনৈশ্চর,——
বিদ্যুৎ অনলে হবে বিনাশ !"

আবার শুনিতেছি, অষ্ট্রীয়াদেশীয় জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, আগামী ১৪ই নভেম্বর ধরার আয়ুঃ শেষ হইবে। পৃথিবীর কোষ্ঠীর লিখিত এইপ্রকার মৃত্যুযোগের আবিষ্কার বড় নূতন নয় ;—ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই নানাদেশীয় জ্যোতিষিগণ তাঁহাদের গণনার এই-প্রকার অদ্ভুত ফলপ্রচার করিয়া, মধ্যে মধ্যে জগৎকে শঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের শৈশবাবস্থায় এইপ্রকার আজগবি

সংবাদ প্রচার করিয়া, তৎকালে জ্যোতির্বিগণ কুসংস্কারান্ধ জনসাধারণ মধ্যে তুমুল আন্দোলন-স্রোত উত্থিত করিতেন, কিন্তু একাধিকবার পণ্ডিতগণের ভবিষ্যৎ বাণীগুলি ব্যর্থ হইতে দেখিয়া, এখন এই শ্রেণীর উক্তিগুলিতে ক্রমেই সাধারণের অনাস্থা দেখা যাইতেছে। এতদ্ব্যতীত আজকাল জ্যোতির্ব্বিদ্যার মূল বিষয়গুলি সাধারণের নিকট পরিজ্ঞাত থাকায়, উক্তপ্রকার বাক্যের অযথার্থতা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছেন। বোধ হয়, এই সকল কারণে, উল্লিখিত অষ্ট্রীয়ান্ জ্যোতিষী ফাল্‌ব (Falb) সাহেবের গণনার ফল বহুকাল প্রচারিত হওয়া স্বত্ত্বেও,—অদ্যাপি জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ কোন চঞ্চলতার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না,——সংসারের ক্ষুদ্র বৃহৎ খুঁটিনাটি কাজকর্ম্ম ঠিক পূর্ব্ববৎ চলিয়া আসিতেছে।

ফাল্‌ব সাহেব তাঁহার গণনার বিবরণ অল্পদিন হইল প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে,——সুপ্রসিদ্ধ বয়েলার ধূমকেতু (Biela's Comet) আগামী নভেম্বর মাসে পৃথিবীর ভ্রমণপথ রোধ করিয়া, মহাপ্রলয় উৎপন্ন করিবে; এবং এই জ্যোতিষ্কদ্বয়ের সংঘর্ষণে এত তাপ উৎপন্ন হইবে যে, সসাগরা ধরা তাহা সহ্য করিয়া স্বীয় অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে না,—মুহূর্ত্তে সকলই ভস্মরাশিতে পরিণত হইবে। এই অদ্ভুত উক্তি প্রচারিত হইবামাত্র নানাদেশীয় বিখ্যাত জ্যোতির্বিগণ স্বাধীনভাবে গণনা করিয়া, ফাল্‌ব সাহেবের ভ্রম ও তাঁহার গণনালব্ধ ফলের অসারতা প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং এই ভীতিজনক সংবাদপ্রচারের জন্য তাঁহাকে তিরস্কৃত করিতেও ছাড়েন নাই। পৃথিবীর ধ্বংস ব্যাপারে বয়েলার ধূমকেতুর কথা আজ নূতন নয়,—প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে অল্‌হার (Olher) নামক জনৈক পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন, ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ২৯ অক্টোবর উক্ত ধূমকেতুর সংঘর্ষণে পৃথিবী চূর্ণীভূত হইয়া যাইবে। এই সংবাদে ইউরোপের জনসাধারণ এত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল, যে অনেকগুলি নগরের অধিবাসিগণের মধ্যে শান্তিরক্ষা করাও বিশেষ দুরূহ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অল্‌হার এই প্রলয়কাল গণনায় একটা বড় ভুল করিয়া ছিলেন,—বয়েলার ভ্রমণপথ স্থির করিবার সময়, পূর্ব্বোক্ত বৎসরের ২৮ অক্টোবর ধূমকেতুটী ধরাকক্ষে উপনীত হইবে দেখিয়াই, তিনি অশুভ সংঘটনের আশঙ্কা করিয়াছিলেন,—উক্ত দিবসে পৃথিবী তাহার

কক্ষের কোনস্থানে অবস্থান করিবে, তাহা গণনা করিয়া দেখেন নাই। ফ্লামারিয়ন্ (Flammarion) নামক জনৈক পণ্ডিত অল্‌হারের গণনার এই ভ্রম প্রত্যক্ষ করিয়া স্বাধীনভাবে গণনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং শেষে তাঁহার গণনায় ধূমকেতুর ধরাকক্ষ স্পর্শকালে পৃথিবী, কক্ষের ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থান করিবে বলিয়া সিদ্ধান্ত হওয়ায়,—জনসাধারণ আশু বিপদ্‌পাতের উদ্বেগ হইতে কতকটা রক্ষা পাইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে এপ্রকার ভ্রান্তিজনক সংবাদ প্রচার কিঞ্চিৎ সম্ভবপর এবং সেজন্য গণক জ্যোতিষীকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না,—কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকযুগে তথাকথিত জ্যোতিষী ফাল্‌ব সাহেব কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত প্রকার উদ্বেগজনক সংবাদপ্রচার বড়ই অদ্ভুত !

আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌গণের মধ্যে অনেকেই ফাল্‌বের ভবিষ্যৎবাণীর বিরুদ্ধে নানা যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রধান যুক্তি এই যে,—ফাল্‌ব সাহেব যে ধূমকেতুটীর সংঘর্ষণে পৃথিবীর আশু ধ্বংস কল্পনা করিতেছেন, সেই বয়েলার ধূমকেতুই বহুকাল হইল, কোনও অপরিজ্ঞাত কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে,—এই মৃত জ্যোতিষ্ক দ্বারা কোন প্রকারে পৃথিবীর ধ্বংসসাধন হইতে পারে না। বয়েলার ধূমকেতু প্রাচীন ও আধুনিক জ্যোতিষীদিগের নিকট চিরপরিচিত,—বহুকাল হইতে এই ধূমকেতুটী সার্দ্ধ ছয় বৎসরে সূর্য্যপ্রদক্ষিণ করিয়া ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে পৃথিবীকে দর্শন দিয়া আবার অন্তর্হিত হইতেছিল। গত ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহার এই প্রকার নিয়মিত গতি ও আকারাদি প্রত্যক্ষ হইয়াছিল,—কিন্তু ১৮৪৬ অব্দে যথাসময়ে ইহার উদয় পর্য্যবেক্ষণ-কালীন চিরপরিচিত বয়েলার ধূমকেতুর পরিবর্ত্তে, দুইটী নিহারিকাময় জ্যোতিষ্কের উদয় দেখিয়া দর্শকমাত্রেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ প্রায় চারিমাস ধরিয়া জ্যোতিষ্কযুগল পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন এবং এই অল্পসময় মধ্যে ইহাদের পরস্পর ব্যবধান ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া তাঁহাদের বিস্ময়ও ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার পর জ্যোতিষ্কযুগল দৃষ্টি বহির্ভূত হইয়া পড়ায়, তখন আর কোনও নূতন পর্য্যবেক্ষণের সুযোগ হইয়া উঠে নাই,—কিন্তু ধূমকেতুটী যে কোনও আভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক কারণে দ্বিধা খণ্ডিত হইয়া জ্যোতিষ্কযুগ্মে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে

আর কাহারও সন্দেহ ছিল না। এই অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপারে বিস্মিত হইয়া জ্যোতিষিমাত্রেই ১৮৫২ অব্দের ধূমকেতুর উদয় পরিদর্শন করিবার জন্য উৎসুক ছিলেন,—নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হইল, এবারও বয়েলার ধূমকেতু যুগ্মজ্যোতিষ্কাকারে আকাশপ্রান্তে উদিত হইল। পণ্ডিতগণ গণনা করিয়া দেখিলেন, ইতিপূর্ব্বে জ্যোতিষ্ক খণ্ডদ্বয়ের মধ্যে যে ব্যবধান দেখা গিয়াছিল, —এই কয়েক বৎসর মধ্যে তাহার আটগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। তারপর আবার যথাসময়ে জ্যোতিষ্কযুগল অস্তমিত হইল; জ্যোতিষিগণ ভাবিলেন, নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে তাহাদের আবার পুনঃ উদয় হইবে,—কিন্তু ইহাই বয়েলার শেষ অস্ত হইয়া গেল। ১৮৫২ অব্দের পর পাঁচ ছয় বার উদয়কাল অতীত হইয়া গিয়াছে,—জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ সুবৃহৎ দূরবীক্ষণ সাহায্যে ও বহুযত্নেও বয়েলার-ধ্বংসাবশেষ সেই জ্যোতিষ্কযুগ্মের আর দর্শনলাভ করিতে পারেন নাই!

সুবিখ্যাত বয়েলার ধূমকেতুর এই বিস্ময়কর পরিণাম আধুনিক জ্যোতিষশাস্ত্রের একটী সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা। ছোট বড় জ্যোতিষিমাত্রেই এই স্মরণীয় ব্যাপারটীর সহিত বিশেষ পরিচিত,—ফাল্‌ব সাহেব, লোকপ্রসিদ্ধ সেই বাস্তব ঘটনার অস্তিত্ব ফুৎকারে উড়াইয়া, কি প্রকারে লুপ্ত জ্যোতিষ্কটীর পুনরাবির্ভাবের কল্পনা করিলেন, তাহা জ্যোতিষজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই নিকট প্রহেলিকাবৎ বোধ হইতেছে।

কোন একটা নূতন অদ্ভুত তত্ত্ব প্রচারিত হইলে, আজকাল তাহার প্রতিপোষক যুক্তির বড় একটা অভাব দেখা যায় না। বিষয়টী যতই অসম্ভব হউক না কেন,—পণ্ডিতসম্প্রদায় দ্বিধা বিভক্ত হইয়া তদাবলম্বনে হাস্যকর কৃত্রিম যুদ্ধের অবতারণা করিয়া থাকেন। ফাল্‌ব সাহেবের সিদ্ধান্তও প্রচারিত হইলে, তৎ-পোষক যুক্তির অভাব হয় নাই,—ইহার উক্তির সত্যতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য শুনা যাইতেছে, কয়েকজন পণ্ডিতও নাকি অদ্যাপি নানা যুক্তি উল্লেখ করিতেছেন। এই পণ্ডিতগণের প্রধান যুক্তি এই যে,—বয়েলার ধূমকেতু কোন অপরিজ্ঞাত কারণে আকারান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে বটে, কিন্তু ইহার উপাদান সামগ্রী লয়প্রাপ্ত হয় নাই,—সেগুলি উল্কাপিণ্ডাকার ধারণ করিয়া সেই ধূমকেতুর গতিতে যথানিয়মে সূর্য্যপ্রদক্ষিণ করিতেছে;—আগামী নভেম্বর মাসে পৃথিবী সেই উল্কাস্রোতের সংঘাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। বয়েলার উল্কাকার-

প্রাপ্তির কথা কতকটা সত্য,—গত ১৮৭২ ও ১৮৮৫ সালে ২৭শে নভেম্বর বয়েলার উদয়কাল নির্দ্দিষ্ট ছিল, এই উভয় দিবসেই ধূমকেতুর পরিবর্ত্তে বহুসংখ্যক উল্কাপাত পর্য্যবেক্ষকদিগের নয়নগোচর হইয়াছিল,—ইহাতে অনেক পণ্ডিত অনুমান করিতেছেন, সম্ভবতঃ সেই বয়েলার ধ্বংসাবশেষ ও তাহার উপাদানসামগ্রী অধুনা উল্কাপিণ্ডাকার ধারণ করিয়া সূর্য্য পরিভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু এই উল্কারাশির সংঘর্ষণে পৃথিবীর ধ্বংস সম্ভবপর কি? উল্কাপিণ্ড-মাত্রেরই আকার অতীব ক্ষুদ্র, এজন্য ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিই পৃথিবীতে পতিত হইবার সময় বায়ুসংঘর্ষণজাত তাপ দ্বারা বাষ্পীভূত হইয়া যায়, তাহাদের অতি ক্ষুদ্র অংশও প্রায়ই ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় না। ফাল্বের সহযোগী পণ্ডিতগণ এই প্রকার উল্কাপিণ্ড দ্বারা কি প্রকারে পৃথিবীর ধ্বংস কল্পনা করিতেছেন,—তাহা কিছুতেই বুঝা যায় না। পৃথিবীর সুদীর্ঘ জীবনের ইতি-হাসে ভয়ানক উল্কাময়ী রজনীর বিবরণ নিতান্ত বিরল নয়,—গত ১৮৩৩, ১৮৬৬ এবং ১৮৮৫ অব্দের নভেম্বর মাসে জ্যোতির্ব্বিদগণ আকাশের সর্ব্বাংশ হইতে অজস্র উল্কাবর্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন,—১৮৬৬ অব্দের বর্ষণে প্রতি মুহূর্ত্তে লক্ষাধিক উল্কাপাত দৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু এই সকল বর্ষণদ্বারা পৃথিবীর অণুমাত্র ক্ষতি হয় নাই, বরং উল্কাপিণ্ড সকল পৃথিবীকে আক্রমণ করিতে আসিয়া আপনারাই পথিমধ্যে ভস্মীভূত হইয়াছিল। উল্কাপাত দ্বারা পৃথিবীর ধ্বংস কতদূর সম্ভব, এখন পাঠকপাঠিকাগণ বিবেচনা করুন।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

চৌ-ঘাট।

সূর্য্যদেব মাথার উপর। স্থির আকাশের নীচে চঞ্চল মেঘগুলা সেই মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত রৌদ্রে জ্বালাতন হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিতেছিল। আমরা পাহাড়ের এক নিভৃত উপত্যকায় দাঁড়াইয়া কোনদিকে যাইব কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। আমার সঙ্গী বন্ধু বলিলেন "দেখ! সাহেবরা রাশি রাশি

Adventure সম্বন্ধে বই লিখিতে পারে—কত অজানিত, বিপদসঙ্কুল জনপদ বেড়াইয়া আসিয়া তাহার মনোরম বৃত্তান্ত লিখিতে পারে, আমরা বাঙ্গালী পাঠককে দুই চারিটা ছোট গোছের "এ্যাড্‌ভেঞ্চার" এর নমুনা দিতে পারিব না।"

আমি বলিলাম "বেলা হইয়াছে, সূর্য্যদেব আকাশের মধ্যস্থানে। পাহাড় ক্রমশঃ তাতিয়া উঠিতেছে, চল আজ নামিয়া পড়ি, কাল যা হয় হইবে। খুব প্রাতে পাহাড়ে উঠিয়া তোমার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিব।" আমার যুক্তি টিকিল না। সেই নাছোড়বান্দা বন্ধুর অনুরোধে পড়িয়া আবার উপত্যকার মধ্যে অগ্রসর হইতে হইল।

সেই নর্ম্মদাতীরে—সেই প্রচণ্ড মধ্যাহ্নে, সেই বৃক্ষলতা-গুল্মাদি-পরিপূর্ণ পাহাড়ের উপত্যকার তপ্ত কঙ্কররাশির উপর দিয়া আবার চলিতে লাগিলাম। শরীর বাহিয়া বর্ষার ধারার ন্যায় ঘর্ম্মপ্রবাহ। বন্ধুটী আমা অপেক্ষা স্থূলকায়—তাঁহারই কষ্ট বেশী, কিন্তু তবুও তিনি নিরস্ত হইবার পাত্র নহেন। উদ্যম ও একগুঁয়েমির মধ্যে নিশ্চয়ই একটা পার্থক্য আছে। মনোবিজ্ঞানের সত্যমতে বিশেষ পার্থক্য না পাইলেও আমি বলিব পার্থক্য বড় অল্প নহে। তাহা না হইলে—এই প্রচণ্ড মধ্যাহ্নে ঘর্ম্মাপ্লুত কলেবরে, চড়াই ওৎরাই ঠেলিয়া এই অধমের শারীরিক নিগ্রহের জন্য বন্ধুর এই Adventure এর চেষ্টা কেন? আমার পাহাড়ী পথপ্রদর্শক ইতিপূর্ব্বেই তাহার পত্রময় ছাতিটী আমার ব্যবহারের জন্য দিয়া, বেচারা তাহার পাগড়ীর অন্তরালে থাকিয়া মাথাটাকে সূর্য্যের রোষবহ্নি হইতে রক্ষা করিতেছিল। আমি বন্ধুকে বলিলাম "তুমি ছাতিটী লও।" তিনি তাহাতেও নারাজ। তিনি বলিলেন, "ছাতি লইয়া ঊর্দ্ধ প্রকৃতিকে ও আশপাশের দৃশ্যকে নয়নের অন্তরাল করিতে পাহাড়ে উঠি নাই। প্রাকৃতিক দৃশ্যের ক্রমঃ পরিবর্ত্তন দেখিব বলিয়াই এ রৌদ্রে এত কষ্ট করিতেছি। আমায় বরঞ্চ এ পাহাড়ীগাইডের লাঠীগাছটা দাও, অনেক কাজে লাগিবে।" গাইডবেচারি নিজের লাঠী তাহাকে দিয়া তৎক্ষণাৎ একটা শক্তগাছের ডাল ভাঙ্গিয়া লইল। ডালটা খুব ঘন পল্লবাবৃত। তাহাতে সে ছাতার কাজ করিতে লাগিল।

বন্ধুর মনের ইচ্ছা কি তাহা জানিতাম। তিনি চান্—তিনি যত অগ্রসর হইবেন, দুই ধারে প্রস্রবণ, বনফুল অজস্র দেখিতে পাইবেন। তাঁহার

ভ্রমণপথের আশেপাশে তড়াগতটিনী অনেক থাকিবে। হ্রদের জলে ক্রৌঞ্চ, ক্রৌঞ্চী, সারস, বক প্রভৃতি কবিবর্ণিত পাখীগুলি খেলা করিবে। সরোবরে বায়ুভরে পদ্মফুল হেলিতে দুলিতে থাকিবে, ভ্রমর মধুপান করিবার জন্য দোদুল্যমান পদ্মরাশির চারিদিকে গুন্ গুন্ শব্দ করিবে। সন্ধ্যা সমাগমে নদীর এপারে চক্রবাক্—আর ওপারে চক্রবাকী দু'জনে পরস্পরের মুখ চাহিয়া নীরবে বসিয়া থাকিবে। দলে দলে ময়ূর উপত্যকায় ছুটিয়া যাইবে। দলে দলে হরিণগুলা সিং ঘুরাইয়া লাফাইয়া লাফাইয়া দৌড়িবে—কিন্তু তাঁহার বড়ই আপশোষ, তিনি এসবের কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

আমি ত আর হাঁটিতে পারিতেছিলাম না। ক্ষুধার উদ্বেগ যথেষ্ট হইয়াছিল, নিকটেই একটা ক্ষুদ্র প্রস্রবণের জল ধিকি ধিকি বহিয়া একটী নাতিদীর্ঘ নাতিক্ষুদ্র গর্ত্তে সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহাই অঞ্জলি ভরিয়া পান করিলাম! মাঝে মাঝে পাহাড়ীয়া আমলকী গাছ। গুচ্ছ গুচ্ছ ফল তাহাতে ঝুলিতেছে, যেন আঙ্গুরগুলা রসে পূর্ণ হইয়া প্রলুব্ধ পথিককে আহ্বান করিতেছে। দুই চারিটা আমলকী মুখে ফেলিয়া দিলাম—প্রাণ যেন ঠাণ্ডা হইয়া গেল।

বন্ধু আমার আগে আগে। একরশি দূরে বাঁকপথে চলিয়াছেন। সহসা দেখিলাম তাঁহার গতিরোধ! তিনি চস্মাখানির সহিত মুখখানি বাঁকাইয়া উৎক্রোশ দৃষ্টিতে চারিদিক দেখিতেছেন। আর পথ নাই। এবার প্রকাণ্ড প্রস্তরস্তূপে পথ আবদ্ধ! তিনি আনন্দে বলিয়া উঠিলেন—"এইবার হইয়াছে।"

আমি মনে মনে ভাবিলাম, হয়ত তিনি একটা স্বর্ণখনি না হয় হীরকখনি আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার মুখে তখন খুব হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আমি বলিলাম "কি হইয়াছে।"

তিনি বলিলেন—"যাহা চাই—তাহাই পাইয়াছি, দেখিতেছ না সম্মুখে পথ বদ্ধ। এইবার পাহাড়ের উপর উঠিব।"

আমি এবার বড় ত্যক্ত হইলাম। দ্বিপ্রহর অতীত, ক্ষুৎপিপাসায় মরিতেছি—এখন কিনা তাঁহার পাহাড়ে উঠিবার সখ হইল। আমি বলিলাম, "তুমি পাগল হইলে নাকি? ঐ অমসৃণ প্রস্তরখণ্ডের উপর উঠিলেই পা পিছ্লিয়া যাইবে। তখন কোথায় পড়িবে ভাবিয়াছ কি?"

কে কাহার কথা শুনে? তিনি স-বুট তাহার উপর উঠিলেন। এই প্রকাণ্ড প্রস্তরস্তূপ পাহাড়ের এক কর্ত্তিত অংশ। খুব মিশ্ কালো পাথর, উচ্চে প্রায় আমাদের দেশের একতালা বাড়ীর মত। তাহার গায়ে কতকগুলা বন্যলতা ঝুলিতেছিল, বন্ধু তাহাই ধরিয়া এক টান দিলেন—কিন্তু অব্যবহিত পরেই "বাপরে" বলিয়া নীচে পড়িয়া গেলেন।

আমার বড় ভয় হইল। সাপে কামড়াইল কিনা—এই ভাবনায় অস্থির। তাহা ছাড়া মনে হইল—পাহাড়ে ভীমরুলগুলা বড়ই দুর্দ্দান্ত, হয়ত বন্ধুবর তাহাদেরই পাল্লায় পড়িয়াছেন। তিনি যে গুহার মধ্যে নিদ্রিত ব্যাঘ্র কি সিংহ কিম্বা কুণ্ডলিত অজাগর দেখেন নাই, তাহা আগে হইতেই জানিতাম।

আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম, হইলও তাই। সত্য সত্যই একটা ভীমরুল তাঁহার হাতে হুল ফুটাইয়াছে। মুহূর্ত্তমধ্যে সেস্থান এত ফুলিয়াছে যে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। আমার সঙ্গী পাহাড়ী বলিল—"বাবুসাহেব! বাঁক ফিরিয়া দূরে গিয়া বসুন, নিকটে নিশ্চয়ই চাক আছে, এখনি ঝাঁকে ঝাঁকে ভীমরুল বাহির হইয়া পড়িলে, কাহারও নিস্তার নাই। পাহাড়ীয়া ভীমরুল অতি ভয়ানক।"

পাহাড়ী এই কথা বলিয়া একটু দূরে গেল। একটা গাছের পাতা লইয়া প্রায় দশমিনিট পরে আসিল। তাহার রস নিষিক্ত করিয়া সেই দষ্ট-স্থানের উপর লাগাইল। বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেমন কিছু উপকার বোধ করিতেছ কি?"

"হাঁ জ্বালাটা অনেক কম। চল আর Adventure এ কাজ নাই। প্রাণে বাঁচিলে অনেক দেখিব।"

আমি মনে মনে বলিলাম—পথে এস। দুর্ব্বল উদ্যমহীন ভীরু বাঙ্গালী যে পাহাড়ে উঠিলেই কষ্টসহিষ্ণু হয় না তাহা বেশ বুঝিলাম। ইচ্ছা করিলেই সহজাত প্রকৃতির পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায় না। এই জন্যই অনেক বিলাত ফেরত বাঙ্গালী পূরা সাহেব সাজিতে পারে নাই। এক ভীমরুলের জ্বালার স্রোতে বন্ধুর Adventure এর অত বড় একটা কল্পনা ও তাহার আনুসঙ্গিক উদ্যমটা ভাসিয়া গেল, ইহাতে অধিকতর আশ্চর্য্য হইবার কারণ ছিল না। ঈশ্বর তাঁহার সুমতি দিয়াছেন

দেখিয়া আমি বলিলাম—"এইবার আশার ত অর্দ্ধেক ফল হাতেই পাইলে। এখন ফিরিয়া চল।"

বন্ধুবর অপ্রস্তুত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আবার যে পথে আসিয়াছিলাম, সেই পথে ফিরিতে লাগিলাম। তখনও নর্ম্মদা-প্রপাতের দূর-শ্রুত অস্ফুট নিনাদ আমাদের কাণে বাজিতেছিল।

পাহাড়ী বলিল—"বাবুসাহেব! নিকটে চৌঘাট, চলুন স্নান করিয়া আসি।"

বাস্তবিক তখন স্নানের জন্য বড় একটা আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে। আমরা তাহার সঙ্গে সঙ্গে চৌঘাটে পৌঁছিলাম। অবগাহন স্নানে একটা বড়ই মনে তৃপ্তি জন্মিল। টাঙ্গার মধ্যে খাবার ছিল, স্নানান্তে তাহাতেই যথাসম্ভব উদর-পূর্ত্তি করিলাম।

"চৌঘাট" নাম হইল কেন, তাহা পাহাড়ী গাইড বলিতে পারিল না। কেবল বলিল—এইখানে মালবদেশীয় কোন রাজা তাঁহার আজীবন অনূঢ়া চারিটী কন্যার স্নানের জন্য চারিটী ঘাট তৈয়ারি করিয়া দিয়াছিলেন। কোথায় বা সেই রাজা, আর কোথায় বা সেই ঘাটের চিহ্ন। নিকটে একটী ঝোপের আশেপাশে কতকগুলি ভাঙ্গা সিঁড়ি দেখিলাম। বোধ হইল এই-খানেই সেই ঘাট ছিল, নর্ম্মদা এখন স্রোত পরিবর্ত্তন করিয়া ঘাট ছাড়িয়া অনেক দূরে পড়িয়াছে।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

খুকুমণির ছড়া।

"এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি বঙ্গ-সাহিত্যে বোধ করি একটা নূতন উদ্যম। ইহার একটা ভূমিকা আবশ্যক।"—সেইজন্য বঙ্গসাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় একটী সুদীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়া প্রকাশক মহাশয়ের উদ্যমের ও অধ্যবসায়ের যথাযোগ্য সাধুবাদ করিতে গিয়া প্রসঙ্গ ক্রমে পুস্তক সম্বন্ধেও কিছু কিছু সমালোচনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

সমালোচনার জন্য সচরাচর যে সকল পুস্তক প্রেরিত হইয়া থাকে, ইহা সে শ্রেণীর নহে। আকারে প্রকারে, ছাপায় ছবিতে সকল বিষয়েই নূতনত্ব আছে। সর্ব্বাপেক্ষা নূতনত্ব এই যে, যাহাদের জন্য এই পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে, তাহারা কেহই হয়ত ভাল করিয়া ইহা পড়িতে শিখে নাই। ইহার নাম খুকুমণির ছড়া—কিন্তু ইহাতে খুকুমণি, খোকাবাবু, খুকুখোকার মা, বাপ, ভাই, বোন, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, ননদ, ভাইজ, জামাতা এবং বধূর কথাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

খুকুমণির ছড়ায় যে সকল কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা এতকাল বাঙ্গালীর বাল্যজীবনের অলিখিত কাব্যভাণ্ডারে লুক্কায়িত ছিল—অনেকেই তাহা একসময়ে কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন, অনেকেই তাহা প্রতিনিয়ত বালক বালিকার মুখে শ্রবণ করিয়া থাকেন, কিন্তু অল্পলোকেই তাহার তত্ত্ব প্রদান করিতে সক্ষম। এই সকল ছড়ায় যে কাব্যরস নাই তাহা নয়; কিন্তু ইহাতে সর্ব্বত্র ছন্দ নাই, মিল নাই, নিয়ম নাই, অথচ যথেষ্ট পরিমাণে চিত্তাকর্ষণ করিবার উপযোগী কৌতূহলের সঙ্গে বিস্ময় মিলিত হইয়া রহিয়াছে।

ইংরাজিভাষায় এরূপ গ্রন্থের অভাব নাই। বাঙ্গালায় ইহার যে অভাব ছিল, তাহা এই ক্ষুদ্র পুস্তক কিয়দংশ দূর করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু অনেকেই জিজ্ঞাসা করিবেন—খুকুমণির ছড়া লইয়া ছেলেমী করিবার প্রয়োজন কি? যাহা এতকাল মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছে, তাহাকে ছাপার অক্ষরে মুদ্রানিবদ্ধ করিবার জন্য এত প্রয়াস কেন? ইহাতে বঙ্গসাহিত্যেরই বা এমন উপকার কি?

ত্রিবেদী মহাশয় তদুত্তরে লিখিয়াছেন,—"যাহাতে কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সমাবেশ নাই, এমন কোন কথা আমাদের পণ্ডিত সম্প্রদায়ের অনুরাগ আকর্ষণে সমর্থ হয়না, কিন্তু শিশুজনপ্রিয় সাহিত্যের ভিতর হইতে সেরূপ কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিষ্কাশনে আমি একান্ত অক্ষম। তবে প্রসঙ্গক্রমে এ কথা বলিয়া রাখিতে পারি যে, এই সাহিত্যে কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, নিহিত না থাকিলেও, হয়ত দুই একটা ঐতিহাসিক তত্ত্ব, দুই একটা সামাজিক তত্ত্ব সঙ্গোপনে লুক্কায়িত থাকিতে না পারে, এমন নহে। ভূতত্ত্ব-

বিদেরা একখানা দাঁত বা একখানা হাড় অবলম্বন করিয়া পৃথিবীর অতীত ইতিহাসের এক একটা নূতন পরিচ্ছেদ উদ্‌ঘাটিত করিয়া ফেলেন। সেইরূপ ভবিষ্যতের কোন গ্রিম্ বা মোক্ষমোলর এই বাঙ্গালীর ছেলের ছেলেমি-ভাণ্ডারের মধ্য হইতে দুই একটা নাম বা শব্দ বা বাক্য অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের অতীত ইতিহাসের কোন বিস্তৃত অধ্যায় আবিষ্কারে সমর্থ হইবেন কি না, জানি না।”

মানুষ আশৈশব কাব্যামোদী। সে যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তখনই যে কেবল তাহার সৌন্দর্য্য-তৃষ্ণা তাহাকে কাব্যজগতের দিকে আকর্ষণ করে, তাহা নয়। বরং সৌন্দর্য্যই আবাল্য মানুষকে মানুষ করিয়া তুলে,—মাতৃ-মুখে যে সৌন্দর্য্যের ছবি ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহা দেখিতে দেখিতেই শিশুর দেখিবার অভ্যাস, দৃষ্টির সংযোগ, সংকোচ, সম্প্রসারণ ইত্যাদির শিক্ষা হইতে থাকে। শিশুমাত্রেই কৌতূহলপ্রিয়, নিয়ত কার্য্যের কারণ আবিষ্কারার্থ যত্ন-শীল; এবং সেই বৈজ্ঞানিক কার্য্যসম্পাদনের জন্য পুতুল ভাঙ্গিয়া তাহার অভ্যন্তরস্থ গঠনকৌশল অবলোকন করিতে গিয়া লাঞ্ছিত, তাড়িত অথবা অযথা প্রহারিত হয়! এ সকলের মূলে যে সৌন্দর্য্যপিপাসা বর্ত্তমান, শিশু তাহাকে কথায় বুঝাইয়া দিতে পারে না; কার্য্যে প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহার কাব্যামোদী সরল হৃদয় মিল চাহে না, ছন্দ চাহে না, সঙ্গতি চাহে না, অনেক সময়ে কোন অর্থ বা ভাবও চাহে না;—কেবল স্বরের ধ্বনি, কণ্ঠের কম্পন, তাহার সহিত পরিচিত বা অপরিচিত কতকগুলি বিষয়ের বর্ণনা থাকিলেই শিশুকাব্য পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠে। যখন হইতে মানব পিতা মাতা শিশুপালন আরম্ভ করিয়াছেন, বোধ হয় তখন হইতেই শিশুকে শান্ত করিবার জন্য, আমোদ দিবার জন্য, আদর করিবার জন্য, বুকে ধরিবার, চুমা খাইবার, মাথায় তুলিবার উপলক্ষে এই শ্রেণীর কাব্য রচনা করিয়া আসিয়াছেন। কবির হৃদয় মনও সংস্পর্শগুণে কতকটা শিশুভাবাপন্ন ও কতকটা আত্মবিস্মৃত মন্ত্রমুগ্ধবৎ না হইয়া যায় নাই—তাই আবল তাবল বাহির হইয়া পড়িয়াছে। যদি পুরাকাল হইতে এই সকল কবিতা লিপিবদ্ধ হইয়া আসিত, তবে তাহার মধ্যে রচনাকাল, তৎকাল প্রচলিত চিন্তাপ্রবাহ, সামাজিক আচার ব্যবহার ও ভাষাতত্ত্বসম্বন্ধে অনেক কথাই প্রাপ্ত হইবার আশা থাকিত। যথা-

কালে লিপিবদ্ধ হয় নাই বলিয়া মুখে মুখে বহুকথা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, এখনও ক্রমশঃ কত না পরিবর্ত্তিত হইতেছে! একবার ছাপার কাগজে তুলিলে তাহার গতিরোধ হইতে পারে—কেবল এই উদ্দেশ্যে ছড়াগুলি মুদ্রিত করিলেও সে উদ্যমকে নিন্দা করা চলিত না।

তাহা ছাড়া এরূপ ছেলেমীর আরও সাফল্য আছে। ইহাতে বাঙ্গালীর প্রাথমিক শিক্ষার আদ্যক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়; তৎপ্রতি পিতা মাতার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইবার অবসর ঘটে। যে সকল ছড়া প্রচলিত আছে, তাহা কেহ আইন করিয়া রদ করিতে পারিবেন না। শিশু কোন শিক্ষা পাইবার পূর্ব্বেই এই সকল ছড়ায় জুজুর ভয় শিখিবে, ভাবী বিবাহ বাসরের আনন্দলহরীতে সন্তরণ দিবে, ভাল এবং মন্দ অনেকগুলি শৈশবস্মৃতি লইয়া জীবনপথে দণ্ডায়মান হইবে। পাঠ্য পুস্তকের ন্যায় এই সকল ছড়াও লোক শিক্ষার উপাদান বলিয়া ইহাকে ক্রমশঃ একটু আধটু করিয়া সংশোধন করা কর্ত্তব্য। মুদ্রিত পুস্তক হাতে পাইলে কেহ আর কষ্ট করিয়া প্রৌঢ়ার নিকট শুনিয়া শিখিবে না;—এক টাকায় একখানি এমন ছাপা, এমন ছবি এবং এমন ছড়া পাইলে অনেকেই ইহা হস্তগত করিয়া পড়িয়া লইবে। সুতরাং "খুকুমণির ছড়া" হইতে যাহা বাদ পড়িয়া যাইবে, বা যাহা পরিবর্ত্তিত হইবে, তাহা ক্রমে বিস্মৃতিগর্ভে ডুবিয়া পড়িবে।

এ হিসাবে সমালোচ্য গ্রন্থের অনেক কবিতা পরিত্যক্ত বা পরিবর্ত্তিত হইলে ভাল হইত। প্রকাশক মহাশয় ঐতিহাসিক অনুরাগে যথাশ্রুত সমস্তই মুদ্রিত করিয়াছেন, কিন্তু তাহা না করিলেও খুকুমণিরা তাঁহার ভুল ধরিতে চাহিত না।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকে শতাধিক ছবি এবং ২৪৪টী কবিতা আছে। কবিতাগুলি বাঙ্গালীর নিকট অপরিচিত নহে, সুতরাং উদ্ধৃত করিয়া নমুনা দেখাইবার প্রয়োজন নাই। তবে ছবির নমুনা দেখাইবার জন্য এবং ছবি বুঝাইবার জন্য দুই চারিটী ছড়ার নমুনা দিতে হইল।

বাঙ্গালীর খুকুর কাণে, বুঝি আজন্মই বিয়ার কথা ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে! পিতা মাতা দাস দাসী আত্মীয় অন্তরঙ্গ কেহই খুকুকে দেখিবার

সময়ে মন হইতে খুকুর বিয়াকে দূরে রাখিয়া খুকুর কথা ভাবিতে পারে না। তাই খুকুমণির ছড়ায় নানাস্থানে স্থান পাইয়াছে :—

খুকুর বিয়ে।

খুকুমণির বিয়ে কাল
আধ্‌খানি মসুরির ডাল!*
বর খাবে বরযাত্রী খাবে,—
পাড়াপড়শী এসে যাবে!
নর্দ্দমা দিয়ে ভেসে যাবে!!

আমরা খুকুমণি ও খোকাবাবুদিগকে লইয়া সচরাচর যাহা করিয়া থাকি, প্রকাশক মহাশয়ও বোধ হয় অজ্ঞাতসারে তাহারই অনুসরণ করিয়া ছড়াগুলি পর্য্যায়ক্রমে সাজাইয়াছেন। কোলে লইয়া চুমা,—ইহাই আদর করিবার সনাতন প্রথা।

ঝাঁপিয়ে কোলে আয় দেখি মা,
গাল ভরে দিই হাজার চুমা!

খুকু অনেক সময়ে এতটা জবরদস্তি সহ্য করিতে পারে না। কবিতায় না হইয়া, কার্য্যে খুকুর মা হাজার চুমা দিতে বসিলে মা ও মেয়ে উভয়ের পক্ষেই যে সাংঘাতিক হইতে পারে, খুকু ততটা বৈজ্ঞানিকতত্ত্বের সন্ধান রাখে না; সে হয়ত স্বাধীনতায় বাধা পাইয়া বা অজ্ঞাতরোগে পীড়িত হইয়া বা অনর্থক আদর আব্‌দারে জ্বালাতন হইয়া কাঁদিয়া উঠে। আমরা তখনই তাহাকে শুনাইতে বসি :—

এক যে আছে একা নোড়ে
সে থাকে তালগাছে চড়ে।

*　　*　　*　　*

যে ছেলেটা কাঁদে,
তারে ঝুলির ভেতর বাঁধে ;
গাছের উপর চড়ে,
আর তুলে আছাড় মারে !

প্রকাশক মহাশয় সেই একানোড়ের একটী সুচিত্র সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

যাদু ঘুমোরে ঘুমো ;
শান্তিপুরে বাঘ এসেছে
দারুণ হুমো !

ইহাও সেই শ্রেণীর ছড়া। হয়ত বিষবৃক্ষ পড়িবার অবসর ঘটিতেছেনা, কিম্বা এইরূপ আর কোনও অনিবার্য্য কারণে বঙ্গীয়মাতা কোলের যাদুকে হুমোর ভয় দেখাইয়া তাড়াতাড়ি কোনরূপে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন ! একটু ক্লোরোফরম্ শোঁকাইলেও চলিত, তবে ফলটা কিছু তাড়াতাড়ি ফলিত—ছড়ার ঝোঁক শীঘ্র ধরে না, কিন্তু আজন্ম ছুটিতে যায় না। খুকুমণির পিতা মাতা এখনও বোধ হয়, অস্থিমজ্জার মধ্যে তাহা অনুভব করিয়া থাকেন !

খুকুমণির ছড়া বাঙ্গালীর বাল্যজীবনের ছবি। ভাল হউক বা মন্দ হউক—ছবিখানি নিখুঁত হইয়াছে। যেখানে যতটুকু গুণ, যেখানে যতখানি দোষ,—বাঙ্গালী জীবনের সে সমস্তই এই ছবিতে অবিকল বিচিত্র রহিয়াছে। এই শৈশবচিত্র যে কেবল শিশুগণেরই কৌতুকবর্দ্ধন করিবে তাহা নয়, অনেক বর্ষীয়ান্ বর্ষীয়সীও ইহা হইতে প্রচুর আমোদের সঙ্গে শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন। আমরা যাহা করিয়া যাই, অনেক সময়ে তাহার ভাল মন্দ দেখিতে পাই না—তাহার মধ্যে কত অসঙ্গতি, কত প্রহসনের চিত্র, কত অন্যায় ও অবিচার থাকিয়া যায়, তাহা যখন কেহ চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দেয়, তখনই জ্ঞানোদয় হয়। আমরা দশজনে মিলিয়া যুগযুগান্তর ধরিয়া খুকুমণির জন্য যে সকল ছড়া গাঁথিয়া আসিয়াছি, গাঁথিবার সময় তাহার ভাল মন্দের বিচার করি নাই—এখন পুস্তকাকারে সঙ্কলিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতেছি, ইহার সকলগুলি সমান সরস হয় নাই, অনেকগুলি আদৌ শিশু কর্ণ কলুষিত না করিলেই ভাল হইত। দুই চারিটী স্থল এমনও রহিয়া গিয়াছে, যাহার অর্থ জিজ্ঞাসার জন্য খুকুমণি পীড়াপীড়ি করিলে মুস্কিলে ঠেকিতে হইবে !

এই সকল ছড়া এক সময়ের রচিত নহে; কিন্তু কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া প্রাচীন পদাবলী নিয়ত নবভাবে রূপান্তরিত হইতেছে। পুরাতনের মধ্যে কেবল দুই চারিটী মানুষ বা স্থানের নাম পাওয়া যায়,—তাহাতেও কোন ঐতিহাসিক বিশেষত্ব নাই।

না থাকুক, তথাপি খুকুমণির ছড়ায় যে আনন্দ ও আবেগ আছে, তাহা পাঠ্যগ্রন্থভারগ্রস্ত বঙ্গ-বালক-বালিকার বিমর্ষ মুখমণ্ডলে স্বাস্থ্যসুখের উৎফুল্লতা আনিয়া দিতে পারিবে। শিশু যাহা পড়িবে তাহাই তাহার শিক্ষার বস্তু; তাহাকে নিয়ত পাঠ্যগ্রন্থে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখায় পাঠের স্পৃহা ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এই সকল গ্রন্থে পাঠের আকাঙ্ক্ষা প্রবুদ্ধ হইবে; হাতে পাইলে বালক বালিকারা কাড়াকাড়ি করিয়া পড়িবে, পড়িতে পড়িতে (আর কিছু না হউক) পড়ার অভ্যাস জন্মিতে পারে।

ছড়ার সঙ্গে ছবি মিলিত হইয়া শিশুগণের আমোদ কিছু সরস করিয়া তুলিয়াছে। চিত্রবিদ্যায় আমরা এখনও তেমন পারদর্শী হই নাই; তথাপি ছবিগুলি বিলাতী ছবির মতই হইয়াছে।

খুকু যাবে শ্বশুরবাড়ী সঙ্গে যাবে কে?

বাড়ীতে আছে কটা* বেরাল কোমর বেঁধেছে।

এই ছড়ার সঙ্গে ছবি মিলিয়া খুকুমণির বিবাহবাসরকে প্রচুর পরিমাণে রসময় করিয়া তুলিয়াছে। অতঃপর আর খুকুমণির দুঃখ কি?

দুঃখ এই যে, এমন সরস সুন্দর পুস্তকখানি পড়িতে না পড়িতে শীঘ্রই ফুরাইয়া গেল; সুতরাং প্রকাশকের সঙ্গে সমালোচককেও খুকুমণির মুখ দিয়া বলাইতে হইবে।

আমার কথাটী ফুরালো,
নটে গাছটী মুড়ালো।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

---

*কটা শব্দ মূলে নাই। কিন্তু যাহা আছে তাহার স্থলে কটাশব্দ বসাইয়া দিলে, খুকুমণির আমোদের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইবার কথা নাই, অথচ মূল কবিতার দোষটুকু কালক্রমে দূর হইবার সম্ভাবনা আছে। কিরূপ স্থলে পরিবর্ত্তন প্রার্থনীয় তাহা বুঝাইবার জন্য এই দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল। সেকালের পিতা মাতা যে সকল কথা তুলিয়া পুত্র কন্যার সঙ্গে হাস্য পরিহাস করিতেন, একালের আমরা যখন সে সকল ত্যাগ করিতে পারিয়াছি, তখন খুকুমণির ছড়া হইতেও কিছু কিঞ্চিৎ ত্যাগ বা পরিবর্ত্তন করিলে তেমন অন্যায় হইবে না। প্রকাশক মহাশয় ইহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সমালোচনা লিখিবার শ্রম সফল বোধ করিব।

রাজা রামানন্দ রায়।

রাজা রামানন্দের ভণিতাযুক্ত কতকগুলি পদ প্রাচীন পদকল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহ গ্রন্থমাত্রেই দৃষ্ট হয়। এই সকল পদের একটী ভিন্ন সকলগুলিই সংস্কৃতভাষায় রচিত। এই সংস্কৃত পদগুলির অধিকাংশই তাঁহার জগন্নাথবল্লভ নামক সংস্কৃত নাটক হইতে সঙ্কলিত। রামানন্দ রচিত দুইটী সংস্কৃত শ্লোক কৃষ্ণদাস কবিরাজ আপন গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই দুইটী শ্লোক জগন্নাথবল্লভ নাটকে দৃষ্ট হয় না। ইহা হইতে প্রতীত হয় যে, রাজা রামানন্দ রায় অবসর মত সংস্কৃত কবিতা, সঙ্গীত, বাঙ্গলাপদ এবং সংস্কৃত জগন্নাথবল্লভ নাটক রচনা করিয়াছিলেন। প্রথমাবধি দায়িত্বপূর্ণ রাজকীয় পদে নিযুক্ত থাকায় সম্ভবতঃ তিনি বিস্তরপদ বা বহুগ্রন্থ রচনা দ্বারা স্বীয় প্রতিভা ও কবিত্ব প্রকাশের সুবিধা পান নাই। বিশেষতঃ রসিকশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের ভজনানন্দ বৈষ্ণব বলিয়া গ্রন্থরচনাদি দ্বারা কীর্ত্তি অর্জ্জন সম্ভবতঃ তিনি আদৌ আবশ্যক মনে করিতেন না।

রাজা রামানন্দের জগন্নাথবল্লভ নাটক বৈষ্ণবসমাজে খুব সমাদৃত। রাগানুরাগাভক্তির পরিপুষ্টি সাধন এবং রসমাধুর্য্য আস্বাদন পক্ষে রায় রামানন্দের জগন্নাথবল্লভ নাটক প্রেমিক বৈষ্ণবগণের পরম সহায়। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু রায়ের নাটক শ্রবণে পরমানন্দ লাভ করিতেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন :—

"চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥

চৈ, চ, মধ্যলীলা, ২৩ পরিচ্ছেদ।

রামানন্দ যে নাট্যশাস্ত্রের গুণরস-বিচারে মহাপণ্ডিত ছিলেন; তাহা কৃষ্ণদাস কবিরাজ সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবনাটক-রচয়িতা সনাতনানুজ শ্রীরূপ গোস্বামীর মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন (১)। জগন্নাথবল্লভ নাটক পাঠ করিলেও প্রতীত

---

(১) চৈ, চ অন্ত্যলীলা, ১ম পরিচ্ছেদ।

হইবে যে, রামানন্দ জগন্নাথবল্লভ নাটক প্রণয়নে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের মর্য্যাদা কোথাও লঙ্ঘন করেন নাই।

জগন্নাথবল্লভ নাটকের নায়ক স্বয়ং বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণ, নায়িকা শ্রীমতী রাধিকা, ইহার পুষ্টি আদি রসে। ব্রজগোপীগণের ঐকান্তিক চেষ্টায় বিরহব্যথিত রাধাকৃষ্ণের সম্মিলন বর্ণনাবসরে কবি বিশেষ নিপুণতাসহকারে পূর্ব্বরাগাদি প্রণয়ভাবের ক্রমিক বিকাশের সুন্দর স্বাভাবিক চিত্র পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবি আবার নাটকমধ্যে স্থলে স্থলে অতীব চতুরতার সহিত হাস্যরসের অবতারণেও কম নিপুণতা প্রদর্শন করেন নাই। এস্থলে একটী স্থল উদ্ধৃত করিতেছি :—

"কৃষ্ণ। সখে, অতি মধুরোহয়ং কোকিলানাং রবঃ।

বিদূষক। ভো বয়স্স তুজ্জ বংশীএ রও, ইদো বি মহরো। তদোবি অহ্মাণং কণ্ঠরও তা তুএ বংশী বাদিঅদু, মএবি কণ্ঠরও কাদব্বো।

কৃষ্ণ। যদভিরুচিতং বয়স্য (ইতি বংশীংবাদয়তে)।

বিদূষক। ভো সুদোদে বংশীরও মমাবি কণ্ঠরও সুনীঅদু।

(ইতি মুখবৈকৃত্য) পরুষং নাদতি॥

(তরুশিখরানবলোক্য) ভো জিদং অহ্মোহিং তুজ্ঝ বংশীএ রএ হিং এদে দাসীএ পুত্তআ কোইলা নিহদং চিদা। মহ উণ কণ্ঠরএ হিং কহিং বি পলাইদা। তা বয়স্স মা গব্বো দে হোদু।"

(অনুবাদ।)

কৃষ্ণ। এই সকল কোকিলের রব অতি মধুর!

বিদূষক। তোমার বংশীরব তদপেক্ষা মধুর, আবার আমার কণ্ঠস্বর আরও মধুর। অতএব তুমি বাঁশী বাজাও, আমিও কণ্ঠরব করি।

কৃষ্ণ। সখে! তোমার যেরূপ অভিরুচি। (কৃষ্ণের বংশীবাদন)।

বিদূষক। তোমার বংশীধ্বনি শুনিলাম। আমারও কণ্ঠস্বর শুন। (বিকট চীৎকার করতঃ বৃক্ষশিখর দেখিয়া)। সখে! দেখ, দেখ, আমাদেরই জয় হইল। দাসীপুত্র কোকিল তোমার বংশীধ্বনি শ্রবণে পরাজিত মানিয়া নীরব ছিল, তাঁহারাই আবার আমার কণ্ঠরব শুনিয়া কে কোথায় পলাইল! তবেই দেখ, তোমার গর্ব্ব মিথ্যা।

সালঙ্কারা ভাষা ও মনোহর ভাবরাজি রাজা রামানন্দ রায়ের মধুর লেখনীর কতদূর নিকটবর্ত্তী থাকিত, তাহা দেখাইবার জন্য জগন্নাথবল্লভ নাটকের দুইটীমাত্র সঙ্গীত এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি:—

(১)

হীনং পতিমপি ভজতে রমণী।
কেশরিণং কিমু কলয়তি হরিণী॥
রাধিকে পরিহর মাধব রাগময়ে॥ ধ্রু॥

ক্ষীণে শশিনিচ কুমুদবনীয়ং।
ভজতি ন ভাবং কিমুরমণীয়ং॥
সুখয়তি গজপতি রুদ্রনরেশং।
রামানন্দ রায় গীত মনিশং॥

(২)

মুঞ্জতর গুঞ্জদলি কুঞ্জমতিভীষণং।
মন্দমরুদগুরগ গন্ধকৃতদূষণং॥
সকলমেতদীরিতং।
কিঞ্চগুরু পঞ্চশর চঞ্চলং মম জীবিতং॥
মত্তপিক দত্তরুজ মুত্তমাধিকরং বনং।
সঙ্গসুখমঙ্গমপি ভুঙ্গভয়ভাজনং॥
রুদ্র নৃপমাত্ত বিদধাতু সুখসঙ্কুলং।
রামপদধাম কবি রায়কৃতমুজ্জ্বলং॥ (১)

* * * * *

---

(১) বৈষ্ণব কবি লোচনদাস এই দুইটী সংস্কৃতপদের ভাবানুবাদ নিম্নলিখিত সুমধুর পদদ্বয়ে প্রদান করিয়াছেন:—

(১)

আর মধুবাণী শুনহ রাই।
মাধব রাগ পরিহর ঘর যাই॥ ধ্রু॥

জগন্নাথবল্লভ নাটক চারি অঙ্কে সমাপ্ত। নাটকের প্রথমাঙ্কে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী রাধিকার পরস্পরের সন্দর্শনে পরস্পরের হৃদয়ে পূর্ব্বানুরাগের উদ্রেক, দ্বিতীয়াঙ্কে সখিগণকর্ত্তৃক নায়ক-নায়িকার মনোভাব পরীক্ষা, তৃতীয়াঙ্কে শ্রীমতীর অভিসার ও চতুর্থাঙ্কে নায়ক-নায়িকার সম্মিলন বর্ণিত হইয়াছে।

জগন্নাথবল্লভ নাটক সম্ভবতঃ পুরীতে রচিত হয়। চৈতন্যদেব সঙ্গীত-প্রিয় ছিলেন ও তাঁহার স্বরূপাদি ভক্তগণ চণ্ডীদাসাদির সঙ্গীত দ্বারা নীলাচলে

অকৃতি পতি যদি হয় গুণহীন।
তবু কুলকামিনী তাক অধীন॥
কেশরী অলখি না ভুলত হরিণী।
সুশীতল চাঁদ না ভজত নলিনী॥
কুল-বনিতাগণ এমত বেভার।
পর পুরুষাধিগমন দুরাচার॥
এত শুনি নাগরী হওল উদাস।
আশ্বাস করত দীন লোচনদাস॥

(২)

গুঞ্জ অলি মুঞ্জবহু কুঞ্জে মন মাতিয়া।
মত্তপিক দত্ত রবে ফাটে মধু ছাতিয়া॥
বল্লীযুক্ত মল্লীফুল গন্ধ সহ মারুতা।
কুন্দকলি শৃঙ্গ অলিবৃন্দ কাঁহু নৃত্যতা॥
সখি মন্দ মঝু ভাগিয়া।
কান্ত বিনু ভ্রান্ত প্রাণ কাহে রহু বাঁচিয়া॥ ধ্রু॥
ভস্মতনু পুষ্পধনু সঙ্গে রস পূরিয়া।
অঙ্গমঝু ভঙ্গ করু প্রাণ যাকু ফাটিয়া॥
পঞ্চমঝু দুঃখ হেরি রোয়ে পশুপাখিরে।
বল্লী নব কুঞ্জ ভেল তুঙ্গ ভয় ভাজিরে॥
গচ্ছসখি পুচ্ছ কিবা আনি দেহনা হরে।
স্পর্শসুখ দর্শ লাগি লোচনক আশরে॥

অবস্থান কালে তাঁহার ভাবাবেশাপনোদন করিতেন। চৈতন্যদেবের এইরূপ ভাবাবেশাপনোদনে রাজা রামানন্দেরও চেষ্টা করিতে হইত। রামানন্দ রায় সম্ভবতঃ এই কারণেই চৈতন্যদেবের প্রীত্যর্থ জগন্নাথবল্লভ নাটক প্রণয়ন করেন।

রাজা রামানন্দ রায় দেবদাসীগণকে যে অভিনয় শিক্ষা দিতেন, তদ্বিষয় ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। পুরীতে জগন্নাথবল্লভ নামে একখানি সুন্দর সুশোভন উদ্যান ছিল এবং চৈতন্যদেব ভক্তগণ সহ তথায় গমন করিয়া নৃত্যগীতাদি সুখানুভব করিতেন, তাহার উল্লেখ চৈতন্যচরিতামৃতে পরিদৃষ্ট হয়। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, জগন্নাথবল্লভ উদ্যানে এই নাটক অভিনীত হইয়াছিল এবং তৎকারণেই ইহা জগন্নাথবল্লভ নাটক নামে অভিহিত হইয়াছে। রামানন্দ রায় গ্রন্থমধ্যে এই নাটককে রামানন্দ সঙ্গীত নামে আখ্যাত করিয়াছেন।

জগন্নাথবল্লভ নাটকের একটী শ্লোকে রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রতাপ শুনিয়া সেকন্দর নামক জনৈক নৃপতির কন্দরাশ্রয় গ্রহণের উল্লেখ আছে। প্রতাপরুদ্রের সময় দিল্লীর বাদশাহীতক্তে লোদীবংশীয় দ্বিতীয় নৃপতি সেকন্দর সমাসীন ছিলেন এবং ইনিই ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে বেহার আক্রমণ করতঃ তাহা স্বীয় শাসনাধীনে আনয়ন করেন। সম্ভবতঃ রামানন্দ এই সেকন্দরকেই উক্ত শ্লোকে লক্ষ্য করিয়াছেন। যদি এই অনুমান সঙ্গত হয়, তবে সেকন্দর ও প্রতাপরুদ্রের শাসনকালে জগন্নাথবল্লভ নাটক রচিত হইয়াছিল, ইহা নিশ্চিত-রূপে বলা যাইতে পারে। প্রতাপরুদ্র শ্রীক্ষেত্রে রক্ষিত মাদলাপঞ্জী মতে ১৪২৬—১৪৫৪ শকাব্দায় বা ১৫০৪—১৫৩২ খৃষ্টীয়াব্দে এবং সেকন্দরলোদী ১৪৯১—১৫১৬ খৃষ্টীয়াব্দে রাজদণ্ড চালনা করিয়াছিলেন। তাহা হইলে জগন্নাথ-বল্লভ নাটক ১৫০৪ খৃষ্টাব্দের পর এবং ১৫১৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে, ইহা নিঃসংশয়িতরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আবার চৈতন্যদেব বা রামানন্দের নীলাচলে একত্রাবস্থান কালে উক্ত নাটক রচিত বলিয়া স্থির করিতে গেলে, বিদ্যানগর হইতে রামানন্দের শ্রীক্ষেত্রে গমন-বৎসরের অর্থাৎ ১৪৩৩ শকাব্দা বা ১৫১১ খৃষ্টাব্দের পর তাহা রচিত হইয়াছে, বলিতে হইবে। সুতরাং ১৫১৪ খৃষ্টীয়াব্দে জগন্নাথবল্লভ নাটক রচিত হইয়াছে, এরূপ নির্ণয় করিলে উক্ত নাটকের রচনাব্দ নির্ণয়ে অধিক ভুল হইবে না।

রামানন্দ রায় বাঙ্গালা "পহিলহি" পদ ১৪৩১ শকাব্দায় চৈতন্যদেবের নিকট কীর্ত্তন করেন। সম্ভবতঃ গোদাবরী তীরে "পহিলহি" পদে ভিন্ন গৌড়ীয় কবিতার ইতিপুর্ব্বে এযাবৎ আর কখনও স্ফূর্ত্তি হয় নাই। এই পদটী রামানন্দ রায় সম্ভবতঃ ইহার পূর্ব্বেই রচনা করিয়াছিলেন।

"রামানন্দ" ভণিতাযুক্ত কতকগুলি বাঙ্গলাপদ পদসংগ্রহ গ্রন্থসমূহে দৃষ্ট হয়। কিন্তু ঐ সকল পদের ভাষা ও ভাবে রায় রামানন্দের কোন কৃতিত্ব অনুভূত হয় না। এইজন্য এই পদে উক্ত পদগুলির সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা করা গেল না।

শ্রীরাধেশচন্দ্র শেঠ।

কবিতা-কুঞ্জ।

দু'টি তারা।

(১)

সন্ধ্যার আঁধার ভেদি' আকাশের কোলে উঠি'
নিরখিনু দু'টি তারা নীরবে র'য়েছে ফুটি।
দোঁহে দু'জনার পানে
চাহিয়া আকুল প্রাণে
নীরবে কহিছে কত প্রেমের রহস্য-কথা,—
নীরবেতে পাশরিছে দিনের বিরহ-ব্যথা।
মাঝে মেঘ-শিশুগুলি
গৃহ-লোকালয় ভুলি'
চঞ্চল বায়ুর সাথে করে লুকোচুরী খেলা ;—
পূরবে হাসিছে শশী, পশ্চিমে গোধূলি-বালা।

(২)

ভাবিনু,—হ'তাম যদি ওই তারাটির মত,—
প্রাণের সে প্রিয় মোর যদি রে ওইটি হ'ত!
দূর দূরান্তরে থাকি,
নয়নে নয়ন রাখি,
ওরূপে পেতাম যদি করিবারে দরশন,—
ইন্দ্রিয়-সম্পর্কশূন্য হৃদয়ের আলিঙ্গন!
সাধিতে প্রণয়-রণ
বদ্ধদেহ মুক্তমন
ওইরূপে ওইখানে যদি বা হ'তাম, হায়!
ও দু'টি তারার মত দু'টি তারা দু'জনায়!

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু

আলেখ্য।

নিথর যামিনী, নিথর মেদিনী,
নীলিম গগনে নিথর তারা;
এই বাতায়নে, বসিয়া দু'জনে,
হেরিয়া হতাম আপনা হারা!

তাহার বিহনে, আজি রে নয়নে,
হেরি যেন শুধু আঁধারময়;
জগৎ আঁধার, হৃদয় আঁধার,
আঁধারে সকলি ডুবিয়া রয়।

আজিও যামিনী, নিথর তেমনি,
তারকা মেদিনী সবই সেই।
হায়! যার সনে, বসিয়া এখানে,
হেরিনু এসব সে শুধু নাই!

চাঁদিনী নিশায়, বসিয়া হেথায়,
হেরিতাম যবে গগনশোভা,
সে চারুবদন, উজলি তখন,
পড়িত চাঁদের মধুর বিভা।

সে প্রেম মূরতি, সেই রূপজ্যোতি,
এখনও যেন নয়নে মোর,
স্বপনের প্রায়, ভাসিতেছি হায়!
গত সুখে হৃদি করিয়া ভোর।

বহিত এখানে, এই বাতায়নে,
মৃদুল মধুর মলয় বায়;
সে মৃদু পরশে, প্রেমের আবেশে,
পড়িত সে ঢলে আমার গায়।

পরম যতনে, সে চারু রতনে,
লইতাম আমি হৃদয়ে ধরে;
হাসিয়া হাসিয়া, বাহু প্রসারিয়া,
বেড়িত সে মোরে সোহাগভরে।

তৃষিত পরাণে, প্রেম আলাপনে,
করিতাম কত যামিনী ভোর!
তৃষা মিটিত না, কথা ফুরাত না,
সে কথার বুঝি নাহিরে ওর!

এতদিন ধরে, নিরখি তাহারে,
দরশন সাধ মিটিল কই!
কি জানি কেমন, সে রূপ মোহন,
বিধাতার বুঝি আদর্শ সেই।

এই সে শয়নে, কত পড়ে মনে,
মনে পড়ে সেই ঘুমন্ত-ছবি;
কম্পিত অধর, সে করুণ-স্বর,
এখনও সে সব সতত ভাবি।

চমকি স্বপনে, করুণ বচনে—
বলেছিল মোরে "ভুলনা নাথ—
মৃণালিনী যায়, লইয়া বিদায়,
হইল না দেখা তোমার সাথ!"

অতি ব্যস্ত হয়ে, বলিলাম প্রিয়ে,
একি কুস্বপন দেখিলে হায়!
আজি তব কাছে, তবে কেন মিছে,
বিদায়ের অশ্রু নয়নে বয়?

সে মিথ্যা স্বপন, কে জানে তখন,
সত্যে পরিণত অচিরে হবে?
সময় না হ'তে, দেখিতে দেখিতে,
আধ ফোটা ফুল শুকায়ে যাবে?

ওহো মরি! মরি! ওই যে তাহারি,
সেই প্রতিমূর্ত্তি জীবন্ত যেন;
ওই মৃদু হাসি, অধরেতে মিশি,
তেমনি মাধুরী করিছে দান।

বটুল নয়ন, তেমনিই যেন,
হানিছে হৃদয়ে কটাক্ষ শর;
ভুজলতা যেন, যাচে আলিঙ্গন,
ধরিতে আমারে হৃদয়োপর।

সব আছে সেই, ভাষা শুধু নেই,
যা শুনে সংসার যেতাম ভুলে;
না—না—কই তাই, কিছুই ত নাই,
এযে ছবি শুধু, শূন্যই মূলে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মজুমদার।

পুত্রক্রোড়ে নারী

যেন কোন অভিশপ্ত দেববালা হায়
অভিশাপ অন্তে তার—মন্দাকিনী নীরে
স্নান করি—শুচিস্মিত হয়ে পুনরায়
দাঁড়ায়ে পৃথিবী পারে—স্বরগের তীরে।
সাগর-মন্থনে যেন চির-আকাঙ্ক্ষিত
সুধার কলসী কক্ষে লক্ষ্মী যে সমুখে;
কি মাধুরী বিলসিত—মহিমামণ্ডিত
অমর দানব দুই আত্মহারা দেখে।
শারদশিশিরস্নাত—শুভ্র কলেবর
মায়ের চরণোৎসৃষ্ট—ভক্তির প্রসাদ—
যেন শ্বেত শতদল—পবিত্র সুন্দর;
ধন ধান্য সুসম্পূর্ণ—শুভ্র আশীর্ব্বাদ।
শত জন্ম তপস্যার পুঞ্জ পুণ্যফল
দৃষ্টিমাত্রে পাপক্ষয়—জনম সফল।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রার্থনাতীত দান।*

পাঠানেরা যবে বাঁধিয়া আনিল
বন্দী শিখের দল—
সুহিদ্‌গঞ্জে রক্তবরণ
হইল ধরণীতল।
নবাব কহিল শুন তরুসিং
তোমারে ক্ষমিতে চাই।—
তরুসিং কহে মোরে কেন তব
এত অবহেলা ভাই!—
নবাব কহিল—মহাবীর তুমি
তোমারে না করি ক্রোধ,
বেণীটি কাটিয়া দিয়ে যাও মোরে
এই শুধু অনুরোধ!
তরুসিং কহে—করুণা তোমার
হৃদয়ে রহিল গাঁথা—
যা চেয়েছ তার কিছু বেশী দিব,
বেণীর সঙ্গে মাথা!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* শিখের পক্ষে বেণীচ্ছেদন ধর্ম্ম-পরিত্যাগের ন্যায় দূষণীয়।

শাহ আলম।

উপক্রমণিকা।

Shah Aulum had improved a very good education by study and reflection; he was a complete master of the languages of the East, and as a writer, attained an eminence seldom aquired by persons in his high position.——*Captain Francklin.*

মোগল সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় যেমন নিরতিশয় বিস্ময়ের ব্যাপার, তাহার অধঃপতনও সেইরূপ। সে বিষাদকাহিনী অভিব্যক্ত করিবার জন্য ভারত-বর্ষের সর্ব্বশেষ মোগল বাদশাহ শাহ আলম যে মর্ম্মগাঁথা রচনা করিয়াছিলেন, তাহার অক্ষরে অক্ষরে আজিও যেন অশ্রুধারা ফাটিয়া বাহির হইতেছে! মূল কবিতাটি পারস্যভাষায় রচিত; সেকালের ইংরাজলেখক তাহার একটি ইংরাজী অনুবাদ রাখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু কালক্রমে মূল এবং অনুবাদ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে।

মোগল-শাসন চলিয়া গিয়াছে; তাহার ধ্বংস-কাহিনীও বিস্মৃতিগর্ভে বিলীন হইতেছে! মোগলের বীরবাহু ভারতবর্ষে যে মহাসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, একদিন তাহার সৌভাগ্যগর্ব্ব ইউরোপকেও বিস্মিত করিয়া তুলিয়া-ছিল;—এখন কেবল যমুনাতটান্তমিলিত তাজমহলের সৌধশোভা অতীত গৌরবের সাক্ষিরূপে দণ্ডায়মান; আর যাহা কিছু সকলই অল্পাধিক মাত্রায় জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে!

যদুপতির মথুরাপুরী বা রঘুপতির উত্তরকোশলার কথা এখন কথা-মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে; কাব্যাদিতে যাহা কিছু বর্ণনা পাঠ করা যায় তাহাও কবিজন-সুলভ অতিরঞ্জিত কাহিনী বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়া থাকে! মোগল সাম্রাজ্য এখনও সেরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই; এখনও তাহার অভ্যুদয় ও অধঃপতনের ইতিহাস সঙ্কলন করিবার উপযোগী উপাদানগুলি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইতে পারে নাই।

বাদশাহদিগের চরিত্রহীনতাই মোগল-সাম্রাজ্যের অধঃপতনের মূল কারণ; অথবা সত্য হউক আর মিথ্যা হউক,—তাহাই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বলিয়া পরিচিত। সচরাচর প্রচলিত ঐতিহাসের সিদ্ধান্ত যাহাই হউক,—মোগল বাদশাহেরা নিতান্ত অপদার্থ ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধান করিলে বরং ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে, মোগল-সাম্রাজ্যের গঠনপ্রণালীর মধ্যেই অবশ্যম্ভাবী অধঃপতনের মূল বর্ত্তমান ছিল;—বাদশাহেরা তাহার গতিরোধ করিতে পারেন নাই।

মোগল বাদশাহেরা নিতান্ত মূর্খ বা অশিক্ষিত ছিলেন না। অনেকে বিদ্যোৎসাহের জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, এবং কেহ কেহ স্বয়ং বিবিধ বিদ্যায় বিভূষিত হইয়া বিদ্বৎসমাজেও সমাদরলাভ করিয়াছিলেন।

শেষ সম্রাট শাহ্ আলম শিক্ষায়, চরিত্রগৌরবে, অভিজ্ঞতায় এবং ব্যবহারগুণে সমসাময়িক সজ্জনসমাজে সবিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। তৎকালে ভারতবর্ষে যে সকল ভাষা প্রচলিত ছিল, তিনি তাহাতে শিক্ষা-লাভ করিয়া পণ্ডিতসমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, এবং লিপিকৌশল মহিমায় সুকবি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার শাসন সময়েই মোগল-গৌরব-রবি চিরদিনের মত অস্তগত হইল!

তরবারির সহায়তায় রাজ্যবিস্তার করা সহজ, কিন্তু শাসন-গৌরবেই মহাসাম্রাজ্য স্থায়িত্বলাভ করে। যতদিন মোগলের শাসন-গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল, ততদিন মোগলের উত্তরোত্তর পদোন্নতি হইয়াছিল; যেদিন শাসন-গৌরব অবসন্ন হইল, সেইদিন হইতে মোগলের অধঃপতন খরবেগ ধারণ করিতে লাগিল। বাদশাহ্ শাহ্ আলম তাহার গতিরোধ করিতে পারিলেন না;—তাঁহার সিংহাসনারোহণের বহুপূর্ব্বেই মোগল-সাম্রাজ্যের ধ্বংসকাল সমুপস্থিত হইয়াছিল!

সিংহাসনচ্যুত কারারুদ্ধ জরাপলিত অন্ধ শাহ্ আলম মোগলের অধঃপতন-কাহিনী কীর্ত্তন করিবার সময়ে স্বরচিত কবিতার মুখবন্ধে বাষ্প-গদ্‌গদ্ কণ্ঠে গাহিয়াছেন:—

"Lo, the dire tempest gathering from afar,
In dreadful clouds has dimm'd the Imperial star;

Has to the winds, and broad expanse of Heaven,
My state, my royalty, my kingdom given;
Time was, O King, when clothed in power supreme,
Thy voice was heard, and nations hailed the theme;
Now sad reverse,—for sordid lust of gold,
By traiterous wiles, thy throne and Empire sold!"

এই করুণ-কবিতায় ইঙ্গিতে মোগল-সাম্রাজ্যের ধ্বংস-কাহিনী যেরূপ ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইলে শাহ্ আলমের জীবনকাহিনী ও তৎসাময়িক প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনার আলোচনা করা আবশ্যক। আমরা সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিয়া শাহ্ আলমের আত্মকথায় তাঁহার বিষাদকাহিনীর উপসংহার করিব।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গৃহ কলহ।

"The affairs of the Empire were in this state, when the Abdalli invaded it. The Marhattas were masters of the greatest part of Hindoostan; a nominal King sat on the throne; the administration was usurped by a man who derived his influence and establishment entirely from a foreign power; the Chiefs of the Empire had already declared their resolution of joining the invader; and Lahoor, the key of Hindoostan, was governed by a woman."——*Captain Francklin.*

একটি মাত্র ঐতিহাসিক ঘটনায় একদিনে মোগল-সাম্রাজ্যের অধঃপতন সংঘটিত হয় নাই। আরঙ্গজীবের জীবনসন্ধ্যায় যে অরাজকতার অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, উত্তরকালে তাহাতেই মোগল রাজসিংহাসন ভস্মীভূত হয়;—পরবর্ত্তী মোগল বাদশাহগণ কেহই তাহার গতিরোধ করিতে পারেন নাই।

যাঁহারা মোগল-সাম্রাজ্যের রক্ষাকর্ত্তা—আমীর ওমরাহ ও প্রধানতম রাজকর্ম্মচারী—তাঁহাদের বিশ্বাসঘাতকতায়, গৃহবিবাদে এবং স্বার্থপরতায় মোগল-

গৌরবপতাকা ভূপতিত হইতেছিল। দাক্ষিণাত্যে নিজাম এবং অযোধ্যার উজীর স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন করিয়া মোগল বাদশাহের শাসনক্ষমতা শিথিল করিয়া তুলিয়াছিলেন; বিজয়োন্মত্ত মহারাষ্ট্র-সেনা অরাজক রাজ্যের সর্ব্বত্র দস্যুবৃত্তি করিয়া অভিনব হিন্দুসাম্রাজ্য সংস্থাপনের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এই সকল কারণে মোগলসাম্রাজ্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতেছিল; মোগলের শাসনক্ষমতার ছায়ামাত্রই বর্ত্তমান ছিল, নাদির শাহ দিল্লী অধিকার করায় সে ছায়া পর্য্যন্তও তিরোহিত হইয়া গেল।

দিল্লীর নামসর্ব্বস্ব মোগল বাদশাহ্ মহম্মদ শাহ্ কোনরূপে নাদির শাহার গতিরোধ করিতে না পারিয়া, তাঁহার সহিত নিতান্ত অকীর্ত্তিকর সন্ধি সংস্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। এই সন্ধিসূত্রে আটক নদীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী সম্পন্ন জনপদ নাদির শাহার রাজ্যভুক্ত হইল;—লাহোর, গুজরাট, মূলতান ও কাবুল রাজ্য মহম্মদ শাহার অধিকারে থাকিলেও তাহার সমস্ত রাজকর নাদির শাহার প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। দক্ষিণভারতে মহারাষ্ট্র-সেনা ও নিজাম স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন, বঙ্গবিহার উড়িষ্যার সুবাদার রাজকর প্রদান করিতে অসম্মত হইয়াছেন, অযোধ্যার উজীর স্বতন্ত্র রাজ্য-গঠনে নিযুক্ত রহিয়াছেন,—এরূপ সময়ে পশ্চিমভারত নাদির শাহাকে উৎসর্গ করিয়া দিয়া দিল্লীশ্বর মহম্মদ শাহ হৃতসর্ব্বস্ব কৃপাপাত্র কাঙ্গালের ন্যায় ধ্বংসাবশিষ্ট দিল্লীনগরীতে কায়ক্লেশে দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

নাদির শাহের দেহাবসানে অল্পদিনের জন্য মহম্মদ শাহ আপন্মুক্ত হইয়াছিলেন এবং পুনরায় মোগলসাম্রাজ্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠার আশায় পশ্চিম-ভারতে আত্মশক্তির বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার রাজত্বের শেষ বৎসরে (১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে) নাদির শাহের উত্তরাধিকারী আহম্মদ শাহ আব্দালী "শাহেন শাহ" অর্থাৎ রাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়া সসৈন্যে লাহোর প্রদেশে উপনীত হইলেন।

এবার বাহুবলে আত্মরক্ষা করিবার আশায় দিল্লীশ্বর মহম্মদ শাহ সেনাসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। শাহজাদা আহম্মদ শাহ, প্রধানামাত্য কমরুদ্দীন খাঁ ও তৎপুত্র মহিমল্‌মোল্‌ক সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া আব্দালীর গতিরোধার্থ অগ্রসর হইলেন। ইহাদের রণপাণ্ডিত্যে আব্দালী পরাভূত হইয়া

স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন; কিন্তু কমরুদ্দীন যুদ্ধে নিহত হওয়ায় তৎপুত্র মহিমলমোলককে লাহোরের সুবাদারপদে নিযুক্ত করিয়া শাহজাদাকে একাকী রাজধানী অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল।

শাহজাদা বিজয়োৎফুল্ল হৃদয়ে সসৈন্যে প্রত্যাগমন করিবার সময়ে পথিমধ্যে পাণিপথের নিকটে বৃদ্ধ মহম্মদ শাহের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। রাজধানীতে উপনীত হইয়া আহম্মদ শাহ বাদশাহের তখত অধিকার করতঃ পাত্রমিত্রগণকে যথাযোগ্য রাজপদ বিতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যে সকল মুসলমান আমীর ওমরাহ স্বার্থপরতায় অন্ধ হইয়া মোগল-সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল খনন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, আহমদ শাহের অনুকম্পায় তাঁহারাই প্রধান প্রধান রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন!

অযোধ্যার মনসুর-আলি-খাঁ ওমরাহদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। তিনি উজীরপদে অভিষিক্ত হইয়া ইচ্ছানুসারে আশ্রিত ও অনুগত অন্তরঙ্গগণকেই রাজকার্য্যে নিয়োগ করিতে লাগিলেন। তদনুসারে গাজিউদ্দীন খাঁ মীর বক্সী হইলেন। প্রকৃতপক্ষে অযোধ্যার উজীর দিল্লীর বাদশাহের সমস্ত শাসনক্ষমতা অপহরণ করিয়া আত্মাধিকার সংস্থাপন করিতে লাগিলেন।

অন্যান্য আমীর ওমরাহগণ ইহাতে অতিমাত্র অসন্তুষ্ট হইয়া বাদশাহের নিকট নানারূপ অভিযোগ উপস্থিত করিতে লাগিলেন। উজীর আত্মপক্ষ সবল করিবার আশায় বাদশাহকে কারারুদ্ধ দস্যু তস্করের ন্যায় প্রহরিবেষ্টিত করিয়া রাখিলেন। সমুদয় রাজকর্ম্মচারিগণ উজীরের দাসানুদাস, স্বয়ং সেনানায়ক তাঁহারই অনুগত অন্তরঙ্গ, রাজকোষ ও সেনাবল তাঁহারই পদগৌরব রক্ষা করিতেছে;—এরূপ অবস্থায় মুখের কথায় উজীরকে পদচ্যুত করা সহজ নহে। বাদশাহ আত্মকার্য্যের পরিণাম দর্শনে শিহরিয়া উঠিলেন, এবং উজীরের অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভ করিবার আশায় পাত্রমিত্রগণের সহিত গোপনে ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করিলেন। মোগল-সাম্রাজ্যের অধঃপতন-দিনে এইরূপে গৃহকলহের সূত্রপাত হইল।

উজীর মনসুর আলি খাঁ সহজে ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না; তিনি বাহুবলে সকল ষড়যন্ত্র চূর্ণ করিবার জন্য যুদ্ধঘোষণা করিলেন। এই যুদ্ধে মোগলের শাসনগৌরব একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল।

মন্‌সুর আলি খাঁ রণপরাজিত হইয়া জাঠরাজ্যে পলায়ন করিলেন; ইন্‌তিমাদ্দোলা উজীরপদে অভিষিক্ত হইলেন; কিন্তু মন্‌সুর আলির রাজ-বিদ্রোহের দণ্ডদান করা দূরে থাকুক, তাঁহাকে ক্ষমা প্রদর্শন করিতে হইল। এতদুপলক্ষে পাত্রমিত্রগণ দুইদলে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। মীর বক্‌সি গাজি উদ্দীন মনসুর আলির অনুগ্রহেই পদগৌরব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনিই মন্‌সুর আলিকে ক্ষমা করিতে অসম্মত হইয়া বাহুবলে জাঠরাজ্য আক্রমণ করিলেন। প্রধানামাত্য ইহার সহায়তা সাধন করিতে অসম্মত হইয়া কামান প্রেরণ করিতে নিষেধ করিলেন।

গাজি উদ্দীন প্রধানামাত্যের ব্যবহারে অবমাননা প্রাপ্ত হইয়া মহারাষ্ট্র সেনার সহায়তা গ্রহণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মহারাষ্ট্র-সেনানায়ক মল্‌হর রাও সসৈন্যে গাজি উদ্দীনের সহায়তাসাধনার্থ অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া বাদশাহ ও উজীর তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। বাদশাহী সেনা এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু ইহাতেই হিতে বিপরীত হইল। বাদশাহ পরাজিত হইয়া দিল্লীদুর্গে অবরুদ্ধ হইলেন; বিজয়োন্মত্ত প্রতিহিংসাতাড়িত দুর্দ্ধর্ষ মোগল সেনাপতি গাজি উদ্দীন বাদশাহকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার চক্ষুঃদ্বয় উৎপাটন করতঃ শূন্য সিংহাসনে তৈমুর বংশীয় রাজকুমার আজিমুদ্দীনকে বসাইয়া দিয়া তাঁহার নামে সমস্ত শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। এইরূপে ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে দিল্লীশ্বর আত্মভৃত্যের সূত্রানুচালিত ক্রীড়াপুত্তলে পরিণত হইলেন!

বাদশাহ গাজি উদ্দীনের কৃপায় সিংহাসন লাভ করিলেও গাজি উদ্দীনের কৃতঘ্নতার কথা বিস্মিত হইতে পারিলেন না; পাকে চক্রে গাজি উদ্দীনকে পদচ্যুত করিবার উপায় অন্বেষণে নিযুক্ত হইলেন।

ভারতবর্ষের এইরূপ অরাজক অবস্থায় প্রধান প্রধান পাত্রমিত্রগণ সকলেই আহমদ শাহ আবদালীকে ভারতবর্ষে উপনীত হইবার জন্য পুনঃপুনঃ আহ্বান করিতে লাগিলেন; স্বয়ং বাদশাহ পর্য্যন্তও তাহাতে যোগদান করিলেন। এই সময়ে মহিমল্‌মোল্‌কের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার বেগম লাহোরের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং ব্যূহদ্বারে রমণী এবং ব্যূহাভ্যন্তরে আত্মকলহের সন্ধানলাভ করিয়া আহমদ শাহ আবদালী ভারতাক্রমণে অসম্মত হইলেন না।

মহিমল্‌মোল্‌কের বেগম তেজস্বিনী বীররমণীর ন্যায় আবদালীর আক্রমণের গতিরোধ করিতে ত্রুটি করিলেন না; কিন্তু এবার আর আবদালীকে কেহ পরাজিত করিতে পারিল না; তিনি সসৈন্যে দিল্লী অধিকার করিয়া গাজি উদ্দীনকে পদচ্যুত করিলেন এবং দিল্লীশ্বরকে ইচ্ছামত উজীর নিয়োগের অধিকার দান করিয়া জাঠরাজ্য ধ্বংস করিবার আশায় যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

বাদশাহ ক্ষণকালের জন্য গাজি উদ্দীনের শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া আপন পুত্র আলি গহরকে উজীরপদে অভিষিক্ত করিলেন। এই আলি গহরই ভারতবর্ষের শেষ মোগল বাদশাহ শাহ আলম নামে ইতিহাসে পরিচিত।

আব্‌দালী জাঠরাজ্য ধ্বংস করা দূরে থাকুক, জাঠবংশীয় বীরবৃন্দের নিকট নানারূপ লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। পদবিচ্যুত গাজি উদ্দীন সেই সুযোগে আব্‌দালীর নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, তাঁহাকে পুনরায় উজীরপদে অভিষিক্ত করিলে, তিনি কটাক্ষে জাঠবংশ ধ্বংস করিয়া দিবেন। আব্‌দালী তাহাতে অসম্মত হইলেন না। ঘটনাক্রমে গাজি উদ্দীন জয়লাভ করায় আব্‌দালীর আদেশে পুনরায় উজীরপদ প্রাপ্ত হইলেন। দিল্লীশ্বর পুনরায় তাঁহার করালকবলে নিপতিত হইলেন, আলি গহর প্রাণ লইয়া দূরস্থানে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন!

আলি গহর মোগল-সাম্রাজ্যের ধ্বংস দশায় এই সকল অন্তর্বিপ্লবে নিপতিত হইয়া পিতৃসিংহাসন আপম্মুক্ত করিবার আশায় মহারাষ্ট্র সেনানায়ক ইটলরাওর শরণাগত হইলেন। দিল্লীশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র, মোগল-সাম্রাজ্যের ভাবী সম্রাট এইরূপ মোগলশাসনের প্রবল শত্রু মহারাষ্ট্রকুলের বাহুবলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। এই সময় হইতে যুবরাজ আলি গহর ইতিহাসে পরিচিত—এই সময়ে তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের প্রথম প্রভাত। কিন্তু হায়! সে প্রভাত নিবিড় কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন—আলি গহর সে তমসা ভেদ করিয়া আশার আলোকরেখা দর্শন করিতে সক্ষম হইলেন না।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

রাসলীলা।

কোয়েল নদীর নীরে কার্ত্তিকী রাকায়
দ্রব রজতের ধারা ধীরে বহি' যায়।
তীরে তরু-ছায়াতলে পত্র অবকাশছলে
কিরণকুমারী কেহ চুরী করি চায়,
সখীরা হাসিছে তার পাতায় পাতায়।

রজত প্লাবনে যেন মগ্ন ধরাতল!
দূরে মাথা তুলি চাহে সুনীল অচল।
শুধু তরুছায়া-তলে কালিম কুন্তল দোলে
রূপসী-কপোলে চূর্ণকেশরাশি প্রায়।
কি মহিমা, কি মাধুরী কার্ত্তিকী রাকায়!

নদী-শিলা-তলে শশিকিরণে মণ্ডিত
উলসিয়া সেফালিকা হ'তেছে পতিত।
দীর্ঘ সীতাহার শিরে কুসুম ফুটিছে থরে;
মধুমালতীর লতা প্রসূনে দোলায়।
কি মোহ প্রকৃতি-মুখে কার্ত্তিকী রাকায়!

জড় জীব মুগ্ধ আজি কুহকে রাকার,
পাপিয়ার কলকণ্ঠে অমৃত সঞ্চার!
আবেশে বিমানতলে ধ্বনি প্রতিধ্বনি খেলে,
বাঁশরী বাজিছে বুঝি রাস-পূর্ণিমার—
চিরবিরহের গীতি তীরে যমুনার!

বনমাঝে মনোমাঝে সেই এক(ই) গান—
এ সুখ সৌন্দর্য্যে কই ভরিল না প্রাণ!
রন্ধ্রে রন্ধ্রে নব সুরে কার বাঁশী তান পূরে
শুনায় জগৎ জনে সঙ্গীত মহান্—
অনন্ত অতৃপ্ত চির বিরহের গান!

কোয়েলের তীরে আজো শুনি সেই গান—
—বৃন্দাবনে বিরহিণী—নিত্য নব তান!
কুটীর প্রাঙ্গণ মাঝে নীপ তরুবর রাজে
যুবক যুবতী তলে বেড়ি নাচে গায়।
রাসরসে ভরপুর, মাদোল বাজায়!

পঞ্চমে পুরুষকণ্ঠে মিলি উঠে তান,
দোহারি কামিনী গায় মধুরে সে গান!
ঝুমুর গানের ছলে নিন্দে নরনারীদলে;
হাসিয়া যুবতী ফিরি ফিরি দেয় গালি,
রাধার উদার পদে বাঁধা বনমালী!

সুখে রঙ্গে মাতোয়ারা সবে নাচে গায়,
চেরো* বালা "সৈঁউতিরে" না ফিরিয়া চায়।
অদূরে তটিনী মূলে বসি একা শিলাতলে,
"সরযূর" মুখখানি ভাবি ক্ষীণ কায়;—
চেরো যুবতীর পানে কে ফিরিয়া চায়?

বিগত নিশায় এই কোয়েল-পুলিনে
সেও নেচে গেয়েছিল সরযূর সনে।
আজি বিভা হবে বলে কত আশা কুতূহলে
পরিপূর্ণ ছিল তার হৃদয়নিলয়—
বিরহে তাহার আজি সকলি তন্ময়!

---

* পালামৌর জাতি বিশেষ।

গত যামিনীতে সবে ঘুমঘুরে মগন,—
সহসা ধ্বনিয়া উঠে শার্দ্দূল-গর্জ্জন।
গোঠে গাভী ছোটে রড়ে, সরযূ ধাইছে ফিরে—
"নন্দিনী" কৃতান্তকরে কবলিত তার,
সদ্যঃপ্রসবিনী সেই গোধনের সার।

করে ধনুঃ কটিতটে শাণিত কৃপাণ,
নিমেষে সে বীরদাপে করিল প্রয়াণ।
বলে গেছে সেঁউতিরে, দুষমণে মারি ফিরে
আসি যদি কাল, তবে সুধন্য জীবন!
তা না হ'লে এ জনমে হবেনা মিলন!

তন্ময় হয়ে বালা ভাবে সেই রূপ,
অদর্শনে আরো তার শোভা অপরূপ!
নীলিমায় রাকাবুকে, নদী জলধারা মুখে,
হৃদয়ে নয়নে রূপ শুধু সরযূর,—
আত্মহারা গোপী যেন বিরহবিধুর!

হরিভাবে ভোর, হরিপ্রেমে পাগলিনী
এমনি নিশায় হরি লোভিলা গোপিনী!
সে ভাব সে প্রেম স্মরি সতী-শিরোমণি হরি
সেঁউতিরে ফিরে দেহ সরযূ রতন—
কোয়েলের তীরে তার প্রেম-বৃন্দাবন!

নিশি জাগরণে শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ মন,
সেঁউতি সে শিলাতলে মুদিল নয়ন।
স্বপ্নে হেরে বুকোপরে সরযূ এসেছে ফিরে,
করে ধনুঃ কটিতটে শাণিত কৃপাণ।
জীবন্ত শার্দ্দূল, বীরবিজয়-নিশান!

পুষ্পবৃষ্টি করে দেব সরযূর শিরে
অপ্সরী কিন্নরী গায় বিজয়ীরে ঘিরে।
আনন্দে মেলিয়া আঁখি সেঁউতি হেরিছে একি!
যথার্থ সরযূ তার বিজয়ী জোয়ান,—
করে দোলে বৃকমুণ্ড, কটিতে কৃপাণ!

উঠিছে সে শিলা ঘিরি মহানন্দ-রোল
সখীসখা গায়, বাজে মধুরে মাদোল!
যুবকেরা গায় হাসি, "উঠি দেখ প্যারিশশী
মথুরার রাজা তোর কুঞ্জবনে চোর।"
সখী হাসে, "রাইরাজা নফর ও' তোর!"

কোয়েল নদীর তীরে কার্ত্তিকী রাকায়
সেঁউতি সরযূ মিলে শ্রীহরি-কৃপায়।
তীরে নীপতরুমূলে রচি রাস কুতূহলে
সখী সখা নাচে গায় মাদোল বাজায়।
কিরণকুমারী হাসে পাতায় পাতায়!

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার

বাজার দেনা।

বাজার দেনা নাই, এমন লোক বিরল। ছোট বড় প্রায় সকলেরই বাজার দেনা আছে; ছোটর জ্বালা অল্প, খরচ কম, দেনার সমষ্টিও কম; বড়র জ্বালা অধিক, খরচ অধিক, দেনাও অধিক। বাজার দেনাটাকে আমরা দেনার মধ্যেই ধরি না। চাউল, ডাউল, তৈল, লবণ প্রভৃতির উঠনা হিসাব হইতে কাপড় প্রভৃতির হিসাবে দেনা ও ডাক্তারখানার ঔষধের

'একাউন্ট' সবই বাজার দেনা। মাসান্তেই শোধ করি, আর বর্ষান্তেই শোধ করি—দেনা যতদিন শোধ না করি তত দিন দেনা—তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু বাজার দেনাকে আমরা দেনার মধ্যেই ধরি না। বাজার দেনা আফিসের মাহিনা পাইলে মাসকাবারে চুকাই, বা কোম্পানীর কাগজের সুদ পাইবার কিস্তিমত চুকাই, বা আদায়ের কিস্তিমত চুকাই। দেনার মধ্যে ধরি না বলিয়াই বাজার দেনা রাখি; এবং বাজার দেনার লাভালাভ খতাইয়া দেখি না। নহিলে মাসকাবারে বা নির্দ্দিষ্ট সময়ে যখন দেনা চুকাইয়া দিয়া থাকি, তখন ইচ্ছা করিলে নগদে কাজও করিতে পারি; বড়জোর তাহাতে সময় সময় একটু সামান্য অসুবিধা হয়। কতকগুলা জিনিস কিনিব স্থির করিয়া বাজারে যাইয়া সেগুলা কিনিবার পর হয়ত আর একটা জিনিস কিনিবার কথা মনে পড়িল, বা একটা নূতন জিনিস দেখিয়া কিনিতে ইচ্ছা হইল। তখন সঙ্গে টাকা না থাকিলে কি করি? দোকানদার দেশীয় হইলে জিনিসটা লইয়া আসি, আর বলিয়া আসি, এবার যেদিন বাজারে আসিব, দাম দিয়া যাইব বা অমুক দিন যাইয়া টাকা লইয়া আসিও। য়ুরোপীয়ের দোকান হইলে জিনিসটা লইয়া আসি, আর 'ভাউচার' সহি করিয়া নাম ও ঠিকানা লেখা কার্ড দিয়া বলিয়া আসি, 'বিল' পাঠাইয়া টাকা আদায় করিও। নগদে কাজ করিতে হইলে, পরদিন টাকা লইয়া যাইয়া তবে জিনিসটি কিনিতে হয়। এই সামান্য অসুবিধা।

যে অসুবিধার কথা বলিয়াছি, সেটা ধনবানের পক্ষে, কিন্তু যাহার গৃহে 'বিল' আসিলেই 'বিল' শোধের উপযোগী অর্থ পাওয়া যায় না, তাহার পক্ষে সময় সময় এই অসুবিধাটা একটু গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়। যে দরিদ্র কেরাণী সামান্য বেতনে নির্ভর করিয়া কোনরূপে সংসার চালায়, তাহারও গৃহে আধিব্যাধির আবির্ভাব বিরল নহে। যে মাসমাহিনা পনের টাকায় কোনরূপে সংসার চালায়, তাহার গৃহে ব্যাধির জন্য যেবার তাহাকে চিকিৎসকের দর্শনীতে ও ঔষধের দামে পাঁচ ছয় টাকা ব্যয় করিতে হয়, সেবার তাহার পক্ষে মাসের শেষ কয়দিন ধার না করিয়া চালান অসাধ্যসাধন। দোকানে ধারে জিনিস পাইলে তাহাকে আর লজ্জানতশিরে গৃহিণীর গহনা বন্ধক রাখিয়া কোথাও টাকা ধারের চেষ্টায় যাইতে হয় না।

এ কথাটা বাজার দেনার সপক্ষে প্রবল যুক্তি। কিন্তু অর্থনীতি-বিদ্‌গণ হিসাব করিয়া যাহা দেখাইয়াছেন, তাহাতে গহনা বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার করিলে সে হয়ত শতকরা বার টাকা সুদে টাকা পাইত; কিন্তু বাজারদেনায় তাহাকে শতকরা কুড়ি টাকা অধিক দিতে হইতেছে।

এই কথাটা বুঝানই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এখন সেই কথাটাই বুঝাইব।

যে দোকানদার ধারে বিক্রয় করে, তাহাকে ব্যবসায়ে অনেক টাকা ঢালিতে হয়; কারণ কতক টাকা ধারে বিক্রয়ের হিসাবে বাহিরে থাকে। কাজেই যে ধারে দেয়, তাহার যত টাকার আবশ্যক, যে কেবল নগদ বিক্রয় করে, তাহার তদপেক্ষা অনেক কম টাকার আবশ্যক। টাকার সুদ হিসাব করিতে হয়, আবার লোকশানের আশঙ্কা আছে। এই সুদের টাকাটা দোকানদারকে পণ্যের উপর হইতেই আদায় করিয়া লইতে হয়। যে দোকানদার কেবল নগদ বিক্রয় করে, সে এই সুদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায়; কাজেই অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে পণ্য বিক্রয় করিতে পারে। ধারে বিক্রয়ে অনেক টাকা আবার আদৌ আদায় হয় না। ক্রেতার মৃত্যু হইলে বা ক্রেতা ফেরার হইলে বা ঐরূপ অন্য কোন কারণ ঘটিলে টাকা আদায় করা অসুবিধাজনক বা অসম্ভব হইয়া উঠে। দোকানদারের পক্ষে আদালতে যাইয়া খরচ পত্র করিয়া,—সময় নষ্ট করিয়া সামান্য টাকা আদায় করাও সম্ভব নহে। এই যে টাকাটা অনাদায় থাকে, সেটাও দোকানদারকে পণ্যের উপর পোষাইয়া লইতে হয়। যে দোকানদার কেবল নগদ বিক্রয় করে, তাহার টাকা অনাদায় থাকে না; কাজেই সে অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে পণ্য বিক্রয় করিতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে দোকানদার কেবল নগদে বিক্রয় করে, সে যে দামে পণ্য বিক্রয় করিতে পারে, যে দোকানদার ধারে বিক্রয় করে, সে সে দরে পণ্য বিক্রয় করিতে পারে না।

এতদ্ভিন্ন কেবল নগদে কাজ করিলে যথাসম্ভব অল্প মূলধনে ব্যবসায় চলে। অল্প টাকায় অনেকটা কারবার করা যায়। মূলধন পুনঃপুনঃ ঘুরিয়া যায়—তাহাতে অনেক খরিদ বিক্রয়ের কাজ চলে। যে সকল দোকান কেবল নগদে চলে, তাহাতে এমনও দেখা গিয়াছে যে, বৎসরে

মূলধন দশবার ঘুরিয়াছে, অর্থাৎ দশবার মূলধনের পূর্ণ টাকাটায় দ্রব্য খরিদ হইয়াছে।

আবার যে দোকানদার ধারে বিক্রয় করে না, তাহার ধারে কিনিবারও আবশ্যক হয় না। তাহার হাতে টাকা থাকে, সে বাজার সুবিধা বুঝিয়া মাল ক্রয় করিতে পারে। সুবিধার বাজারে অল্পদামে ভাল মাল ক্রয় করে। যে ধারে বিক্রয় করে, সে টাকা আদায় করিয়া—সংগৃহীত টাকার মাল ক্রয় করিতে না করিতে বাজার বদলাইয়া যায়—সুবিধা চলিয়া যায়। নগদে কারবারের এই আর এক **বিশেষ সুবিধা।**

সুতরাং নগদে বিক্রয়ের সুবিধা প্রধানতঃ এই কয়টি :—

(১) টাকা আবদ্ধ থাকে না এবং অনাদায়ে বাকি মারা যায় না।

(২) যথাসম্ভব অল্প মূলধনে যথাসম্ভব অধিক কাজ করা যায়।

(৩) নগদে বিক্রয় করিলে নগদে ক্রয় করা যায়; কাজেই সুবিধার বাজারে সুবিধা দরে ভাল জিনিস ক্রয় করা যায়।

এই সুবিধাগুলি বড় সামান্য নহে।

ধারে কাজ করায় ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়পক্ষেরই আরও কতকগুলা অসুবিধা আছে। খরিদদারের কাছে পাওনা ("বিলাত বাকি") সত্ত্বেও অনেক দোকানদার দেউলিয়া হয় বা অমনই দোকান উঠাইয়া দিতে বাধ্য হয়। পাওনা টাকার অনাদায় হেতু বা সময়ে আদায় করিতে না পারায় দোকান উঠিয়া যায়। ব্যবসায়দারের পক্ষে এ বড় লোক্‌সান।

ধারে জিনিস পাইলে ক্রেতা অনেক সময় আপনার আয়ের দিকে লক্ষ্য না করিয়া জিনিস ক্রয়ে অতিরিক্ত অধিক ব্যয় করিয়া বসে। ইহার ফল বিষময়। কোন প্রসিদ্ধ ইংরাজ অর্থনীতিবিদ্ বলিয়াছেন—সত্যই ধারে শ্রমজীবিগণের সর্ব্বনাশ হয়। আবার লোকের স্বভাব এই যে, যখন দেনা অত্যন্ত অধিক হইয়া উঠে, শোধ করিবার আর কোনই উপায় না থাকে, তখন আর লোকে ব্যয় সংক্ষেপ করিতে যত্নবান হয় না; "একেন পাপ, শতেন পাপ"—ভাবিয়া খরচ করিতে আরম্ভ করে; শেষে তাহার সর্ব্বনাশ হয়। ক্রেতা যে দোকানে ধারে জিনিস লয়, সে সেই দোকানে জিনিস লইতেই বাধ্য, কারণ নহিলে দোকানদার নালিশ করিতে পারে, নানা দোকানে

দেনা হইলে তাগাদা আরও অধিক হয়—ইত্যাদি। কাজেই দোকানদার যাহা চাহে, তাহাকে তাহাই দিতে হয়; দোকানদারও সুবিধা পাইয়া তাহার নিকট যথাসম্ভব অধিক লয়—বাকি টাকাটা পোষান চাহি—তদ্ভিন্ন আদায়ের সম্ভাবনার জন্যও কতকটা ভয় আছে। ক্রেতা যেন বিক্রেতার দাস হইয়া পড়ে!

আবার ধারে বিক্রয়ের প্রথায় অসাধুর ঋণ সাধুকে শোধ করিতে হয়—উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে পড়ে। অসাধু ক্রেতার নিকট যে টাকাটা অনাদায় পড়ে—দোকানদার তাহা মোটের উপর অন্য সব জিনিসের উপর পোষাইয়া লয়;—তাহার আর সব ক্রেতাকেই প্রকারান্তরে সে টাকাটা দিতে হয়।

ইংলণ্ডে অনেকগুলি দোকান কেবল নগদ বিক্রয় করে। তাহাদের হিসাব নিকাশে দেখা যায়, তাহারা যদিও অন্য সব দোকানের অপেক্ষা শতকরা কুড়ি টাকা কম দামে জিনিস বিক্রয় করে, তথাপি তাহাদের লাভ অন্য দোকানের লাভের অপেক্ষা অধিক ভিন্ন—অল্প নহে। লণ্ডনের এইরূপ নগদে বিক্রয়-ব্যবসায়ী একটা দোকানের মূল্য তালিকা দেখিয়া মফঃস্বলে একজন দোকানদার বলিয়াছিল,—এ দোকানে আমার দোকানের অপেক্ষা শতকরা কুড়ি টাকা কম দামে জিনিস পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু ইহারা যে কেবল নগদে কারবার করে। আমি যদি কেবল নগদে কারবার করিতে পাই, তবে আমিও এখনকার অপেক্ষা শতকরা কুড়ি টাকা কম দামে জিনিস বিক্রয় করিতে পারি; অধিকন্তু তাহাতে আমার অধিক লাভ থাকে।

কথাটা খুবই সত্য। লণ্ডনে অনেকগুলি Co-operative সমিতির দোকান আছে। তাহাদের লাভের কতকটা ক্রেতাদিগের মধ্যে বিভক্ত হয়। তাহারা ধারে বিক্রয় করে না। তাহাদের হিসাব দেখিয়া অর্থনীতিবিদ্গণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ধারে জিনিস বিক্রয়ের প্রথায় ক্রেতাকে শতকরা কুড়ি টাকা অধিক দিতে হয়; অর্থাৎ নগদে কাজ হইলে তিনি যাহা একশত টাকায় পাইতেন, ধারে কাজ হওয়ায় তাঁহাকে তাহারই জন্য একশত কুড়ি টাকা দিতে হয়। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই শতকরা কুড়ি টাকা "টেক্স" আমরা দিয়া থাকি, অথচ তাহার কথা জানিও না। গভর্ণমেণ্ট যদি এখন নিয়ম করেন যে, যে যত টাকার জিনিস কিনিবে, তাহাকে সেই টাকার উপর শতকরা কুড়ি টাকার একটা "টেক্স"

দিতে হইবে; তবে আমরা তাহার বিরুদ্ধে কতই আপত্তির উত্থাপন করি, অথচ আমরা স্বেচ্ছায় এই শতকরা কুড়ি টাকা "টেক্স" দিয়া আসিতেছি!

কাজেই দেখা যাইতেছে, ধারে ক্রয়বিক্রয় উঠিয়া গেলে, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষেরই বিশেষ লাভ হয়।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

বঙ্গবালিকার প্রাণ।

সংসারে বালক-বালিকার প্রাণ পূর্ণবয়স্ক নরনারীর হৃদয় অপেক্ষা কোমল হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। স্বার্থচিন্তা এবং আত্মসুখাভিলাষ সম্পূর্ণরূপে ইহাদের অন্তঃকরণ অধিকার করিতে পারে না বলিয়াই, এই প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। আবার সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা নারীর প্রাণ অধিক কোমল বলিয়া, বালক অপেক্ষা বালিকার প্রাণে স্নেহমমতা ও পর-দুঃখ-কাতরতা সমধিক প্রবল। বঙ্গরমণী ভিন্নদেশীয় নারীগণের সহিত অন্য বিষয়ে তুলনায় সমকক্ষ না হইলেও, হৃদয়ের কোমল গুণে বোধ হয়, এখনও জগতের আদর্শস্থানীয়। সুপরিচিত নব্যকবি প্রিয়সুহৃৎ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বঙ্গরমণীর গুণগান করিতে যাইয়া ইহাদিগকে 'জীব-প্রেমপূরিত-হৃদয়া' 'দেবী' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা এ বর্ণনার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। বস্তুতঃ এ বিষয়ে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের রমণীপ্রকৃতি ও বঙ্গরমণীর প্রকৃতি হইতে পৃথক। কয়েক বৎসর হইল, আমি আমার একজন আত্মীয় সমভি-ব্যাহারে কলিকাতার অদূরবর্ত্তী কোন এক স্থানে গঙ্গায় অবগাহন নিমিত্ত গমন করি। আষাঢ় মাস, প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। গঙ্গার জল বাড়িয়াছে। আমরা জলে নামিব, এমন সময়ে একটী নীচজাতিয়া বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক ঘাট হইতে আমাদিগকে কহিল, "বাবা! নদীতে হাঙ্গর আসিয়াছে, সিঁড়ির উপর বসিয়াই গা ধোন, আপনারা জলে যাইবেন না।" আমার আত্মীয় চিরদিন কাশীধামে অবস্থিতি করেন, তিনি বৃদ্ধার কথাটী শুনিয়া একটু হাসিলেন এবং আমাকে কহিলেন, "দেখিবেন, বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের প্রাণ আর পশ্চিমা স্ত্রীলোকের প্রাণ! আমার মনে আছে, একদিন কাশীতে

সন্ধ্যার সময়ে একটী সঙ্কীর্ণ গলিতে চলিতে চলিতে আমাদের সঙ্গীয় একটী লোক পথের পার্শ্বে গর্ত্তে পড়িয়া যায়। একটী স্ত্রীলোক নিকটে বসিয়া কলা বেচিতেছিল। লোকটী বিলক্ষণ বেদনা পাইয়াছিল, কিন্তু সে দেখিয়াই হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "মরদ্ হোকে গির গিয়া"—পুরুষ (হইয়া) পড়িয়া গিয়াছে। এই বৃদ্ধা সেখানে থাকিলে নিশ্চয় বলিত, "আহা বাবা বড় লেগেছে!" ও আমাদিগকে চেনেনা, অথচ জলে নামিবার পূর্ব্বেই সাবধান করিয়া দিতেছে।" পাঠক দেখিবেন, উভয়ে কত প্রভেদ! একজন ভাবী আশঙ্কা নিবারণের জন্য পূর্ব্ব হইতে সতর্ক; অন্যে উপস্থিত যাতনা দেখিয়াও উপহাস করিতে কুণ্ঠিত নহে। তাই বলিতেছিলাম পরদুঃখ-কাতরতায় বঙ্গনারী বুঝি অদ্বিতীয়। বঙ্গবালিকার প্রাণ যে আরও কোমল হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা কোন বঙ্গবালিকার একটীমাত্র উক্তির উল্লেখ করিয়া তাহার প্রাণের পরিচয় দিব। এই বালিকা বঙ্গের কোন সুবিখ্যাত দানশীল ভূম্যধিকারীর দুহিতা, এবং অন্য এক ধনাঢ্য ভূস্বামীর পুত্রবধূ। কয়েক বৎসর হইল ইহার বিবাহ হইয়াছে। ভূস্বামীর একমাত্র পুত্র, সুতরাং শ্বশ্রূ-ভবনেও বধূর আদর অত্যন্ত অধিক। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ইহার বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বৎসর। একদিন সন্ধ্যার সময়ে ইহার শ্বশুর-বাড়ীর আমলাবর্গ এবং অন্যান্য ভৃত্যগণ বড়ই উল্লাসিত হইয়া আমোদ করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে সন্দেশ মিঠাই বৃষ্টি হইতেছিল। বধূ তাঁহার শ্বশ্রূকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! ইহাদের আজ এত আমোদ দেখিতেছি কেন?" শ্বশ্রূ উত্তর করিলেন, "আজ আমাদের একটী নূতন জমিদারী খরিদ হইয়াছে, তাহার আয় প্রায় দশ হাজার টাকা। সেই সংবাদ আজ বৈকালে আসিয়াছে বলিয়া উহারা সন্দেশ মিঠাই কিনিয়াছে। যে জমিদারের এই সম্পত্তি ছিল, পূর্ব্বেই তাঁহার কতক সম্পত্তি আমাদের কেনা হইয়াছিল, এইটীই তাঁহার বড় জমিদারী, তাহা আজ খরিদ হইয়াছে।" বালিকাবধূ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "হাঁ মা! তাঁর জমিদারী বিক্রয় হইল কেন?" শ্বশ্রূ কহিলেন, "দেনার জন্যে, শুনিয়াছি তিনি বড়ই বেহিসাবী লোক, আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী তাঁহার চিরদিন।" "আচ্ছা মা! এখন তাঁর চলিবে কিসে?" বলিয়া বধূ কাতরভাবে খাশুড়ীর মুখের দিকে চাহিলেন। "আর চলিবে কিসে, কষ্ট

পাবেন; যা ছিল, সবই গেল;" এই বলিয়া শাশুড়ী উত্তর করিলেন। বালিকা এইবার কাঁদো কাঁদো মুখে কহিলেন, "মা! ঠাকুরকে (শ্বশুরকে) বলুন, তাঁর জমিদারীটা ফিরাইয়া দিতে; মা! চিরকাল জমিদারী করে এখন কি কষ্টই হবে তাঁর! আচ্ছা মা! আমাদের বাড়ীতে আজ এই আমোদ; কিন্তু তাঁদের বাড়ীতে বোধ হয়, উনুনে হাঁড়িও চড়েনি। ওদের বারণ করুন্ আমোদ কর্ত্তে।" শেষের কথাগুলির সঙ্গে বালিকার চক্ষুঃ দিয়া জল পড়িল। শাশুড়ীর প্রাণে বিলক্ষণ আঘাত লাগিল, তিনি তৎক্ষণাৎ স্বামীকে ডাকিয়া সমস্ত কথা কহিলেন, বিষয়ী শ্বশুরেরও হৃদয় বিচলিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ আমলাদিগের আমোদ বন্ধ করিয়া দিলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই তিনি আমাদের নিকট ইহার উল্লেখ করিয়া কহিলেন, "যে মানুষের মেয়ে একথা ত বলিবেই। কথাটী আমার প্রাণেই এত লাগিয়াছে যে, সেই অবধি কেবলই মনে হয়, কোনরূপে এই সর্ব্বস্বান্ত জমিদারের গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান রাখিয়া দেই।" ইহার পরে তিনি কি করিয়াছিলেন, বালিকার প্রার্থনা কতটা সফল হইয়াছিল কি না, আমরা তাহার সংবাদ রাখিব না। কিন্তু কথাটী শুনিয়াই প্রাণে এত আহ্লাদ হইয়াছিল যে, তাহা লিখিয়া বুঝাইবার নহে। সংসারে অনেক সময়েই একের সম্পত্তির বৃদ্ধি হইতে হইলে, অন্যের সম্পত্তির ক্ষয় হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের বাড়ীতে আমোদ, তাদের হয়ত উনুনে হাঁড়িও চড়ে নাই; এমন ভাব সহসা কয়জনের হৃদয়ে উদয় হয়? উপরোক্ত ভূস্বামীর বাড়ীতেই এই দেবস্বভাবা বালিকা ব্যতীত অন্য কাহারও মনে এমন চিন্তার উদয় হয় নাই। তবে বালিকার শ্বশুরের ন্যায় আমরাও স্বীকার করিতে প্রস্তুত যে, যেমন পিতা, তাহাতে দুহিতা এইরূপই হওয়া উচিত। "আকরে পদ্মরাগাণাং জন্মঃ কাচমণেঃ কুতঃ?" ফলতঃ এই বালিকার পিতার ন্যায় দানশীল ও উদারস্বভাবের জমিদার আমরা অল্পই দেখিয়াছি। অনেকস্থলেই তাঁহার দান গৃহীতা ভিন্ন অন্যে জানিতে পারে না। ইহা অপেক্ষা অধিক পরিচয় আর আমরা দিব না। দুহিতা পিতার হৃদয় সম্পূর্ণ পাইয়াছেন, সন্দেহ নাই; পরের প্রতি মমতা, দুঃখীর প্রতি দয়া চিরদিন তাঁহার সমান থাকিবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবিনী করুন্।

শ্রীচন্দ্রশেখর কর।

আজ।

বনে বনে ফিরিতেছি, পাখী আর গাহে না;
নয়নে নাহি কি আর প্রণয়ের রাগ?
বনে বনে ফিরিতেছি, ফুল আর চাহে না;
কপোলে নাহি কি আর চুম্বনের দাগ?

ঘরে ঘরে ফিরিতেছি, শিশু আর হাসে না;
মুখেতে নাহি কি আর কল্পনার ভাষা?
দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছি, নারী কাছে আসে না;
হৃদয়ে নাহি কি আর সৌন্দর্য্য-পিপাসা?

কাছে কাছে ফিরিতেছি, সখা আর ডাকে না;
নিতে দিতে পারি না কি সুখ দুখ আর?
পাছে পাছে ফিরিতেছি, কেহ কাছে থাকে না;
হারায়ে কি ফেলিয়াছি বাঁশরী আমার?

বেড়াইব ঘুরে ঘুরে ঘাটে মাঠে পথে কি
বায়ু-বিতাড়িত শুষ্ক পত্রের মতন!
যৌবন-মধ্যাহ্নে এই, সুন্দর জগতে কি,
শরতের মেঘ মত, নিস্পৃহ জীবন!

কারো দৃষ্টি, কারো শ্বাস, কভু কারো স্পর্শ কি
লবে না আপন করি এ শূন্য হৃদয়?
পীরিতি কল্পনা আশা সুখ দুখ হর্ষ কি
এ জীবনে পাইবে না কারো পদাশ্রয়!

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

বিশ্ব-রচনা।

হর্সেলের পর যে সকল প্রথিতমহিমা জ্যোতির্ব্বিদগণ তারাজগতের গঠন-পদ্ধতির বিষয় অনুশীলন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে পুল্‌কোবর বেধালয়ের অধ্যক্ষ জ্যেষ্ঠ ষ্ট্রুবের মত বিবৃত হইতেছে। তারাজগতের গঠন-সম্বন্ধে ষ্ট্রুবের যে বিচারণা, তাহা প্রধানতঃ বেস্‌সেল্‌ কর্ত্তৃক পরিলক্ষিত বিষুবমণ্ডলের উভয়পার্শ্বে ১৫° বিস্তীর্ণ অর্থাৎ ৩০° পরিমিত আকাশের মধ্য-মেখলার অন্তর্গত তারাসংখ্যার উপরে সংস্থাপিত। যে অনুমানের উপর ষ্ট্রুবের মত সংস্থাপিত, তাহা হর্সেলের উত্তরকালীন মতের বিসদৃশ নহে; কারণ ষ্ট্রুবও মনে করিতেন যে, তারাগণের শ্রেণীর দ্বারা তাহাদের দূরত্ব লাভ হয় অর্থাৎ তারাগণের দূরত্ব তাহাদিগের ঔজ্জ্বল্যের বিলোমানুপাতী,—যে যত নিকট, সে তত উজ্জ্বল। হর্সেলের মত এই যে, যদি রবিকে মধ্যে রাখিয়া এরূপ হিসাবে কতিপয় সঙ্কেন্দ্রিক গোলকল্পনা করা যায়, যে গোলদ্বয়ের মধ্যগত স্থানের সহিত তারাশ্রেণীর সামঞ্জস্য থাকে, তবে উত্তরোত্তর যত ঊর্দ্ধদিকে যাইবে, মন্দাকিনীতে এবং মন্দাকিনীতটে ততই তারাগণের নিবিড়তার বৃদ্ধি দেখিতে পাইবে। এ সিদ্ধান্ত পূর্ব্বোক্ত তথ্য হইতেই উপলব্ধি হয়; কারণ তারা যত ছোট ছোট হয়, ততই তাহারা মন্দাকিনী প্রদেশে ঘন ঘন দেখায়। ষ্ট্রুব বলেন যে, যে সকল তারা শুধু চক্ষে স্পষ্টরূপে দেখা যায় অর্থাৎ যদি কেবল পঞ্চম শ্রেণীর তারাগুলি ধর, তবে সেগুলি মন্দাকিনী-তটে যেমন নিবিড় নভোমণ্ডলের অন্যান্য ভাগেও তেমনই নিবিড়; কিন্তু মন্দাকিনী প্রদেশে ষষ্ঠ শ্রেণীর তারা অন্যত্র অপেক্ষা নিবিড়তরে এবং সপ্তম শ্রেণীর গুলি ততোধিক নিবিড়। এইরূপ বিন্যাসের বিষমতা দৃষ্টিযন্ত্রের শক্তি অনুসারে উত্তরোত্তর বেশী বেশী দেখা যায়।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ষ্ট্রুব সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তারা-জগৎ মন্দাকিনীক্ষেত্রের সমান্তর তারাস্তরে সংগঠিত। এই স্তর সকলের তারার নিবিড়তা সমান নহে। মধ্য স্তরগত ও তৎপার্শ্বগত তারাগণের নিবিড়তা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; এবং এই মধ্যস্তরের মধ্যস্থলে আমাদিগের রবির অবস্থিতি।

এই মধ্যস্তর হইতে বহির্গমন করিলে উভয়পার্শ্বে তারাগণের ক্রমশঃ বিরলতা দৃষ্ট হইতে থাকে। কিন্তু স্তর হইতে স্তরান্তর কোথা শেষ বা আরম্ভ হইল, এরূপ সুপরিচ্ছিন্ন সীমা লাভ হয় না; যেমন নভোমণ্ডলের ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকিলে বায়ু উত্তরোত্তর পাতলা দেখা যায়, অথচ বায়ু এত অল্পে অল্পে পাতলা হইতে থাকে যে, বায়ুমণ্ডল কোথা শেষ হইল, তাহার ঠিকানা করা যায় না; তেমনই ষ্ট্রুবের মত এই যে, যদি আমরা মন্দাকিনীর এড়ো দিকে বায়ুমণ্ডলে আরোহণ করি, তবে বায়ুর মত তারা সকল ক্রমে ক্রমে পাতলা দেখিব।

হর্সেলের দূরবীক্ষণের নভোমণ্ডল ভেদ করিয়া যতদূর পর্য্যবেক্ষণ করিবার শক্তি ছিল, সেই দূরত্বকে একক ধরিয়া ষ্ট্রুব মন্দাকিনীর উভয় পার্শ্বের তারাগণের নিবিড়তার এইরূপ হিসাব দিয়াছেন।

মন্দাকিনীর মধ্যগত প্রধান ক্ষেত্র হইতে অন্তর	নিবিড়তার পরিমাণ	সন্নিহিত তারাদ্বয়ের মধ্যম ব্যবধান।
প্রধান ক্ষেত্রে	১· ০০০০০	১· ০০০
প্রধান ক্ষেত্র হইতে ০· ০৫ অন্তরে	০· ৪৮৫৬৮	১· ২৭২
" " ০· ১০ "	০· ৩৩২৮৮	১· ৪৫৮
" " ০· ২০ "	০· ২৩৮৯৫	১· ৬১৩
" " ০· ৩০ "	০· ১৭৯৮০	১· ৭৭২
" " ০· ৪০ "	০· ১৩০২১	১· ৯৭৩
" " ০· ৫০ "	০· ০৮৬৪৬	২· ২৬১
" " ০· ৬০ "	০· ০৫৫১০	২· ৬২৮
" " ০· ৭০ "	০· ০৩০৭৯	৩· ১৯০
" " ০· ৮০ "	০· ০১৪১৪	৪· ১৩১
" " ০· ৮৬৬ "	০· ০০৫৩২	৫· ৭২৯

মধ্যক্ষেত্রে তারাগণের নিবিড়তা এবং উভয়পার্শ্বে তারাগণের ক্রম বিরলতা দ্বারা তারাবিন্যাসের সাধারণ ভাবমাত্র উপলব্ধি হয়। পরন্তু নিজ মধ্যক্ষেত্রগত এক প্রদেশের তারাগণ অন্য প্রদেশের তারাগণ অপেক্ষা বহুগুণে

নিবিড় হওয়ার বিলক্ষণ সম্ভাবনা; আর মধ্যক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পার্শ্বদ্বয়ে যাও, সেখানেও দেখিবে বিরলতার হ্রাস নানাস্থানে নানারকম। পার্শ্বদ্বয়ে যে ক্রমবিরলতা তাহা অবশ্য অস্বীকর্ত্তব্য নহে; কিন্তু ষ্ট্রুবের প্রমাণ প্রশস্ত বলিয়া অনেকে মনে করেন না; কারণ তিনিও হর্সেলের ন্যায় তারাগণ যে বস্তুতঃ ছোট বড়, তা না স্বীকার করিয়া, স্বীকার করিতেন যে, পৃথিবী হইতে তারাগণের দূরত্ব নিবন্ধন তারাগণ ছোট বড় দেখায়। যে স্থলে তারাবিন্যাস প্রায় সমভাবাপন্ন, সেস্থলে এ কল্পনা নিতান্ত দোষের না হইতে পারে, কিন্তু অসমভাবে বিন্যস্ত তারাস্তূপে উপনীত হইলে, বিশেষতঃ দূরবীক্ষণ ভেত্তব্য তারাজগতের উপান্তে আসিলে বিষয়টি সম্পূর্ণ রূপান্তর ধারণ করে। এস্থলে উপান্তে স্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারা সকলকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে নির্ব্বাচন করাই দুঃসাধ্য, এবং বড় বড়গুলি সীমার বাহিরে পড়িল, তবেই ষ্ট্রুবের ক্রমবিরলতা যে তারাগণের উজ্জ্বলতার বাস্তব তারতম্যজনিত তাহা বলিতে হইল।

তারাজগৎ সম্বন্ধে ইদানিন্তন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মধ্যে সুবিখ্যাত প্রকটরের বিচারণা সবিশেষ আলোচনার বিষয়; কারণ যে সকল তথ্য তাঁহার মতের ভিত্তিমূল, সে সকল তথ্য পূর্ব্বোক্ত অনুসন্ধাতৃগণের সুপরিচিত, বা পর্য্যবহিত ছিল না। প্রকটর বলেন যে, যিনিই তারাজগতের বিন্যাসসম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তিনিই স্বীকার করিয়াছেন যে, তারাগণ বাস্তব উজ্জ্বলতা সম্বন্ধে সদৃশ ভাবাপন্ন অথবা তাহারা অন্তরীক্ষের সর্ব্বত্র সমভাবে সন্নিবিষ্ট,—এই বিষমপ্রমাদে সকলেই পড়িয়াছেন। প্রকটরের এ কথায় কাহার দ্বিরুক্তি করিবার শক্তি নাই।

তিনি বলেন যে, নভোমণ্ডলের নানাস্থানে বহুবায়ত তারাসংখ্য আছে। সেই সকল তারাসংঘের এমন একটি সাধারণ বাস্তব গতি আছে যে, তাহা উক্ত তারাসংঘের অন্তর্ভূত বা তৎপার্শ্বস্থ তারাগণের গতি হইতে সম্পূর্ণ বিসদৃশ। তবেই এরূপ তারাসংঘযোগে এক একটি তারাব্যূহ সংগঠিত হইয়াছে। এই ব্যূহের গতিজনিত তদন্তর্গত তারাগণের গতি ঘটিয়া থাকে, অথচ তাহাদের সাপেক্ষিক গতির কোন ব্যত্যয় ঘটে না। বৃষরাশি, এবম্ভূত তারাব্যূহের একটি অপূর্ব্ব উদাহরণস্থল। রোহিণী ও কৃত্তিকার মধ্যগত বহুসংখ্যক সমুজ্জ্বল তারা প্রতি শতবর্ষে চাপাত্মক ১০ বিকলা পরিমাণে পূর্ব্বাভিমুখে

গমন করে। এ তারাসংঘে কতগুলি তারা আছে, তাহা কেহই বলিতে পারেন না, কারণ সমুজ্জ্বল তারা ভিন্ন অপরগুলির গতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরূপিত হয় নাই। সপ্তর্ষির অন্তর্গত ৫টী তারার এইরূপ স্বকীয় গতি আছে। এ ছাড়া আরও কত তারাব্যূহ আছে। অতএব প্রকটর বলেন, মন্দাকিনী এবম্ভূত তারাব্যূহ হইতে পারে। আর মন্দাকিনীর যে আয়তি হর্সেল নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহা না হইতে পারে।

ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর তারাগণের ব্যূহভাবত্ব সম্বন্ধে আরও পর্য্যবেক্ষণ না হইলে শুদ্ধ প্রকটরের বিচারণার উপর নির্ভর করিয়া বিশ্বরচনাবাদ পক্ষে কত দূর মত পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে, তাহা বিবেচ্য। পরন্তু নির্ব্বিবাদে বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বাপেক্ষা এখন তারাগণ মধ্যে যে ব্যূহভাব প্রাপ্তি পক্ষে একটা প্রবণতা আছে, তাহার প্রমাণ অধিক পাওয়া যাইতেছে। অর্থাৎ তারাগণের পরস্পর সংযোগাধীন আকার বিশেষ প্রাপ্তির প্রতি যে ঝোক, তাহা বেশী বেশী দেখা যাইতেছে। কতিপয় যুগল তারার কক্ষা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উইল্‌সন্ সাহেব যে অপূর্ব্ব ফললাভ করিয়াছেন, তদ্দারা উক্ত প্রবণতা অনেকটা বিশদীকৃত হইয়াছে। জ্যোতিষ-জগতে লব্ধখ্যাতি মরালকে ৬১ সংখ্যক তারাযুগলের মধ্যে যে প্রাকৃত সংযোগ আছে, তাহা বিনিঃসন্দেহ, তথাপি পরস্পরের আকর্ষণজনিত, তাহাদিগের গতিতে কোন রকম ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না। ১৭৫৩ হইতে ১৮৭৪ পর্য্যন্ত উক্ত তারাযুগলের পরীক্ষণ করিয়া উপলব্ধি হইয়াছে যে, তাহাদিগের গতি সমভাবাপন্ন এবং প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে চলিতেছে। কিন্তু তারাদ্বয়ের যুগলত্ব প্রযুক্ত ব্যবধানের এতই স্বল্পতা যে, তাহাদের গতির স্বাতন্ত্র্য সহজে স্বীকার করা যায় না। সুতরাং বলিতে হইবে যে, তারা দ্বিতয়ের প্রত্যেকে তাহাদের ভারমধ্যপরিত সুবৃহৎ কক্ষায় পরিভ্রমণ করিতেছে। এ কক্ষার পরিমাণ চাপাত্মক কতিপয় বিকলা, কলা নহে; কতিপয় অংশ ও ভগণ কাল হাজার হাজার বৎসর হওয়া সম্ভব। তারাদ্বয়ের মধ্যে এখন যে ব্যবধানটুকু আছে, তাহা এখন হইতে ২০০০ বৎসর অতিবাহিত না হইলে পরিমেয় বলিয়া বোধ হইবে না।

পুনর্ব্বসুনক্ষত্রের আল্‌ফা অঙ্কিত কস্তরাখ্য তারাটী উক্তবৎ ভাবাপন্ন যুগল তারার উদাহরণান্তর। ইহার কক্ষা ভভ্রম রেখাকার বলিয়া প্রতীতি

হয়। কক্ষা যদি ভভ্রমরেখা হয়, তবে তারাদ্বয়ের মধ্যে কোনরূপ প্রাকৃতিক সম্বন্ধের অস্তিত্ব সম্ভবনীয় নহে। প্রত্যুত তারাদ্বয় অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে অকস্মাৎ কিয়ৎকালের জন্য এত সন্নিকৃষ্ট হইয়াছে যে, পরস্পর পরস্পরের আকর্ষণাধীন হইয়া পড়িয়াছে, এবং কালবশাৎ ক্রমে ক্রমে চির-কালের জন্য অন্তরিত হইতে থাকিবে; আর এখন একত্রিত হওয়ার পর যে ভাবে একত্রিত হইবার পুর্ব্বে সে ভাবে চলিত না। পরন্তু উক্ত কক্ষা যে ভভ্রমরেখাকার তাহা স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কারণ এস্থলে বৃহদ্‌বৃত্তাভাসে ও ভভ্রমরেখায় যে ভেদ তাহা ধরা বড় কঠিন। ফলতঃ উক্ত জ্যোতিষ্কদ্বয়ের স্বীয় সাধারণ গতি দেখিয়া প্রতীতি হয় যে, তদ্‌দ্বয় যুগলতারা এবং প্রত্যেক অনেক তফাতে গিয়া পড়ে।

তবেই অনেক অনেক যুগল তারাকে তাহাদের সাধারণ ভারমধ্য পরিতঃ সুবৃহৎ কক্ষায় ভ্রমণ করিতে দেখিয়া, বিশ্বাস হইতে পারে যে, নভো-মণ্ডলে এবম্ভূত বহুসংখ্যক তারাযুগল, তারাস্তূপ এবং তারাব্যূহ আছে; যাহাদের অঙ্গীভূত তারা সকল পরস্পর হইতে এত তফাৎ যে, কখন কেহ অনুমান করিতে পারে নাই, যে তাহারা সম্বন্ধবিশেষে আবদ্ধ। এবং দিগ্‌দিগন্তে বিক্ষিপ্ত স্বকীয় সাধারণ গতিবিশিষ্ট তারাস্তূপ সকল উক্তরূপ ব্যূহ বিশেষের অঙ্গ হইতে পারে।

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের ইংরাজী।

আযতি,	Extension.	মন্দাকিনী,	Galaxy, Milky way.
আলফা,	Alpha.	মরালক,	Cygnus.
একক,	Unity.	যুগল,	Binary.
কস্তর,	Castor.	রোহিণী,	Aldebaran.
কৃত্তিকা,	Pleiades.	বাদ,	Theory.
ক্ষেত্র,	Plane.	বিকলা,	Second.
চাপাত্মক,	Angular.	বিন্যাস,	Arrangement.
ঝোক,	Tendency.	বিরলতা,	Thinness.
তথ্য,	Fact.	বেধালয়,	Observatory.
তারাস্তূপ,	Cluster of stars.	বেসসেল্‌স,	Bessels.

নিবিড়তা,	Thickness, density.	ব্যূহ,	System.
পুনর্ব্বসু,	7th. Lunar mansion.	শ্রেণী (তারা)	Magnitude.
পুলকোবা,	Pulkowa.	ষ্ট্রুব,	Struve.
প্রকটর,	Proctor.	সংকেন্দ্রিক,	Concentric.
প্রবণতা,	Tendency.	সপ্তর্ষি,	Ursamajor.
ভগ্নরেখা,	Hyperbola.	সামঞ্জস্য,	Correspondence.
ভেদ্যব্য	Penetrable.	সুপরিচ্ছিন্ন,	Well definid.

শ্রীমাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।*

(শ্রীম—কথিত।)

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সিন্দুরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজে গমন ও শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির সহিত কথোপকথন।]

কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথি। ইংরাজী ২৬শে নবেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। শ্রীযুক্ত মণিমল্লিকের বাটীতে সিন্দুরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হইত। বাড়ীটী চিৎপুর রোডের উপর, পূর্ব্বধারে; হ্যারিসন রোডের চৌমাথা—যেখানে বেদানা, পেস্তা, আপেল এবং অন্যান্য মেওয়ার দোকান আছে, সেখান হইতে কয়েকখানি দোকান-বাড়ীর উত্তরে। সমাজের

* এই প্রবন্ধটী ইতঃপূর্ব্বে শ্রাবণের "নব্যভারতে" প্রকাশিত হয়। সেইজন্য আমরা পুনরায় ইহা "উৎসাহে" প্রকাশ করিতে ইতস্ততঃ করি। তাহাতে লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন "The teachings of Rama krishna are of permanent interest, and never get old."———তাঁহার এই উদ্দেশ্যের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া সাহিত্য, প্রদীপ প্রভৃতি পত্র-সম্পাদকগণ প্রকাশিত প্রবন্ধ পুনঃ মুদ্রিত করিয়া থাকেন। এই উদ্দেশ্যে ইহা পুনরায় উৎসাহে প্রকাশিত হইল।

উৎসাহ সম্পাদক।

অধিবেশন রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী দ্বিতল হল-ঘরে হইত। আজ সমাজের সাম্বৎসরিক; তাই শ্রীযুক্ত মণিমল্লিক মহোৎসব করিয়াছেন। উপাসনা-গৃহ আজ আনন্দপূর্ণ, বাহিরে ও ভিতরে হরিৎ বৃক্ষপল্লবে, নানাপুষ্প ও পুষ্পমালায় সুশোভিত। গৃহমধ্যে ভক্তগণ আসন গ্রহণ করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন, কখন উপাসনা হইবে। গৃহমধ্যে সকলের স্থান হয় নাই, অনেকেই পশ্চিম-দিকের ছাদে বিচরণ করিতেছেন বা যথাস্থানে স্থাপিত সুন্দর বিচিত্র কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। মাঝে মাঝে গৃহস্বামী ও তাঁহার আত্মীয়গণ আসিয়া মিষ্ট সম্ভাষণে অভ্যাগত ভক্তবৃন্দকে আপ্যায়িত করিতেছেন। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্ম ভক্তগণ আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা আজ একটি বিশেষ উৎসাহে উৎসাহান্বিত। আজ শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংসের শুভাগমন হইবে। পরমহংসদেবের ব্রাহ্মদের উপর বিশেষ দৃষ্টি। ব্রাহ্মদের তিনি বড় ভালবাসেন, ব্রাহ্মসমাজের নেতৃগণ কেশব, বিজয়, শিবনাথ প্রভৃতি ভক্তগণকে তিনি প্রাণ-তুল্য ভালবাসেন। তাই তিনি ব্রাহ্ম ভক্তদের এত প্রিয়। পরমহংসদেব হরিপ্রেমে মাতওয়ারা, তাঁহার প্রেম, তাঁহার জ্বলন্ত বিশ্বাস, তাঁহার বালকের ন্যায় ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন, ভগবানের জন্য তাঁহার ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন, তাঁহার মাতৃজ্ঞানে স্ত্রীজাতির পূজা, তাঁহার বিষয়কথা বর্জ্জন ও তৈলধারা তুল্য নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরকথাপ্রসঙ্গ, তাঁহার সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় ও অপর ধর্ম্মে বিদ্বেষ-ভাবলেশশূন্যতা, তাঁহার ঈশ্বরভক্তের জন্য রোদন, এই সকল ব্যাপার ব্রাহ্ম ভক্তদের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে। তাই আজ অনেকে বহুদূর হইতে তাঁহার দর্শন লাভার্থে আসিয়াছেন।

[শিবনাম ও সত্যকথা।]

উপাসনার পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্যান্য ব্রাহ্মভক্তদের সহিত সহাস্য বদনে আলাপ করিতে লাগিলেন। সমাজ-গৃহে আলো জ্বালা হইল, অনতিবিলম্বে উপাসনা আরম্ভ হইবে।

পরমহংসদেব বলিলেন "হ্যাঁগা শিবনাথ আস্‌বে না?" একজন ব্রাহ্ম-ভক্ত বলিলেন, "না আজ তাঁর অনেক কাজ আছে, আস্‌তে পারবেন না।" পরমহংসদেব বলিলেন, "শিবনাথকে দেখ্‌লে আমার বড় আনন্দ হয়, আহা

যেন ভক্তিরসে ডুবে আছে; আর যা'কে অনেকে গণে মানে, তা'তে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কিছু শক্তি আছে। তবে শিবনাথের একটা ভারি দোষ আছে—কথার ঠিক নাই। আমাকে ব'লেছিল যে, একবার ওখানে (দক্ষিণেশ্বরের কালী বাটীতে) যাবে, কিন্তু যায় নাই, আর কোন খবরও পাঠায় নাই। ওটা ভাল নয়। এই রকম আছে যে, সত্য কথাই কলির তপস্যা। সত্যকে আঁট ক'রে ধ'রে থাক্‌লে ভগবান লাভ হয়। সত্যে আঁট না থাক্‌লে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হ'য়ে যায়। আমি এই ভয়ে, যদি কখনও ব'লে ফেলি যে, বাহ্যে যাব, আর বাহ্যে যদি না পায়, তবুও একবার গাড়ুটা সঙ্গে ক'রে ঝাউতলার দিকে যাই। ভয় এই যে, পাছে সত্যের আঁট যায়। যখন আমার এই অবস্থার পর মাকে ফুল হাতে ক'রে ব'লেছিলুম 'মা! এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও, মা! এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; মা! এই নাও তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; মা! এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও'—যখন এই সব ব'লেছিলুম, তখন একথা বল্‌তে পারি নাই 'মা! এই নাও তোমার সত্য, এই নাও তোমার অসত্য।' সব মাকে দিতে পাল্লুম, কিন্তু সত্য মাকে দিতে পাল্লুম না।"

(উপাসনা, সঙ্কীর্ত্তন ও পরমহংসদেবের সমাধি।)

ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা আরম্ভ হইল। বেদীর উপরে আচার্য্য, সম্মুখে সেজ। উদ্বোধনের পর আচার্য্য পরব্রহ্মের উদ্দেশে বেদোক্ত মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মভক্তগণ সমস্বরে সেই পুরাতন আর্য্য ঋষির শ্রীমুখনিঃসৃত, তাঁহাদের সেই পবিত্র রসনার দ্বারা উচ্চারিত নাম গান করিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন, "সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দমমৃতম্ যদ্বিভাতি শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্ শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।" এই প্রণব সংযুক্ত ধ্বনি ভক্তদের হৃদয়াকাশে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অনেকের অন্তরে বাসনা নির্ব্বাপিতপ্রায় হইতে লাগিল। চিত্ত অনেকটা স্থির হইল ও ধ্যানপ্রবণ হইতে লাগিল। সকলেরই চক্ষুঃ মুদিত—ক্ষণকালের জন্য বেদোক্ত সগুণ ব্রহ্মের চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পরমহংসদেব ভাবে নিমগ্ন হইলেন। স্পন্দহীন, স্থিরদৃষ্টি, অবাক্, চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া রহিলেন। যেন আত্মাপক্ষী কোথায় আনন্দে বিচরণ করিতেছে; আর দেহটীমাত্র,-শূন্য মন্দির পড়িয়া রহিয়াছে।

সমাধি ভঙ্গের অব্যবহিত পরেই পরমহংসদেব চক্ষুঃ মেলিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন, দেখিলেন, সভাস্থ সকলেই নিমীলিতনেত্র; তখন "ব্রহ্ম" "ব্রহ্ম" বলিয়া হঠাৎ দণ্ডায়মান হইলেন। উপাসনান্তে ব্রাহ্মভক্তেরা খোল করতাল লইয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন, আর নৃত্য করিতে লাগিলেন। সে মধুর নৃত্য সকলে মুগ্ধ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ও অন্যান্য ভক্তেরাও তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে লাগিলেন। অনেকে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া ও কীর্ত্তনানন্দ সম্ভোগ করিয়া এককালে সংসার ভুলিয়া গেলেন। ক্ষণকালের জন্য তাঁহারা হরিরসমদিরা পান করিয়া বিষয়ানন্দ ভুলিয়া গেলেন। বিষয়-সুখের রস তিক্তবোধ করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনান্তে সকলে আসন গ্রহণ করিলেন। এক্ষণে পরমহংসদেব কি বলেন, শুনিবার জন্য সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিলেন।

(গৃহস্থের প্রতি উপদেশ।)

সমবেত ব্রাহ্মভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন ;—

"নির্লিপ্ত হ'য়ে সংসার করা বড় কঠিন। প্রতাপ (মজুমদার) ব'লেছিল, "মহাশয় আমাদের জনক রাজার মত। জনক নির্লিপ্ত হ'য়ে সংসার ক'রে-ছিলেন, আমরাও তাই করিব।" আমি বল্লুম, "মনে কল্লেই কি জনক রাজা হওয়া যায়? জনক রাজা কত তপস্যা ক'রেছিলেন। তিনি হেঁটমুণ্ড ঊর্দ্ধপদ হ'য়ে অনেক বৎসর ঘোরতর তপস্যা ক'রে তবে জ্ঞানলাভ ক'রে-ছিলেন। জ্ঞানলাভ ক'রে তবে সংসারে ফিরে গিছ্‌লেন।" "তবে সংসারীর কি উপায় নাই? হাঁ অবশ্য আছে। দিন কতক নির্জ্জনে সাধন ক'র্ত্তে হয়। নির্জ্জনে সাধন ক'ল্লে ভক্তিলাভ হয়, জ্ঞানলাভ হয়, ভগবানের দর্শন লাভ হয়, তারপর গিয়ে সংসার কর, দোষ নাই। যখন নির্জ্জনে সাধন ক'রবে, তখন সংসার থেকে একেবারে তফাতে থাকে, তখন যেন স্ত্রী, পুত্র,

কন্যা, পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী, আত্মীয় কুটুম্ব কেহ কাছে না থাকে। নির্জ্জনে সাধনের সময় ভাব্‌বে আমার কেহ নাই, ঈশ্বরই আমার সর্ব্বস্ব। আর কেঁদে কেঁদে তাঁর কাছে জ্ঞান ভক্তির জন্য প্রার্থনা ক'রবে।"

"যদি বল, কতদিন নির্জ্জনে সংসার ছেড়ে থাক্‌ব, তা একদিন যদি এই রকম ক'রে থাক, সেও ভাল, তিনদিন থাক্‌লে আরও ভাল। বা বার দিন, এক মাস, তিন মাস, এক বৎসর যে যেমন পারে, জ্ঞান ভক্তি লাভ ক'রে সংসার কল্লে আর বড় বেশী ভয় নাই।"

"হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙ্গলে হাতে আটা লাগে না।

"চোর চোর যদি খেল, বুড়ী ছুঁয়ে ফেল্লে আর ভয় নাই।

"একবার পরেশমণিকে ছুঁয়ে সোণা হও। সোণা হবার পর হাজার বৎসর যদি মাটীতে পোতা থাক, মাটী থেকে তোলবার পর সেই সোণাই থাক্‌বে। "মনটি দুধের মত। সেই মন্‌কে যদি সংসার-জলে রাখ, তা হ'লে দুধে জলে মিশে যাবে। তাই দুধকে নির্জ্জনে দই পেতে মাখন তুল্‌তে হয়। মন-দুধ থেকে, যখন নির্জ্জনে সাধন ক'রে, জ্ঞান ভক্তি রূপ মাখন তোলা হ'লো, তখন সেই মাখন অনায়াসে সংসার-জলে রাখা যায়। সে মাখন কখনো সংসার-জলের সঙ্গে মিশে যাবে না। সংসারজলের উপর নির্লিপ্ত হ'য়ে ভাস্‌বে।

(বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।)

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সবে গয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সেখানে অনেক দিন নির্জ্জনে বাস ও সাধুসঙ্গ হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি গৈরিক বসন পরিধান করিয়াছেন। অবস্থা ভারী সুন্দর, যেন সর্ব্বদা অন্তর্মুখ। পরমহংসদেবের নিকট হেঁটমুখ হইয়া রহিয়াছেন, যেন মগ্ন হইয়া কি ভাবিতেছেন।

বিজয়কে দেখিতে দেখিতে পরমহংসদেব তাঁহাকে বলিলেন 'বিজয়! তুমি কি বাসা পাক্‌ড়েছ ?'

"দেখ দুজন সাধু ভ্রমণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে এক সহরে এসে পড়েছিল। একজন হাঁ ক'রে সহরের বাজার, দোকান, বাড়ী দেখ্‌ছিল, তখন অপরটীর সঙ্গে দেখা হ'ল। তখন সে সাধুটী বল্লে, তুমি যে হাঁক'রে সহর দেখ্‌ছ, তল্পী তাল্‌পা কোথায়? প্রথম সাধুটী বল্লে, আমি আগে বাসা পাক্‌ড়ে

তল্পী তাল্পা রেখে ঘরে চাবি দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বেরিয়েছি। এখন সহরের রং দেখে বেড়াচ্ছি। (বিজয়ের প্রতি) তাই তোমায় জিজ্ঞাসা কচ্ছি, তুমি কি বাসা পাক্‌ড়েছ?"

(মাষ্টার ইত্যাদির প্রতি।) "দেখ বিজয়ের এতদিন ফোয়ারা চাপা ছিল, এইবার খুলে গেছে।

[বিজয় ও শিবনাথ। নিষ্কামকর্ম্ম ও সকাম কর্ম্ম।]

শ্রীরামকৃষ্ণ—(বিজয়ের প্রতি) "দেখ শিবনাথের ভারী ঝঞ্ঝাট। খবরের কাগজ লিখ্‌তে হয়, আর অনেক কর্ম্ম কর্ত্তে হয়। বিষয়কর্ম্ম কল্লেই অশান্তি হয়, অনেক ভাবনা চিন্তা এসে জোটে।"

"শ্রীমদ্ভাগবতে আছে যে, অবধৌত চব্বিশ-গুরুর মধ্যে চিলকে একটী গুরু ক'রেছিলেন। এক জায়গায় জেলেরা মাছ ধর্ত্তে ছিল, একটী চিল এসে একটা মাছ ছোঁমেরে নিয়ে গেল। কিন্তু মাছ দেখে পেছনে পেছনে প্রায় এক হাজার কাক চিলকে তাড়া ক'রে গেল এবং এক সঙ্গে কা কা ক'রে বড় গোলমাল কর্ত্তে লাগ্‌লো। চিল মাছ নিয়ে যে দিকে যায়, কাকগুলোও তাড়া ক'রে সেই দিকে যেতে লাগ্‌ল। দক্ষিণ দিকে চিলটা গেল, কাকগুলাও সেই দিকে গেল, আবার উত্তর দিকে যখন সে গেল, ওরাও সেই দিকে গেল। এইরূপে পূর্ব্বদিকে ও পশ্চিম দিকে চিল ঘুর্‌তে লাগ্‌লো। শেষে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে মাছটী তার কাছ থেকে পড়ে গেল। তখন কাকগুলা চিলকে ছেড়ে মাছের দিকে গেল। চিল তখন নিশ্চিন্ত হ'য়ে একটা গাছের ডালের উপর গিয়া বস্‌লো। বসে ভাব্‌তে লাগ্‌লো, "ঐ মাছটা যত গোল ক'রেছিল। এখন মাছ কাছে নাই, তাই আমি নিশ্চিন্ত হলুম।"

"অবধূত চিলের কাছে এই শিক্ষা ক'ল্লেন যে, যতক্ষণ মুখে মাছ থাকে অর্থাৎ বাসনা থাকে, ততক্ষণ কর্ম্ম থাকে, আর কর্ম্মের দরুণ ভাবনা চিন্তা, অশান্তি। বাসনা ত্যাগ হ'লেই কর্ম্ম ক্ষয় হয়, আর শান্তি হয়।

"তবে নিষ্কাম কর্ম্ম ভাল। তাতে অশান্তি হয় না। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্ম করা বড় কঠিন। মনে কচ্চি নিষ্কাম কর্ম্ম কচ্চি, কিন্তু কোথা থেকে

কামনা এসে পড়ে, জান্‌তে দেয় না। আগে যদি অনেক সাধন থাকে, সাধনের বলে কেউ কেউ, নিষ্কাম কর্ম্ম কত্তে পারে। ঈশ্বর দর্শনের পর নিষ্কাম কর্ম্ম অনায়াসে করা যায়। ঈশ্বর দর্শনের পর প্রায় কর্ম্ম ত্যাগ হয়; দুই একজন যেমন নারদাদি লোকশিক্ষার জন্য কর্ম্ম করে।

(সঞ্চয়—'Take no thought for the morrow.')

শ্রীরামকৃষ্ণ—(বিজয়ের প্রতি) "অবধূতের আর একটী গুরু ছিল—মৌমাছি। মৌমাছি অনেক কষ্টে অনেক দিন ধ'রে মধু সঞ্চয় করে। কিন্তু সে মধু নিজের ভোগ হয় না। আর একজন এসে চাক ভেঙ্গে নিয়ে যায়। মৌমাছির কাছে অবধূত এই শিখলেন যে, সঞ্চয় কর্‌তে নাই। সাধুরা ঈশ্বরের উপর ষোল আনা নির্ভর ক'র্‌বে, তাদের সঞ্চয় কত্তে নাই।

"এটী সংসারীর পক্ষে নয়। সংসারীর সংসার প্রতিপালন কত্তে হয়। তাই সঞ্চয়ের দরকার হয়। পাখী আর দর্ব্বেশ (সাধু) সঞ্চয় করে না, কিন্তু পাখীর ছানা হ'লে সে সঞ্চয় করে—ছানার জন্য মুখে ক'রে খাবার আনে।

(বিজয়ের প্রতি,) "দেখ বিজয়! সাধুর সঙ্গে যদি পুটলী পাটলা থাকে, পনরটা গাঁটওয়ালা যদি কাপড় বুচ্‌কি থাকে, তাহ'লে তাদের বিশ্বাস কোরো না। আমি বটতলায় * ঐ রকম সাধু দেখেছিলাম। দুতিন জন বসে আছে, কেউ ডাল বাচ্ছেন, কেউ কাপড় সেলাই ক'চ্ছেন, আর বড় মানুষের বাড়ীর ভাণ্ডারার গল্প বাচ্ছেন। ব'লুছেন "আরে ও বাবুনে লাখো রূপেয়া খরচ কিয়া হ্যায়, সাধুলোককো বহুৎ খিলায়া হ্যায়; পুরী, জিলেবী, পেঁড়া, বরফী, মালপোওয়া, বহুৎ চিজ তৈয়ার কিয়া।" সকলের হাস্য।

বিজয়। আজ্ঞা হ্যাঁ! গয়ায় ঐ রকম সাধু দেখেছি। গয়ার লোটাওয়ালা সাধু। (সকলের হাস্য।)

[প্রেম ও কর্ম্মত্যাগ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (বিজয়ের প্রতি) ঈশ্বরের প্রতি প্রেম আস্‌লে কর্ম্ম-ত্যাগ আপনি হ'য়ে যায়। যাদের ঈশ্বর কর্ম্ম করাচ্ছেন, তারা করুক।

* রাসমণির দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে যে পঞ্চবটী আছে, সেই খানে।

তোমার এখন সময় হয়েছে, সব ছেড়ে তুমি ব'লো 'মন তুই দ্যাখ্ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।"

এই বলিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সেই অতুলনীয় কণ্ঠে মাধুর্য্য বর্ষণ করিতে করিতে গান গাইলেন :—

গান।

যতনে হৃদয়ে রেখ আদরিণী শ্যামা মাকে।
মন তুই দ্যাখ্ আর আমি দেখি আর যেন কেউ নাহি দেখে॥
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি।
রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা বলে ডাকে॥
(মাঝে মাঝে সে যেন মা বলে ডাকে)
কুরুচি কুমন্ত্রী যত, নিকট হতে দিওনাকো।
জ্ঞাননয়নকে প্রহরী রেখো, সে যেন সাবধানে থাকে॥
(খুব যেন সাবধানে থাকে)

[অষ্টপাশ ও জীব।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (বিজয়ের প্রতি) ভগবানের শরণাগত হ'য়ে, এখন লজ্জা ভয় এ সব ত্যাগ কর। 'আমি হরিনামে যদি নাচি, লোকে আমায় কি বল্‌বে' এই সব ভাব ত্যাগ কর।

"লজ্জা, ঘৃণা ভয়। তিন থাক্‌তে নয়॥
"লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতি, অভিমান এ সব জীবের পাশ॥
এসব গেলে তবে সংসার হতে মুক্তি হয়।
"পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব॥

"ভগবানের প্রেম বড় দুর্লভ জিনিস। স্ত্রীর যেমন স্বামীতে নিষ্ঠা আছে, সেইরূপ একটী নিষ্ঠা ঈশ্বরেতে হয়। তবেই ভক্তি হয়। শুদ্ধাভক্তি হওয়া বড় কঠিন। ভক্তিতে প্রাণ মন ঈশ্বরেতে লীন হবে।

"তার পর ভাব। ভাবেতে মানুষ অবাক্ হয়। বায়ু স্থির হ'য়ে যায়। আপনি কুম্ভক হয়। যেমন বন্দুকে গুলি ছোড়বার সময়, যে ব্যক্তি গুলি ছোড়ে, সে বাক্যশূন্য হয় ও তার বায়ু স্থির হ'য়ে যায়।"

প্রেম হওয়া অনেক দূরের কথা। চৈতন্যদেবের প্রেম হ'য়েছিল। ঈশ্বরে প্রেম হ'লে বাহিরের জিনিস সব ভুল হ'য়ে যায়। জগৎ ভুল হ'য়ে

যায়। আর নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস তাও ভুল হ'য়ে যায়।"
এই বলিয়া পরমহংসদেব আবার গান গাহিতে লাগিলেন :—

গান।

সে দিন কবে বা হবে?
হরি বলিতে ধারা বেয়ে পড়্‌বে (সে দিন কবে বা হবে)
সংসার-বাসনা যাবে (সে দিন কবে ... ...)
অঙ্গে পুলক হবে (সে দিন কবে ... ...)

* * * * *

এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময়ে নিমন্ত্রিত আর কয়েকটী ব্রাহ্ম ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে কয়েকটী পণ্ডিত ও উচ্চ-পদস্থিত রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন শ্রীরজনীনাথ রায়।

পরমহংসদেব ভাব হইলে বায়ুস্থির হয়, এই কথা বলিতেছিলেন। আরও বলিতেছিলেন, "অর্জ্জুন যখন লক্ষ্য বিঁধিতেছিলেন, তখন কেবল মাছের চোখের দিকে দৃষ্টি ছিল—আর কোন দিকে দৃষ্টি ছিল না। এমন কি মাছের চোক ছাড়া মাছের আর কোন অঙ্গ দেখিতে পান নাই। এইরূপ অবস্থায় বায়ু স্থির হয়, কুম্ভক হয়।

"ঈশ্বরদর্শনের একটী লক্ষণ—ভিতর থেকে মহাবায়ু গর্ গর্ গর্ গর্ ক'রে উঠে। উঠে মাথার দিকে যায়। তখন যদি সমাধি হয়, ভগবানের দর্শন হয়।"

[পাণ্ডিত্য]

শ্রীরামকৃষ্ণ—(অভ্যাগত ব্রাহ্ম ভক্ত দৃষ্টে) "যাঁহারা শুধু পণ্ডিত, কিন্তু ভগবানে ভক্তি হয় নাই, তাঁদের কথা গোলমেলে। সামাধ্যায়ী ব'লে এক পণ্ডিত ব'লেছিল, "ঈশ্বর নীরস, তোমরা নিজেদের প্রেম ভক্তি দিয়ে সরস কর।" বেদে যাঁকে রস স্বরূপ ব'লেছে, তাঁকে কিনা নীরস বলে! আর এতে বোধ হ'চ্ছে, সে ব্যক্তি ঈশ্বর কি বস্তু, তা কখনও জানে নাই। তাই এরূপ গোলমেলে কথা।

"একজন ব'লেছিল, 'আমার মামার বাড়ীতে একগোয়াল ঘোড়া আছে,' একথায় বুঝতে হবে, ঘোড়া আদবেই নাই।" সকলের হাস্য।

[ঐশ্বর্য্য, বিভব, মান, পদ।]

"কেউ কেউ ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার করে—বিভব, মান, পদ এই সবের অহঙ্কার করে। কিন্তু এসব দুইদিনের জন্যে, কিছুই সঙ্গে যাবে না।"

গান।

"ভেবে দ্যাখ্ মন কেউ কার নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে।
ভুলনা দক্ষিণে কালী বদ্ধ হয়ে মায়া জালে॥
যার জন্য মর ভেবে, সেকি তোমার সঙ্গে যাবে।
সেই প্রেয়সী দিবে ছড়া অমঙ্গল হবে বলে॥
দিন দুই তিনের জন্যে ভবে, কর্ত্তা বলে সবাই মানে;
সেই কর্ত্তারে দেবে ফেলে, কালাকালের কর্ত্তা এলে॥

"আর টাকার অহঙ্কারও কত্তে নাই। যদি বল, আমি ধনী, তো ধনীর আবার, তা'র বাড়া, তা'র বাড়া আছে।

"সন্ধ্যার পর যখন জোনাকি পোকা উঠে, সে মনে করে, আমি এই জগৎকে আলো দিচ্চি। কিন্তু নক্ষত্র যাই উঠ্‌লো, অমনি তার অভিমান চ'লে গেল। তখন নক্ষত্রেরা ভাব্‌তে লাগলো, আমরা জগৎকে আলো দিচ্চি। কিছুক্ষণ পরে চন্দ্র উঠলে তখন নক্ষত্রেরা লজ্জায় মলিন হয়ে গেল। চন্দ্র মনে কল্লেন, আমার আলোতে জগৎ হাঁস্‌চে, আমি জগৎকে আলো দিচ্চি। দেখ্‌তে দেখ্‌তে অরুণ উদয় হ'লো, সূর্য্য উঠ্‌লেন। চাঁদ মলিন হ'য়ে গেল—ক্ষাণিকক্ষণ পরে আর দেখাই গেল না।

"এইগুলি ধনীরা যদি ভাবে, তা হ'লে ধনের অহঙ্কার হয় না।"

উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত মণি মল্লিক অনেক উপাদেয় খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করিয়াছিলেন। তিনি অনেক যত্ন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে ও সমবেত ভক্তগণকে পরিতোষ করিয়া খাওয়াইলেন। যখন সকলে বাড়ী প্রত্যাগমন করিলেন, তখন রাত্রি অনেক হইয়াছিল। কিন্তু কাহারও কোন কষ্ট হয় নাই।

ভাণ।

(১)

"আমার সর্ব্বস্ব!" বলি বৃথা ভাণ করি,
তুমি কি হৃদয়ে আছ, হৃদয়বিহারী?
লোকে জানে, তব ধ্যানে সন্ন্যাসিনী আমি,
তুমি জান এ অন্তর, ওহে অন্তর্যামী!
কি কপট, কি কঠিন,
স্নেহহীন, প্রেমহীন,
মোর এ হৃদয়, ওহে হৃদয়বিহারী,
তোমারে "সর্ব্বস্ব" বলি বৃথা ভাণ করি।

(২)

লোকে জানে, তব ধ্যানে সন্ন্যাসিনী আমি,
তুমি জান এ অন্তর, ওহে অন্তর্যামী।
এই যে উদিতা ঊষা পূরব গগনে,
দীনা কি মগনা তব শ্রীচরণ ধ্যানে?
এই যে মধ্যাহ্ন তপ্ত শব্দহীন ধরা,
আমি কি তোমারি তরে আকুলা বিধুরা?
চন্দ্রকর-সুশীতল শান্ত স্নিগ্ধ নিশি,
তোমারি ধেয়ানে জাগি পোহাই কি বসি?
নহে নাথ, নহে, বৃথা ভাণ সব মোর,
অন্তর্যামী, জান তুমি আমার অন্তর।

(৩)

লোকে জানে, সর্ব্বত্যাগী আমি উদাসিনী,
তোমারি ধেয়ানে কাটি দিবস যামিনী।
জানেনা তো কেহ ত্যাগে কি যে অভিমান!
জানেনা এ ঔদাসীন্য শুধু বৃথা ভাণ!
লোকে দেখে, বুকে ধরি চরণ শীতল,
জানেনা কি বিষ সেথা, সংসার গরল!

(৪)

ওহে অন্তর্যামী, ওহে সর্ব্বস্ব আমার!
দাসীরে এ সম্বোধনে দাও অধিকার।
কেন তুমি সহিতেছ এত অত্যাচার?
ভাঙ্গ নাথ বৃথা যত অভিমান তার।
দাও লজ্জা, কর হেয় সংসার মাঝারে
সে ভুলে বলিয়া তুমি ভুলোনা তাহারে।

শ্রীসরলাবালা দাসী

দেশ ভ্রমণ।

রেলের গাড়ীতে একটী ব্যাপার বোধ হয় অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সেটা কি জানেন?—এই গান করা। যিনি একটু আদটুকু গাহিতে জানেন, তিনি না হয় গান করিলেন, তাহা একপ্রকার সহিয়া থাকা যায়; কিন্তু যাঁহার কণ্ঠের রবের সহিত চতুষ্পদ জীব বিশেষের মধুর নিনাদের তুলনা অনুচিত হয় না, তিনিও রেলের গাড়ীতে চড়িলে একবার তান ছাড়িয়া নিরীহ লোকদিগকেও বিরক্ত করিয়া তুলেন। আমাদের সহযাত্রী নবাগত বাবুদের মধ্যে এইপ্রকার, সুগায়ক একজন ছিলেন। তিনি সেই শেষরাত্রে কোকিলকণ্ঠে গান জুড়িয়া দিলেন;—তাঁর না আছে সুর, না আছে কিছু। তাঁহার একজন সঙ্গী আবার এমন গানটী বৃথা যাইতেছে দেখিয়া, গাড়ীর দেওয়ালকে বাদ্যযন্ত্ররূপে পরিণত করিয়া তুমুল বাজনা জুড়িয়া দিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী বলিয়া গদির উপর বোল তুলিতে পারিলেন না। শ্রীমান গায়ক মহাশয় যদি ভাল গান গাইতেন, তাহা হইলেও না হয় তাঁহার এই আক্রমণ ও অত্যাচার সহ্য করা যাইত; কিন্তু তিনি একেবারে খাস কৃষ্ণনগরের আমদানী পচা সব পুরিয়ার গান জুড়িয়া দিলেন; যেমন তার ভাব, তেমনি তার রচনা-কৌশল।

এ সকল অত্যাচার আমার অনেক সহিয়াছে; কিন্তু সঙ্গী বন্ধু মহাশয় ত একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন এবং আমাকে অনুযোগ করিতে লাগিলেন। আমার অপরাধ এই যে, আমি এসব কথা পূর্ব্বে তাঁহাকে বলিলে, তিনি একটা কামরা রিজার্ভই করিতেন। আমি এ অনুযোগের আর কি জবাব দিব, তিনি যে এতটুকুও সহিতে পারিবেন না, তাহা ত আমি জানিতাম না। আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় এমন সঙ্গী কখনও ত জোটে নাই; সুতরাং বন্ধুবরের অভিযোগ নীরবে সহ্য করা ব্যতীত আমার উপায়ান্তর ছিল না।

একটী গান শেষ করিয়া কিন্নরপ্রবর যখন আর একটী গানের রাগিণী আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন, আমি তখন তাঁহারা কতদূরে যাইবেন, জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহারা বলিলেন, বেশী দূরে নয়, এই পোড়াদহে। তাঁহারা রেলে চাকুরী করেন; পোড়াদহে নামিয়া উত্তরবঙ্গের গাড়ীতে যাইবেন। আমি তখন চুপে চুপে বন্ধুকে বলিলাম যে, বাবু কয়টাকে এই সুমুখের ষ্টেসনেই নামাইয়া দিতে পারিব; পোড়াদহ পর্য্যন্তও তাঁহাদিগকে যাইতে হইবে না। বন্ধু আমাকে জেরা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, আমি তাঁহাকে তখন বাক্যব্যয় করিতে নিষেধ করিলাম। আমি বাবু কয়টীর আকার প্রকার ব্যবহার দেখিয়াই বুঝিলাম যে, তাঁহারা রেলে চাকুরী করিলেও হয় টিকিট বাবু, কি তারের বাবুগিরি করেন; তাহার উপর পদের রেলের বাবু হইলে তাঁহারা অনেকটা সভ্য হন; ঐ তিনটী বাবু নিতান্তই "রেলের বাবু।" আমি তখন বাবুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়দের রেলের মধ্যে কি কাজ করা হয়?" একজন একটু ইংরেজী হিসাবে বলিলেন, "আমরা ষ্টেশন ষ্টাফ" আমি তখন বলিলাম, "মহাশয়দের কি সেকেণ্ডক্লাসের পাশ আছে?" যে বাবুটী আমার কথার জবাব দিয়াছিলেন, তিনি একটু চড়িয়া বলিলেন, "সে খবর আপনার কেন? চুপ করিয়া বসিয়া থাকুন" আর সেই সঙ্গের একটা ইংরেজী প্রবাদ বচনের মধ্যে ষোল আনা ভুল করিয়া আওড়াইয়া দিলেন; তাহার অর্থ এই যে, আমি আমার নিজের যন্ত্রে তৈল প্রদান করি। আমি ধীরে ধীরে বলিলাম, "মহাশয়েরা ক্ষমা করিবেন, এই সম্মুখের চুয়াডাঙ্গা ষ্টেশনে যদি নামিয়া না যান, তাহা হইলে আমি আপনাদিগকে

অগত্যা পুলিসের জিম্মা করিয়া দিব। আপনারা যদি ছুটীতে থাকেন, তাহা হইলে আপনাদের তৃতীয় শ্রেণীর উপর পাশ নাই, আর যদি সরকারী কার্য্যে যান, তবে মধ্যম শ্রেণীর পাশ; দ্বিতীয় শ্রেণীর পাশ আপনাদের নিশ্চয়ই নাই।" বাবু তিনটী আর কথা বলিলেন না; চুপ করিয়া গেলেন। গাড়ীরও গতি মন্দ হইতে লাগিল। ক্রমে যখন গাড়ী চুয়াডাঙ্গার ষ্টেশনের নিকট আসিল, তখন আমি বলিলাম, "মহাশয়েরা কিছু মনে করিবেন না, আমি গার্ড সাহেবকে এখনই ডাকিয়া আনিতেছি।" তখন সেই বাবুত্রয়ের মধ্যে যিনি গান বাজনা কিছুতেই ছিলেন না, তিনি বলিলেন, "মহাশয়! এত গোলমাল কেন; তাড়াতাড়িতে এই গাড়ীতে উঠিয়া পড়িয়াছিলাম; আমরা এখানেই নামিয়া অন্য গাড়ীতে যাইব।" আমি আর কথা বলিলাম না। ষ্টেশনে গাড়ী লাগিল, বাবু তিনটী নামিয়া গেলেন। আমার সঙ্গী একটু সোয়াস্তি বোধ করিলেন। বাবুদের এইপ্রকার দুর্গতি দেখিয়া ঢাকাগামিনী রমণী ত হাসিয়া অস্থির। তাহার হাসি দেখিয়া বন্ধু বড়ই চটিয়া গেলেন এবং ধীরে ধীরে আমাকে বলিলেন, "মহাশয়! এর চাইতে বাবুদের গান যে ছিল ভাল" আমি দেখিলাম, এমন সঙ্গী লইয়া পথচলা এক বিষম বিড়ম্বনা। কিন্তু সেকথা আর মুখ ফুটিয়া বলিলাম না। অবশিষ্ট রাত্রিটুকুতে আর বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল না। প্রত্যূষে আমরা গোয়ালন্দে উপস্থিত হইলাম।

এতক্ষণও বলা হয় নাই, আমরা কি মাসে দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলাম। আশ্বিন মাস, পূজা শেষ হইয়া গিয়াছে। আমরা যেবার এই ভ্রমণে গিয়াছিলাম, সেবার পূর্ব্বাঞ্চলে ভয়ানক বর্ষা হইয়াছিল। আমরা গোয়ালন্দে নামিয়া তাড়াতাড়ি ষ্টীমারে উঠিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম। বন্ধুবর তখনও ভাল করিয়া চারিদিক দেখিতে পান নাই, কারণ ভোর হইলেও সে সময়ে একটু আঁধার ছিল। আমরা দুইজন ও ভৃত্যটী ষ্টীমারে উঠিলাম।

ষ্টীমারের উপরে গিয়া বন্ধু নদীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখেন ভয়ানক ব্যাপার! নদীর অপর পার দেখিতে পাওয়া যায় না; অকূল জলরাশি গর্জ্জন করিতে করিতে, লাফাইতে লাফাইতে চলিয়াছে। ষ্টীমারখানি

এক একবার কাঁপিয়া উঠিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া বন্ধুবর একেবারে ভয়ে আড়ষ্ট! এমন ভয়ানক নদীর মধ্যে ষ্টীমারে চড়িয়া যাইতে হইবে।—তাঁহার মুখে আর কথা নাই, তিনি একেবারে ভয়ে অসাড় হইয়া গেলেন। একটু পরেই প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "মহাশয়! আমার আর আজ যাওয়া হইবে না; জান—কবুল, এমন ভয়ানক নদীর ভিতরে আপনি ষ্টীমারই বলুন, আর যাই বলুন, আমি কোন প্রকারেই যাইতেছি না। রামকৃষ্ণ, জিনিস পত্র নামাও। বন্ধুবরের ভীতিবিহ্বল মুখ দেখিয়া আমি ত একেবারে অবাক্ হইয়া গেলাম; কি বলিব, কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। আমাকে এইপ্রকার অবস্থায় দেখিয়া বন্ধু বলিলেন, "আর না মশাই চলুন দেশে ফিরিয়া যাই। এরূপ নদীর মধ্যে আমি প্রাণ থাকিতে যাইতে পারিব না।"

যে কথা সেই কাজ; বন্ধুমহাশয় একেবারে তাড়াতাড়ি নামিয়া ডাঙ্গায় গিয়া হাজির!—তাঁহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল, যেন তিনি আসন্ন-মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। রামকৃষ্ণ কিন্তু তখনও নামে নাই। আমিও নামি নাই। রামকৃষ্ণ আমার মুখের দিকে চাহিল। আমি বলিলাম, "রামা! তুই একটু অপেক্ষা কর, আমি দেখি যদি তোর বাবুর ভয় ভাঙ্গিতে পারি।" আমি তখন জাহাজ হইতে নামিয়া বন্ধুর নিকটে গেলাম; তাঁহাকে অনেক বুঝাইলাম; কিন্তু বিশাল পদ্মার দিকে তিনি এক একবার চাহেন, আর তাঁহার বুক দুড়দুড় করিয়া উঠে। তিনি আমার সাহসবাক্যে কর্ণ-পাতও করিলেন না, তখন অনন্যোপায় হইয়া রামকৃষ্ণকে জিনিসপত্র নামাইতে বলিলাম। কুলীদিগের সাহায্যে দ্রব্যাদি আবার তীরে আনীত হইল।

বন্ধু ফেরত গাড়ীতেই কলিকাতায় আসিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এবার আমি একটু দৃঢ়তার সহিত বলিলাম, "ষ্টীমারেই না গেলেন; এবেলা গোয়ালন্দে থাকিলে আর পদ্মা নদী খাইয়া ফেলিবে না? এই সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া আসা গেল; আবার সমস্ত দিন গাড়ীতে যাওয়া। আমার দ্বারা [illegible] কর্ম্ম হইবে না।"—আমার এই কথা শুনিয়া বন্ধুবর সেবেলা গোয়ালন্দে থাকিতে সম্মত হইলেন। ঢাকাগামী ষ্টীমার, আসাম ষ্টীমার, কাছার ষ্টীমার ধূম উদ্গীরণ করিয়া তরঙ্গের উপর নাচিতে নাচিতে চলিয়া গেল। আমরা তিনটী জীব তীরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। ষ্টীমার

চলিয়া গেলে মুটে ডাকিয়া সেই প্রকাণ্ডকায় লগেজ, বাক্স প্রভৃতি লইয়া আমার এক বাল্যবন্ধুর প্রবাসগৃহে অতিথি হইলাম। তিনি আমাদিগকে পাইয়া পরম আনন্দিত হইলেন। আমরা ঢাকায় যাইব বলিয়াই আসিয়াছিলাম, কিন্তু বন্ধুর আর ঢাকা যাওয়া হইল না, তাই আমরা কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতেছি। কেন যাওয়া হইল না, সে কথাটী বলিয়া বন্ধুকে নিতান্ত ক্ষীণজীবী, দুর্ব্বল বাঙ্গালী বলিয়া পরিচিত করিয়া লজ্জা দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করিলাম না। সমস্ত দিন গোয়ালন্দে অতিবাহিত করিলাম। আমার জীবনের কয়েকটী সুখের বৎসর এই গোয়ালন্দের পদ্মাতীরে অতিবাহিত হইয়াছিল। আমরা যে গোয়ালন্দে ছিলাম, যদিও তাহার চিহ্নমাত্রও নাই; তবুও স্থানের নামটী মনে হইলেই কত সুখের কথা, কত আনন্দের ছবি মনে পড়িয়া যায়।

সে কথা থাকুক, রাত্রের মেলট্রেণে আরোহী হইয়া বন্ধুকে লইয়া কলিকাতায় পৌছিলাম—এবং একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়াটীয়া গাড়ী করিয়া তাঁহাকে তাঁহার গৃহদ্বারে পৌছাইয়া দিলাম। পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণ করিয়া কত নোট সংগ্রহ করিবেন, সে সকল সুবিন্যস্ত করিয়া সুন্দর একখানি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিবেন, এই প্রকার নানা কল্পনা তাঁহার মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ফিরিয়া আসিবার পর আমি অনেকবার তাঁহাকে এই গোয়ালন্দ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছি, কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হন নাই। আজ এতদিন পরে তাঁহার দেশ-ভ্রমণ-কাহিনী লিখিয়া আমি তাঁহার আরব্ধ-কার্য্য শেষ করিয়া দিলাম।

শ্রীজলধর সেন।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের কথা।

সুশিক্ষিত সাহিত্যসেবিগণের আজকাল বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রতি কথঞ্চিৎ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে; ইহা শুভজনক সংশয় নাই। এই উদ্যমে অনেক প্রাচীন বিলুপ্তপ্রায় গ্রন্থ প্রচারিত হইতেছে, অনেক প্রাচীন কথার আলোচনা ও মীমাংসা হইতেছে; এ সকলই উত্তম।—অনেক প্রাচীন গ্রন্থেই রচনাদির

তারিখ প্রভৃতি পাওয়া যায় না, সূক্ষ্মদর্শী বিজ্ঞ সমালোচকের গবেষণায় ঐরূপ স্থলেও গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের সময় নির্দ্দেশও হইয়া থাকে। সর্ব্বত্র তাহা ভ্রান্তি-বিরহিত না হইলেও এরূপ চেষ্টা উত্তম; কিন্তু স্বসিদ্ধান্তে অন্ধ অত্যানুরক্তি কোনস্থলেই প্রশংসনীয় নহে।

প্রাচীন বৈষ্ণবসাহিত্যে ভয়ানক জাল জুয়াচুরী বিদ্যমান; আমরা যে অল্প দুই চারিখানি বৈষ্ণবগ্রন্থ দেখিয়াছি, তাহাতেই ঐরূপ ধারণা জন্মিয়াছে। এরূপ গ্রন্থ-প্রচারকের চাতুর্য্য সামান্য নহে। যাঁহাদের বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রবেশ নাই, বৈষ্ণবধর্ম্মের সিদ্ধান্তে অভিজ্ঞতা নাই, তাঁহারা অনেকস্থলেই প্রতারিত হইয়া থাকেন। বৈষ্ণবধর্ম্মের নাম করিয়া অনর্থস্বরূপ যে সকল উপধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, ঐ সকল গ্রন্থ অধিকাংশই তাঁহাদের রচিত ও প্রচারিত।

ঐ সকল উপধর্ম্মের মতে ও বৈষ্ণবীয় বিশুদ্ধ রসতত্ত্বে বাক্যভেদ অধিক নাই; ভাবভেদ ক্রমে রসতত্ত্ব সর্ব্বোত্তম ও বৈষ্ণবনামের পতাকাধারী উপধর্ম্মগুলি সর্ব্বাধম হইয়াছে। রসতত্ত্ব সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত, তাহাতে জড়দেহের স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধ নাই; উপধর্ম্মের সমস্তই তদ্বিপরীত বলিয়া হেয়। সুতরাং বৈষ্ণবধর্ম্ম-মর্ম্মানবিজ্ঞ ব্যক্তি শিক্ষিত হইলেও ঐ সকল অস্পৃশ্য অবৈষ্ণব গ্রন্থকে বৈষ্ণব-গ্রন্থকার-বিরচিত মৌলিক গ্রন্থ ভাবিয়া প্রতারিত হন।

ঐ সকল গ্রন্থ প্রায়শঃ কোন প্রসিদ্ধনামা বৈষ্ণব-গ্রন্থকারের নামে প্রচারিত হইয়াছে দেখা যায়। আমাদের এই কৃষ্ণদাস কবিরাজের উপরই প্রবঞ্চকগণের বেশী ঝোঁক ছিল বলিয়া বোধ হয়। ইহার নামে যতখানি জালগ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে, অপর কোনও প্রাচীন গ্রন্থকারের নামে তত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ইহার কারণ, কৃষ্ণদাসের চৈতন্যচরিতামৃত ও গোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থ বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ আদরণীয় হইয়াছে এবং গ্রন্থকার সকল শ্রেণী বৈষ্ণবের শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার নামে তাঁহাদের অপসিদ্ধান্ত সহজেই লোকসমাজে প্রচারিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা দৃষ্টে, তাঁহারা সে সুবিধা সাদরে গ্রহণ করিয়াছে। কেবল কৃষ্ণদাস নহেন, কবি বৃন্দাবন দাস, স্বরূপ ও বীরভদ্র গোস্বামী, নরোত্তম দাস, লোচন, ঘনশ্যাম প্রভৃতি বহুতর প্রাচীন মহাজনের নামে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ ও পদ প্রচারিত হইয়াছে।

"সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকাতে" মধ্যে মধ্যে প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থের বিবরণ প্রকাশিত হইয়া থাকে; যে সকল গ্রন্থ সাহিত্যিক প্রবঞ্চকের প্রচারিত জাল, বিবরণের সম্পাদকীয় মন্তব্যে তাহার নির্দ্দেশ থাকা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করি। "আত্মনিরূপণ" প্রভৃতি বহুতর সাহজিক গ্রন্থ কৃষ্ণদাসের নামে প্রচারিত; চরিতামৃতের আদর্শে ইহাতে "শ্রীরূপ রঘুনাথপদে যাঁর আশ," ইত্যাদি বাক্যে ভণিতি সংযোজিতও হইয়াছে!

ঐ সকল গ্রন্থের কোন কোন খানি নিতান্ত আধুনিকও নহে, রচনা প্রভৃতি দৃষ্টে জাল ধরিবার বিশেষ সুবিধা নাই। অতএব বৈষ্ণবতত্ত্বানবিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। বহুকালের হস্তলিখিত নূতন গ্রন্থ পাইলেই, প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের নাম দেখিলেই তাঁহারা হঠাৎ সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলেন। এ কথা অনুমানমূলক নহে, বর্ত্তমান সাহিত্যক্ষেত্রে কোন কোন সুপরিচিত বিজ্ঞজনকেও এরূপ ভ্রমে পতিত হইতে দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি। কিন্তু সত্যের জয় চিরদিন। কথিত আছে, কোকিল ও কাক-শাবক একত্রে প্রতিপোষিত হইলেও, নববসন্ত-সমাগমে উভয়ের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়; বৈষ্ণবধর্ম্মমর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি ঐ সকল অপকৃষ্ট গ্রন্থরাশি হইতে সহজেই সদ্‌গ্রন্থ বাছিয়া লইতে পারেন।

সে যাক, কবিরাজ কৃষ্ণদাসের চরিতামৃত-রচনা ও তাঁহার দেহত্যাগের কাল-নির্ণয়সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত মত চলিয়া আসিতেছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

"ভক্তদিগ্‌দর্শিনী" নামে একখানি তালিকা আছে, ঐ তালিকানুসারে কৃষ্ণদাসের জন্ম ১৪১৮ শকে হয়। কৃষ্ণদাস একজন ভক্তশ্রেষ্ঠ, কিন্তু ১৪১৮ শকে তাঁহার জন্ম হইয়া থাকিলেও তিনি শ্রীমহাপ্রভুকে দর্শন করেন নাই। কৃষ্ণদাস বৈদ্যবংশে নৈহাটীর সন্নিকট ঝামটপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, "আনন্দ-রত্নাবলী" নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থে লিখিত আছে, অল্পবয়সেই কৃষ্ণদাসের পিতা মাতার মৃত্যু হয়; তাঁহার পিতৃস্বসা, কৃষ্ণদাস ও তৎকনিষ্ঠ শ্যামদাসকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া প্রতিপালন করেন। সেইস্থানেই কৃষ্ণ-দাসের যে কিছু বিদ্যাশিক্ষা। কৃষ্ণদাসের শিক্ষা ভালরূপই হইয়াছিল, তিনি রীতিমত দর্শনাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বলিয়াই অনুমিত হয়। বৈষ্ণব

পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিলেও এইজন্যই বোধ হয়, তত অল্পবয়সে ভক্তিরাজ্যে ভ্রমণ করিতে পারেন নাই; এইজন্যই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ দর্শন বোধ হয় তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। যে আকস্মিক ঘটনাসূত্র কৃষ্ণদাসকে সংসারের বাহিরে লইয়া গিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে তিনিই লিখিয়াছেন। একদা নিত্যানন্দ-ভৃত্য মীনকেতন রামদাস, কৃষ্ণদাসগৃহে উপস্থিত হইয়া কোন কারণে শ্যামদাসের উপরে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হন; কৃষ্ণদাস যথার্থই শ্যামদাসের অপরাধ দৃষ্টে ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহাকে ভৎর্সনা করেন। তৎপরে—

"ভাইকে ভৎর্সিনু মুঞি লঞা এই গুণ।
সেই রাত্রে প্রভু (নিত্যানন্দ) মোরে দিলা দরশন॥
নৈহাটী নিকটে ঝামটপুর গ্রাম।
তাহা স্বপ্নে দেখা দিল নিত্যানন্দ রাম॥
দণ্ডবৎ হৈয়া আমি পড়িনু পায়েতে।
নিজ পাদপদ্ম প্রভু দিলা মোর মাথে॥
* * * *
আনন্দে বিহ্বল আমি কিছুই না জানি।
তবে হাসি প্রভু মোরে বলিলেন বাণী॥
আরে আরে কৃষ্ণদাস! না কর তু ভয়।
বৃন্দাবনে যাহ তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয়॥
* * * *
স্বপ্নভঙ্গ হৈল, দেখো হঞাছে প্রভাতে।
* * * *
সেইক্ষণে বৃন্দাবনে করিনু গমন।
প্রভুর কৃপাতে সুখে আইনু বৃন্দাবন॥"

(চৈতন্য চরিতামৃত)

এই ঘটনাটী ১৪৫৫ শকের পরে সংঘটিত হয়। কৃষ্ণদাস তখন একজন সুপরিচিত ভক্ত; তাঁহার বাড়ীতে তখন মীনকেতন প্রভৃতি মহাত্মাগণের গমনাগমন ঘটে। শ্রীমহাপ্রভু প্রকট থাকিলে, বৃন্দাবন যাইবার পূর্ব্বে কৃষ্ণদাস অবশ্যই নীলাচল হইয়া যাইতেন। কৃষ্ণদাস শ্রীমহাপ্রভুর

দর্শন না পাইলেও অদ্বৈতাচার্য্য ও নিত্যানন্দপ্রভুকে দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু কৃষ্ণদাসের দীক্ষাগুরু ছিলেন। চরিতামৃতের—

"নিত্যানন্দ রায়, প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ।
তাঁর পাদপদ্ম বন্দো, মুই যাঁর দাস॥"

এবং

"যদ্যপি আমার প্রভু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি, তাঁহার প্রকাশ॥"

——এ দুইটী কথাই তাহার প্রমাণ। প্রসিদ্ধ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ইহার টীকাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, যথা—"নিত্যানন্দ রায় প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ ইত্যাদিনা যদ্যপি ইত্যাদিনাচ গুরুপদে নাত্র নিত্যানন্দ প্রভুরেবতি ব্যঞ্জিতং॥"

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া, প্রথমেই রাধাকুণ্ডে গমন করেন। রাধাকুণ্ডে রঘুনাথ দাসগোস্বামী বাস করিতেন, কবিরাজ তাঁহার সঙ্গসুখ ত্যাগ করিতে না পারিয়া, রাধাকুণ্ডে তাঁহারই আশ্রয়ে অবস্থিতি করেন। যথা—

"কবিরাজ শিষ্য, রহিলেন তাঁর কাছে।"

(প্রেমবিলাস)

প্রেমবিলাসের এই "শিষ্য" কথার উপর নির্ভর করিয়া, কেহ কেহ কৃষ্ণদাসকে দাসগোস্বামীর শিষ্য বলেন; বস্তুতঃ তাহা নহে, শিক্ষাগুরু বলিয়া কৃষ্ণদাস, রঘুনাথের নিকট শিষ্যবৎ অবস্থিতি করিতেন। যা'হোক, উক্ত প্রেমবিলাসেই ইহার মীমাংসা পাওয়া যায়। যথা—

"নিজ গ্রন্থে লিখে, প্রভুর শিষ্য আপনাকে।

* * * *

পুনর্ব্বার বৃন্দাবনে করিল গমন।
আশ্রয় করিল রঘুনাথের চরণ॥
কেন হেন লিখে? কেন করয়ে আশ্রয়?
সেই বুঝে—যার মহা অনুভব হয়॥
সিদ্ধ ব্যবহার এই অত্যন্ত নির্ম্মল।
ভাবাশ্রয় করিলে স্ফূর্ত্তি হয় যে সকল॥"

সে যাহা হউক, চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থই কৃষ্ণদাসের পাণ্ডিত্যের নিদর্শন। বঙ্গভাষা তখন শিশু হইলেও কবিরাজের প্রতিভাবলে তখনই সূক্ষ্ম দার্শনিকতত্ত্ব তাহাতে লিখিত হইয়া সংস্কৃতপ্লাবিত দেশে বাঙ্গালাভাষার জয়ঘোষণা করিয়াছিল। চৈতন্যচরিতামৃত কখন রচিত হয়? মুদ্রিত চরিতামৃত গুলিতে গ্রন্থরচনার তারিখ ১৫৩৫ শক বলিয়া লিখিত; কিন্তু ঐ তারিখটী সত্যসম্মত বলিয়া বোধ হয় না।

শ্রীরূপ-সনাতন-প্রমুখ গোস্বামিগণ কর্ত্তৃক বৃন্দাবনে বিবিধ বৈষ্ণবগ্রন্থ বিরচিত হয়। শ্রীনিবাসাচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ বঙ্গদেশে ঐ সকল গ্রন্থ-প্রচারের ভারপ্রাপ্ত হন। তাঁহারা গ্রন্থসমূহ লইয়া বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে আগমন করেন, বিষ্ণুপুরে গ্রন্থগুলি লুণ্ঠিত হয়। এ ঘটনা ১৫০৪।৫ শকাব্দার মধ্যে কোন এক সময়ে ঘটে। বৈষ্ণবগ্রন্থ-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই ঘটনা হইতেই বিষ্ণুপুরের রাজার ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়; এবং তিনি শ্যামচান্দ প্রভৃতি বিগ্রহ স্থাপন করেন। বিষ্ণুপুর-রাজ ঐ সময় যে সকল মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার খোদিত প্রস্তরফলকে ১৫০৭ এবং ততোধিক শক সংখ্যা দৃষ্ট হয়। গ্রন্থ চুরী ইহার পূর্ব্বকার ঘটনা। যে সকল গ্রন্থ অপহৃত হয়, তন্মধ্যে "চৈতন্যচরিতামৃত" ছিল। এতৎপ্রমাণে চরিতামৃতের রচনাকাল কখনই ১৫৩৫ শকাব্দ হইতে পারে না। "গৌড়ে ব্রাহ্মণ"-প্রণেতা বিশেষ বিবেচনার সহিত অনুমান করেন যে, ১৫০৫ শকের মধ্যে চরিতামৃত রচিত হয়। বিষ্ণুপুর রাজবাটীতে শ্রীনিবাস শিষ্য ব্যাসাচার্য্য-লিখিত একখানি প্রাচীন পুঁথি আছে, তাহার শেষে এই শ্লোকটী পাওয়া যায়। যথা—

"শাকাগ্নি বিন্দুবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠবৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যোঽসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥"

এতদ্দ্বারা ১৫০৩ শকাব্দই চরিতামৃতের রচনাকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

চরিতামৃত রচনার পর কৃষ্ণদাস বড় অধিককাল জীবিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। কবিরাজের মৃত্যুসম্বন্ধেও একটা ভ্রান্ত মত প্রচলিত রহিয়াছে। দুইখানি প্রসিদ্ধ বাঙ্গালাগ্রন্থের গ্রন্থকারদিগকেও এ ভ্রান্তি কিঞ্চিৎ

স্পর্শ করিয়াছে; প্রেমবিলাস হইতেই এ ভ্রমের উৎপত্তি। প্রেমবিলাসে লিখিত আছে যে, গ্রন্থচুরীর সংবাদ বৃন্দাবনে পৌছিলে, বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস যখন শুনিতে পাইলেন, তাঁহার বৃদ্ধকালের বহুযত্নের ধনও অপহৃত হইয়াছে, তখন দুঃখে ক্ষোভে সেই অন্ধপ্রায় ভক্ত কবি রাধাকুণ্ডে ঝাপ দিয়া পড়েন। যথা প্রেমবিলাসে :—

"রঘুনাথ কবিরাজ শুনি দুইজনে।
কান্দিয়া কান্দিয়া পড়ে লোটাইয়া ভূমে ॥
কবিরাজ কহে প্রভু না বুঝি কারণ।
কি করিল কিবা হৈল ভাবে মনে মন ॥
জরাকালে কবিরাজ না পারে চলিতে।
অন্তর্দ্ধান কৈল সেই দুঃখের সহিতে ॥
কুণ্ডতীরে বসি সদা করে অনুতাপ।
উছলি পড়িল গোসাঞি দিয়া এক ঝাপ ॥"

এ ঘটনা গ্রন্থচুরীর পরেই ঘটে, সুতরাং ১৫০৪ শকেই কবিরাজের মৃত্যু ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণদাস ঐ সময় মৃত্যুমুখে পতিত হন নাই; তিনি গ্রন্থপ্রাপ্তির সংবাদও পরে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গ্রন্থান্তরে তাহার প্রমাণ আছে।

রাজসাহীর অন্তর্গত খেতরীতে নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় এক মহোৎসব করেন। শ্রীমহাপ্রভুর সময়ের অব্যবহিত পরে, বৈষ্ণবসমাজে ঐ মহোৎসব এক অতি প্রধান ঘটনা। ইহা গ্রন্থচুরীর কয়েক বৎসর মাত্র পরে হয়; তখন শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রভৃতি বৈষ্ণবজগতে বিখ্যাতনামা পুরুষ। এই উৎসবেরও পরে শ্রীমন্নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবাদেবী বৃন্দাবনে গমন করেন, তখনও কবিরাজ জীবিত ছিলেন, দেবীর সহিত তাঁহার সম্মিলন হয়।
যথা ভক্তিরত্নাকরে—

"শ্রীদাস গোস্বামী সে নির্জ্জন কুণ্ডতীরে।
করেন শ্রীনাম গ্রহণাদি ধীরে ধীরে ॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ অগ্রেতে আসিয়া।
দাস গোস্বামীর আগে ছিলা দাঁড়াইয়া ॥

অবসর পাইয়া করেন নিবেদন।
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরীর হৈল আগমন ॥" ইত্যাদি।

ইহারও পরে নিত্যানন্দাত্মজ বীরচন্দ্র গোস্বামী বৃন্দাবন গমন করেন, তখনও কবিরাজকে তিনি প্রাপ্ত হন; কিন্তু তখন দাসগোস্বামী ছিলেন না। ভক্তিরত্নাকরে একথারও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। (ঐ গ্রন্থের ত্রয়োদশ তরঙ্গ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীরূপাদি গোস্বামিগণের অন্তর্দ্ধানে কৃষ্ণদাস সংস্কৃতে শোকসূচক কবিতা লিখেন। আমরা বহুচেষ্টায় শ্রীরূপের 'শোচক' প্রাপ্ত হইয়াছি; কৃষ্ণদাস কৃত গোপালভট্ট 'শোচক' অনেকেই জানেন। কর্ণানন্দ গ্রন্থপাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, দাসগোস্বামীর অন্তর্দ্ধানের পর কৃষ্ণদাস তাঁহার 'শোচক' রচনা করিয়াছিলেন। প্রেমবিলাসে লিখিত আছে যে, কৃষ্ণদাস দাসগোস্বামীর অগ্রে পরলোক গমন করেন; কর্ণানন্দ, কৃষ্ণদাস কৃত রঘুনাথ 'শোচকের' উল্লেখ করিয়া প্রকৃতপক্ষে প্রেমবিলাসের প্রতিবাদ করিয়াছেন। যথা কর্ণানন্দে—

"গ্রন্থের চুরীর কথা তিঁহো যে শুনিয়া।
উছলি পড়িলা যাই কুণ্ডেই যাইয়া॥
বড়ই বিরক্ত চিত্ত ধৈর্য্য নাহি রয়।
হায় হায় হেন দুঃখ সহন না যায়॥
শ্রীদাসগোস্বামী আগে দেহত্যাগ কৈল।
ইহা শুনি চিত্তে মোর সন্দেহ জন্মিল॥
শ্রীল কবিরাজ গোসাঞি লিখিলা সূচকে।
একে একে তাহা আমি লিখিনু প্রত্যেকে॥
"ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ দাসঃ" এইত লিখন।
বড়ই সন্দেহ, পদে কৈল নিবেদন॥
রঘুনাথ অপ্রকট কবিরাজ আগে।
সূচকেতে এই কথা লিখিল মহাভাগে॥" ইত্যাদি।

কর্ণানন্দকার পদকর্ত্তা যদুনন্দন দাসের এ সন্দেহ অনুপযুক্ত হয় নাই। তিনি এ সন্দেহ না করিলে কৃষ্ণদাসের মৃত্যু অমীমাংসিত থাকিয়া যাইত। যাহা হউক, গ্রন্থকারের সন্দেহ দূর হইয়াছিল। কৃষ্ণদাস অসহনীয় দুঃখে

রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তখনই তাঁহার দেহত্যাগ ঘটে নাই; রঘুনাথ দাস তাঁহাকে মূর্চ্ছিতাবস্থায় উত্তোলন করিয়াছিলেন, তৎপর তিনি জীবনপ্রাপ্ত হন। কর্ণানন্দ বলেন :—

"পুনঃ কবিরাজ দেহে হইল চেতন।" ইত্যাদি।

অতএব, ১৫০৪ শকাব্দাই কৃষ্ণদাসের মৃত্যু-শক নহে; ইহা নিশ্চয়। কৃষ্ণদাস একজন দীর্ঘজীবী পুরুষ ছিলেন, তাহা সহজেই অনুমিত হয়।

লেখকের অসুস্থাবস্থায় লিখিত বলিয়া প্রবন্ধে বিবিধ অসঙ্গতি দোষ থাকিল, পাঠক মহাশয়ের নিকট তজ্জন্য বোধ হয়, ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারেন।

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি।

কলা-লক্ষ্মী

চিরদিন তুমি জাগ্রত স্থির যৌবনে,
অক্ষয় লাবণ্যে বিরাজ মর্ত্ত্যভুবনে,
গগনে গগনে কীর্ত্তি বহে পবনে,
ওগো সুরেন্দ্র-সেবিতা!

মানস-যৌবরাজ্যে তুমি ঈশ্বরী,
প্রতাপে প্রভাবে উছলি উঠ, সুন্দরি,
অমৃত-উৎসে দিকে দিকে যায় সন্তরি
শত চিত্র কবিতা।

অলিখিত মহাগ্রন্থে তুমি নিত্য-নায়িকা;
কোটি প্রেমিক ভবে,—তুমি বিশ্ব-প্রেমিকা!
শত শত কণ্ঠে পরাইছ গন্ধ-মালিকা,
জয় তব জয় হে!

কল কল শ্লোকে কবিকুল করে সাধনা,
শিল্পী দেয় পদে আপনার হৃদি-রচনা,
নিত্য সেবার তরে তবু নব-বাসনা
কাঁদে তব বিরহে

এস বঙ্গে নভ-অঙ্গন পথ রঞ্জিয়া,
অযুত কর্ণে অকথিত বাণী গুঞ্জিয়া,
চিত্ত-ফলকে চরণযুগ অঙ্কিয়া,
এস এস, প্রেয়সি!

সুধা সিঞ্চনে জাগিবে মৃত কল্পনা,
উঠিবে বাজিয়া চৌদিকে জয়-ঝঞ্ঝনা;
ভক্তকুলের তৃষিত মনোবেদনা
যাবে, অয়ি মানসি!

যদি সাধ,—এস গো গোপন পথ বাহিয়া,
ললিত নৃত্যে হৃদয়-গগন প্লাবিয়া,
নিথর নীরদে তড়িত-ছটা হানিয়া,
এস মৌন-গৌরবে;

লহ বন্ধন, ওগো বিচিত্রা অভিসারিকা,
সাজাও স্বহস্তে বঙ্গের চিত্র-শালিকা,
কবিকুঞ্জে আন নব শুক সারিকা,
তব গীতি-সৌরভে।

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

পৌরাণিক গল্প।

পূর্ব্বকালে কাঞ্চীনগরে চোল নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। মহারাজ চোলের নামানুসারে তদীয় রাজ্য, চোলরাজ্য নাম ধারণ করিয়াছিল। তাঁহার রাজ্যে কোন ব্যক্তি রুগ্ন, দরিদ্র বা পাপিষ্ঠ ছিল না। সকলেই বেদোদিত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিত। মহারাজ চোল, নিরন্তর যজ্ঞকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। চোলরাজ্যের অন্তর্ব্বর্ত্তিনী তাম্রপর্ণী নদীর উভয়তট শোভাময় সুবর্ণযূপে অলঙ্কৃত হইয়া চৈত্ররথোদ্যানের শোভা ধারণ করিয়াছিল। চোলরাজ্যের অন্তঃপাতী অনন্তশয়ন নামক স্থানে যোগ-নিদ্রাশয়ান ভগবান রমাপতির এক মূর্ত্তি ছিল। রমাপতির আশীর্ব্বাদে চোল রাজ্যবাসিগণের আধিব্যাধির ভয় ছিল না। ভগবান্ তাহাদের যোগক্ষেম বহন করিতেন।

একদা মহারাজ চোল, স্বর্ণপুষ্প ও মণিমাণিক্যে ভগবানের পূজা করিয়া উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় কাঞ্চীনগরবাসী বিষ্ণুদাস নামক ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্রাহ্মণ, ভগবানের পূজার জন্য জল তুলসী হস্তে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ পুরুষসূক্ত দ্বারা ভগবন্মূর্ত্তির স্নানবিধি সমাপন করিয়া তুলসী মঞ্জরীদ্বারা ভগবানের পূজা করিলেন। রাজপ্রদত্ত রত্নরাজি তুলসীমঞ্জরী দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়াতে রাজার অন্তরে, ক্রোধের সঞ্চার হইল। রাজা সক্রোধে ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "বিষ্ণুদাস! কিরূপে বিষ্ণুপূজা করিতে হয়, তুমি তাহা জান না। আমার পূজায় ভগবানের যে শোভা হইয়াছিল, তাহা আচ্ছাদন করিয়া তুমি স্বকীয় নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ করিলে?" রাজার সাহঙ্কারবাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন, "মহারাজ! আপনি নৃপশ্রীতে অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়াছেন। কিরূপে বিষ্ণুভক্তি হয়, আপনি তাহা অবগত নহেন।" রাজা অবজ্ঞার হাস্য হাসিয়া বলিলেন, "দরিদ্রের অহঙ্কার শোভা পায় না। তুমি কখনও যজ্ঞ, দান বা দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা কর নাই। তোমার অহঙ্কার শোভা পায় না।" বিষ্ণুদাস ও রাজেন্দ্র চোলের এইরূপ তর্কবিতর্ক হইলে, চোল বলিলেন,

"বিষ্ণুদাস! তুমিও চেষ্টা কর, আমিও চেষ্টা করি। দেখি, কোন্ ব্যক্তিকে বিষ্ণু অগ্রে দর্শন দেন।" আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব এই প্রকারে নির্ণীত হইবে।

অনন্তর উভয়ে স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিলেন। মহারাজ চোল, বিষ্ণু সাক্ষাৎকার মানসে মুদ্গলকে আচার্য্য করিয়া বহুব্যয় ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। বিষ্ণুদাসের ধন-সম্পত্তি ছিল না, কিন্তু সকলের সার যে ভক্তি, তাহা ছিল। বিষ্ণুদাস অনন্তশয়নে বাস করিয়া আন্তরিক ভক্তির সহ ভগবানের আরাধনা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের ভক্তিতে ভগবান সন্তুষ্ট হইলেন।

এইরূপে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইল। এক দিবস, বিষ্ণুদাস নিত্যবিধি সমাপনান্তে অন্নপাক করিয়া বিশ্রাম করিলেন। বিশ্রামের পর বিষ্ণুকে নিবেদন করিতে যাইয়া দেখিলেন যে, পাকান্ন কে হরণ করিয়াছে। সেই সময়ে ভগবান সবিতা অস্তাচল-চূড়ায় আরোহণ করিলেন। ব্রাহ্মণ, সন্ধ্যা-সময়ের কর্ত্তব্যবিধির উল্লঙ্ঘনের ভয়ে সে দিবস আর পাক করিলেন না, উপবাসী রহিলেন। দ্বিতীয় দিবসেও পাক করিয়া পাকান্ন বিষ্ণুকে নিবেদন করিতে গিয়া পূর্ব্বদিবসের ন্যায় পাকান্ন অপহৃত হইয়াছে দেখিতে পাইলেন। ব্রাহ্মণ অনাহারে রহিলেন। তাঁহার সঙ্কল্প ছিল, বিষ্ণুকে নিবেদিত না করিয়া অন্ন ভোজন করিবেন না। এইরূপে সাত দিবস অতিবাহিত হইলে ব্রাহ্মণ মনে করিলেন, এ কর্ম্ম কে করে? আমাকে এস্থান হইতে তাড়াইতে কাহার অভিলাষ হইয়াছে? আমি প্রাণান্তেও এই ক্ষেত্র ত্যাগ করিব না, এইস্থান ত্যাগ করিলে আমার ভগবৎ-সন্নিধি পরিত্যাগ করিতে হয়। ব্রাহ্মণ এই ঘটনায় কারণানুসন্ধানের জন্য অষ্টম দিবসে, অন্নের অলক্ষিত স্থানে সতর্ক হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, এক ক্ষুৎক্ষাম দীনবদন অস্থিচর্ম্মা-বশিষ্ট-দেহ চণ্ডাল পাকান্ন হরণে উদ্যত হইয়াছে। দ্বিজবর্য্য অন্নহরণকারীকে দেখিতে পাইয়া কৃপাপরবশ হইয়া "তুমি কি জন্য এই রুক্ষ অন্ন ভোজন করিতেছ, আমি ঘৃত দিতেছি, তাহা দিয়া ভোজন কর। আহা! সাত দিন তুমি বড় কষ্ট পাইয়াছ"—বিপ্রকে এই কথা বলিতে বলিতে আসিতে দেখিয়া চণ্ডাল দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। পলায়নবেগে সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণ, মূর্চ্ছিত চণ্ডালের সমীপে গমন করিয়া মূর্চ্ছাপনোদনের জন্য বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা তাহাকে বীজন করিতে লাগিলেন। ভগবান নারায়ণ, ব্রাহ্মণের ভক্তি-

পরীক্ষার্থ চণ্ডালবেশ ধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া তিনি নিজমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন।

নিরাকার ব্রহ্ম, ভক্তের অভিলাষ পূরণের জন্য সাকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ও অহঙ্কার তাঁহার চতুর্ভুজ হইল। পঞ্চভূতাত্মা তাঁহার শঙ্খ, মনস্তত্ত্ব চক্র, ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব পদ্ম, আত্মাবিভাতত্ত্ব গদা, তাঁহার বাহুচতুষ্টয় শোভিত করিল। চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি ও বাক্যের তেজোময় সত্ত্বা ভগবানের বক্ষঃস্থলে কৌস্তভমণি হইল। ব্রাহ্মণ অতসীসঙ্কাশবর্ণ ভগবানকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। দেখিতে দেখিতে সেইস্থানে বৈকুণ্ঠ হইতে বিমান আনীত হইল। ভগবান, বিষ্ণুদাসকে বিমানে অধিরোপিত করিয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। বিষ্ণুদাসকে বিমানারূঢ় অবলোকন করিয়া, যজ্ঞদীক্ষিত চোলভূপতি পুরোহিত মুদ্গলকে বলিলেন, "ব্রহ্মন্! দেখুন দেখুন, বিষ্ণুদাস বিমানে আরোহণ করিয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতেছেন। আমি এই ব্রাহ্মণের প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়া বহ্বাড়ম্বরে বহুযজ্ঞ করিয়াছি। ব্রাহ্মণ কেবল ভক্তিবলে আমাকে পরাজিত করিয়াছেন। ভগবান্, কেবল আন্তরিক ভক্তির বশীভূত। তিনি যে "নিকড়িয়ার বন্ধু" তাহা অদ্য প্রত্যক্ষ করিলাম।"

মহারাজ চোলের অন্তরে দারুণ নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। রাজার পুত্রসন্তান ছিল না। তিনি ভাগিনেয়কে স্বকীয় নৃপাসনে অভিষিক্ত করিয়া যজ্ঞবাটে গমন করিলেন। রাজা হোমকুণ্ডের সমীপে গমন করিয়া, "হে ভগবন্ ভক্তি দেও!" এই বাক্য তিনবার বলিয়া আপনার দম্ভের প্রায়শ্চিত্ত বিধানার্থ অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন। রাজাকে অগ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিতে দেখিয়া, পুরোহিত মুদ্গল দারুণ ক্ষোভে আপনার মস্তকের শিখা উৎপাটন করিলেন। চোলভূপতি ও বিষ্ণুদাস বৈকুণ্ঠধামে সুশীল ও পুণ্যশীল নামে ভগবানের দ্বারপাল হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

মহারাজ চোল, ভাগিনেয়কে উত্তরাধিকারী করেন। তদবধি চোল রাজসিংহাসনে ভাগিনেয়গণ আরোহণ করিতেছেন। মুদ্গল শিখা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন, তদবধি মুদ্গলবংশীয় ব্রাহ্মণগণ শিখাধারণ পরিত্যাগ করেন। এইস্থানে পৌরাণিক আখ্যা সমাপ্ত হইল।

চোলরাজ্য অতি প্রাচীন। রামায়ণ, মহাভারত, অশোকের তাম্র-শাসন ও প্লিনির গ্রন্থে চোলরাজ্যের নাম আছে। চোল নামের পূর্ব্বে এই দেশের লম্বকর্ণ নাম ছিল। মহারাজ সগরের সময় কতকগুলি ধর্ম্মভ্রষ্ট আর্য্য-সন্তান এই দেশে প্রবেশ করে। তুর্ব্বসুরবংশীয় কতকগুলি আর্য্যসন্তান, ইহার পূর্ব্বে বা পরে লম্বকর্ণ দেশে উপনীত হয়। মগধের একদল লোক, তাম্র-পর্ণী নদীতীরে প্রথমতঃ উপনিবিষ্ট হইয়া লঙ্কাদ্বীপ অধিকার করে। এই ঘটনা হইতে লঙ্কাদ্বীপের তাম্রপর্ণী নাম হয়। এইরূপে চোলরাজ্যে আর্য্য-বসতি বিস্তার হয়। তাম্রপর্ণী অতি প্রসিদ্ধ নদী। ইহার দক্ষিণে ভারতে আর নদী নাই। এই নদীর সমুদ্রসঙ্গমস্থানে পূর্ব্বে মুক্তা পাওয়া যাইত। সিংহল-দেশের মহাবংশ নামক ইতিহাসে চোল নামক রাজার লঙ্কা-বিজয়ের উল্লেখ আছে। চোল রাজগণের মধ্যে অনেকে দিগ্বিজয়ী ছিলেন। এই রাজ্যের একজন রাজা বঙ্গবিহার পর্য্যন্ত জয় করেন। কেহ কেহ বলেন, বৈদ্যনাথের শিব, চোলরাজ্যের কোন রাজা কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছেন। আমাদের বর্ণিত আখ্যায়িকায় চোল ও বিষ্ণুদাসের বিবাদ ও বিবাদের পরিণামসম্বন্ধে বিশ্বাস করার ভার আমরা পাঠকদিগের রুচির প্রতি অর্পণ করিলাম। আমরা উক্ত আখ্যায়িকা হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটী ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাইতেছি।

(১ম) চোল নামের উৎপত্তির কারণ।

(২য়) চোল রাজসিংহাসনে ভাগিনেয়গণের উত্তরাধিকারিত্বের কারণ।

(৩য়) মুদ্গল গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের শাখাহীনতার কারণ।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

রাজা রামানন্দ রায়।

(৮)

শ্রীমচ্চৈতন্যদেব একটী নূতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলিয়া অনেকের ধারণা আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চৈতন্যদেব কোন নূতন ধর্ম্মের প্রচার করেন নাই তাঁহার বহু পূর্ব্ব হইতেই যে তদবলম্বিত প্রেমধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তদনুসারে বহু সাধু সন্ন্যাসী ভজন সাধনাদি করিতেন। মাধবেন্দ্রপুরী, ঈশ্বর-

পুরী, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য্য, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতি সকলে যে চৈতন্যের বহুপূর্ব্ব হইতেই কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা ছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ চৈতন্যানুপ্রাণিত বৈষ্ণব-সাহিত্যের নানাস্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে। রামানন্দ রায়ও যে চৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎকারের বহুপূর্ব্ব হইতে কৃষ্ণতত্ত্বাভিজ্ঞ পরম সাধক প্রেমী বৈষ্ণব ছিলেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাহার প্রকৃষ্টতম প্রমাণ চৈতন্য-চরিতামৃতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

১৪৩২ শকাব্দের বৈশাখমাসে বিদ্যানগরে চৈতন্যদেবের সহিত রাজা রামানন্দের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ইহার পূর্ব্বে কোথাও কাহারও নিকট চৈতন্যদেবের ধর্ম্মমত পরিস্ফুটরূপে প্রকটিত হয় নাই। চৈতন্যচরিতা-মৃতের মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে চৈতন্য-রামানন্দ সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, রামানন্দ তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমানন্দ-প্রাপ্তির জন্য চৈতন্যদেবের নিকট আদৌ ঋণী নহেন, বরঞ্চ যাঁহারা চৈতন্যদেবের ভগবত্তায় বিশ্বাস স্থাপনে পরাঙ্মুখ, তাঁহাদের ধারণা হইবে যে, চৈতন্যদেব স্বয়ংই রামানন্দের নিকট প্রেম-তত্ত্বের জন্য অনেকটা ঋণী। বাস্তবিকই রামানন্দ রায় এরূপ গভীরজ্ঞানী, অথচ প্রেমরসে সুরসিক ছিলেন যে, চৈতন্যদেব কৃষ্ণতত্ত্বানুসন্ধায়িগণকে রামানন্দের নিকট তাঁহাদের সন্দেহভঞ্জন জন্য প্রেরণ করিতেন। শ্রীক্ষেত্রে প্রদ্যুম্নমিশ্র মহাপ্রভুর নিকট কৃষ্ণকথা শ্রবণেচ্ছা প্রকাশ করিলে মহা-প্রভু বলিয়াছিলেন :—

"———কৃষ্ণকথা আমি নাহি জানি।
সবে রামানন্দ জানে তার মুখে শুনি॥
ভাগ্য তোমার কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন।
রামানন্দ পাশে যাই করহ শ্রবণ॥"

চৈ চ, অন্ত্য, ৫ প।

রামানন্দের ধর্ম্মমতের প্রতি মহাপ্রভুর কিরূপ শ্রদ্ধা ছিল, তাহা কৃষ্ণ-দাস কবিরাজ গোস্বামীর লিখিত :—

"প্রভু কহে,—আইলাম শুনি তোমার গুণ।
কৃষ্ণকথা শুনি শুদ্ধ করাইতে মন॥

যৈছে শুনিল তৈছে দেখিল তোমার মহিমা।
রাধাকৃষ্ণ প্রেম রসজ্ঞানে তোমার সীমা॥"
চৈ চ, মধ্য, ৮ প।

রামানন্দের প্রতি চৈতন্যদেবের এই উক্তি হইতেই স্পষ্টীকৃত হইতেছে। "রাধাকৃষ্ণ প্রেমরসজ্ঞানে" রাজা রামানন্দের শ্রেষ্ঠতা এইস্থানে স্পষ্ট প্রকটিত হইয়াছে।

চৈতন্যদেবের সহিত রামানন্দের ধর্ম্মতত্ত্বালোচনায় রামানন্দ যে সকল তত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ অতি সুকৌশলে ও সংক্ষিপ্তভাবে অথচ বিশদভাবে চৈতন্যচরিতামৃতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা হইতে চৈতন্যপ্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলতত্ত্বগুলি সম্পূর্ণ অবগত হওয়া যায় এবং তাহাতে রামানন্দের গভীর জ্ঞান ও অপূর্ব্ব প্রেমিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। রামানন্দ যে একজন অন্ধবিশ্বাসী ছিলেন না এবং অধিকারিভেদে ভজন প্রণালীভেদের আবশ্যকতায় বিশ্বাস করিতেন, তাহার প্রমাণ বর্ত্তমান আছে। চৈতন্যদেব যখন রামানন্দের উক্তিগুলি বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়া তাহার পোষকতা করিয়া গিয়াছেন, তখন রামানন্দের উক্তি ও বিশ্বাসকে চৈতন্যদেবের উক্তি ও বিশ্বাস বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ভক্ত ও বিশ্বাসী বৈষ্ণবগণও রামানন্দের মুখে চৈতন্যদেবকেই বক্তা জ্ঞান করিয়া থাকেন। এস্থলে সংক্ষেপে রামানন্দের প্রতিপাদিত ধর্ম্মমত সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে।

রাজা রামানন্দের মতে প্রথমতঃ স্বধর্ম্মাচরণ অর্থাৎ বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠানেই বিষ্ণুভক্তি লাভ হইতে পারে। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিহার না করিয়া ভগবানের প্রীতির জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ প্রথমাপেক্ষা উচ্চতর সাধন। উপরোক্তরূপে ফলকামনা ত্যাগ করতঃ কর্ম্মানুষ্ঠান অভ্যস্ত হইলে হৃদয়ে সুদৃঢ় শ্রদ্ধার উৎপত্তি হয়। এই শ্রদ্ধার উৎপত্তি হইলে কর্ম্মের আর প্রয়োজন থাকে না; সুতরাং মানুষ তখন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মত্যাগ করতঃ উচ্চতর সাধনের যোগ্যতা লাভ করে। এই অবস্থায় জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির উৎপত্তি হয়। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি হইতে জ্ঞানের হীনতার উপলব্ধি হইয়া শুদ্ধ প্রেমভক্তির উদয় হয়। এই শুদ্ধ প্রেমভক্তি অবস্থাভেদে পঞ্চবিধ,—

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই পঞ্চবিধা ভক্তির মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বটী হইতে ক্রমে পর পরটী শ্রেষ্ঠতর এবং পূর্ব্ব পূর্ব্বটী পর পরটীর অন্তর্গত। মধুর বা কান্তাপ্রেম আবার দ্বিবিধ,—ব্রজদেবী বা গোপীগণের ভাব এবং রাধাভাব। রাধাভাবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রাধার প্রেমের তুলনা নাই, রাধার প্রেমেই কৃষ্ণের পূর্ণপ্রীতি এবং স্বয়ং চৈতন্যদেব রাধাভাবেই নিয়ত নিমগ্ন থাকিতেন। সুতরাং গোপীভাব ও রাধাভাবের সাধনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন।

রাজা রামানন্দ, গোপীভাব বা রাধাভাবের সাধনকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিলেও অন্যবিধ সাধন বা উপাসনা প্রণালীকে উপেক্ষা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন :—

"কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয়॥
কিন্তু যার যেইভাব সেই শ্রেষ্ঠতম।"

ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে, রামানন্দের মতে সর্ব্ববিধ ভজনেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটে। যাহার যেরূপ ভজনে নিষ্ঠা, তাহার সেইরূপ ভজনেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটিবে। রামানন্দের এইমত এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষাব্দেও মার্জ্জিতজ্ঞান বৈষ্ণব কেন, হিন্দু মুসলমান সকলেই অনুসরণ করিয়া পরস্পরের প্রতি ধর্ম্মভেদজনিত বিদ্বেষভাবকে বিদায় দান করিতে পারেন।

বৈষ্ণবসমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা পরিদর্শনে "গোপীভাবে কৃষ্ণানুশীলন" সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধন এইরূপ মত প্রকাশিত হইতে দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব এবং গোপীতত্ত্ব প্রাচীন বৈষ্ণবগণকর্ত্তৃক যেরূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিলে, বৈষ্ণবশাস্ত্র বা তদুক্ত সাধনপ্রণালী ঘৃণ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না, বরঞ্চ এতাবৎ আবিষ্কৃত ভগবদ্ভজন-প্রণালী সমুদায়ের মধ্যে একটী উৎকৃষ্ট প্রণালী বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে, এবং রামানন্দের ব্যাখ্যান হইতেই তাহা প্রদর্শিত হইতে পারে। এস্থলে সংক্ষেপে তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচনা হইতে রামানন্দের রাধা, কৃষ্ণ, সখী ও প্রেমসম্বন্ধে কয়েকটীমাত্র বচন উদ্ধৃত করিতেছি।

রামানন্দ, এইরূপে কৃষ্ণের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন :—

"ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
সর্ব্ব অবতারী সর্ব্ব কারণ প্রধান॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ যার অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার॥
সচ্চিদানন্দ তনু ব্রজেন্দ্র নন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য, সর্ব্বশক্তি সর্ব্ব রসপূর্ণ॥"

চৈ চ, মধ্য, ৮ পঃ।

রাধার স্বরূপ নির্ণয়ার্থ রামানন্দ বলিতেছেন :—

"কৃষ্ণের অনন্তশক্তি তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি আন্॥
অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি সবার উপরে॥
সচ্চিৎ আনন্দ হয় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিনরূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥
কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেমনাম।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী॥"

অপরস্থলে—

"রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণপ্রেম কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্পপাতা।"

উপরি উদ্ধৃত অংশে প্রেম ও সখীগণের স্বরূপও নির্দ্দেশিত হইয়াছে, স্থানান্তরেও আছে :—

"মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায় বূহ রূপ॥

রামানন্দ উল্লিখিত রূপে রাধাকৃষ্ণের স্বরূপ ও প্রেমতত্ত্ব মহাপ্রভুর সহিত পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। ইহা হইতে প্রতীত হইবে যে, রাধাকৃষ্ণের প্রেম সম্পূর্ণ অশ্লীলতাবর্জ্জিত, বা তাহা কোনরূপে অশ্লীল-ভাবোদ্দীপক নহে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্ত্বের বিষয় যাঁহারা পর্য্যালোচনা করিতে চাহেন, আমি তাঁহাদিগকে চৈতন্যচরিতামৃতের রামানন্দ-চৈতন্য-সংবাদ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

রামানন্দ, চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎলাভ করার পর হইতেই বিষয়-সংশ্রবত্যাগের জন্য সচেষ্ট হইয়া অনন্যমনে প্রেমানুশীলনে ইচ্ছুক হন। চরিতামৃতকার চৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎকার কালেই রামানন্দের বিষয় বিরাগোৎপত্তি ও তাঁহার সম্মুখে সন্ন্যাসী চৈতন্যে রাধাশ্যাম বিগ্রহ স্ফূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। চৈতন্যদেব এই সময়ে তাঁহাকে বিষয়ত্যাগ করিয়া নীলাচলে যাইবার উপদেশ দেন এবং মহাপ্রভু দক্ষিণ-ভ্রমণান্তে দুই বৎসর পর শ্রীক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে রামানন্দ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া অনন্যমনে কৃষ্ণপ্রেমানুশীলনে নিরত হন।

(৯)

কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নীলাচল-লীলার নিত্যপরিকর-গণের মধ্যে ভক্ত হরিদাসের তিরোভাব বর্ণনা করিয়াছেন, স্বয়ং গৌরাঙ্গদেবের লীলাবসানের চিত্রপ্রদান করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে রাজা রামানন্দ রায়ের তিরোধান সম্বন্ধে কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। ইহা হইতে প্রতীত হয় যে, রাজা রামানন্দ রায় শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর লীলাবসানের পরেও বর্ত্তমান ছিলেন। নরহরি চক্রবর্ত্তী ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থে শ্রীনিবাস আচার্য্যের জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য

চৈতন্যদেবের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন, কিন্তু মহাপ্রভুর লীলা-পরিসমাপ্তি-হেতু চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হন নাই;—কেবল তাঁহার অন্তরঙ্গভক্ত স্বরূপ রামানন্দের দর্শনলাভ. করিয়াছিলেন। ইহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে, চৈতন্যদেবের পর রামানন্দের তিরোধানের কথা নরহরি চক্রবর্ত্তীর সাময়িক বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস করিতেন। চৈতন্যদেবের লীলাবসানের অন্ততঃ দুই বৎসর পর রামানন্দ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভ করেন, এরূপ অনুমান করিলে ১৪৫৭ শকাব্দা বা ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দকে রামানন্দের তিরোধান-বৎসর বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে।

ধর্ম্ম ও চরিত্র-বলে মহীয়ান মানব হিন্দুসমাজের শীর্ষশ্রেণীস্থ না হইলেও যে বিপ্রাদি বর্ণ সকলের পূজ্য ও নমস্য হইতে পারেন, তাহার দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মপ্রচারের ইতিহাসে বিরল নহে। এই উনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞানোজ্জ্বল পরিণামভাগেও সেইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব পরিদৃষ্ট হয় নাই। রাজা রামানন্দের জীবনী আলোচনা করিলেও দৃষ্ট হয় যে, তিনি জীবনের শেষভাগে সাধুজনোচিত সমাদর ব্রাহ্মণগণের নিকটেও প্রাপ্ত হইতেন। চৈতন্যদেব, ব্রাহ্মণ প্রদ্যুম্নমিশ্রকে রামানন্দের নিকট ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং শেষ জীবনে তাঁহার এই সম্মান এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, শাস্ত্রজ্ঞ শ্রীনিবাস আচার্য্য তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া আপনাকে ধন্যজ্ঞান করিয়াছিলেন।

রামানন্দের শাস্ত্রজ্ঞান ও জ্ঞানগাম্ভীর্য্যের কথা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু তিনি কোন্ গুরু বা শিক্ষাচার্য্যের নিকট শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহার কোন নিদর্শন বৈষ্ণবগ্রন্থে পাওয়া যায় না। চৈতন্য-দেবের পূর্ব্ব হইতেই যে চৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম্মের মূলতত্ত্বগুলি তিনি অবগত ছিলেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে; সুতরাং চৈতন্যদেবকেও তাঁহার গুরু বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে একজন সিদ্ধপুরুষ বিবেচনা করিয়া থাকেন। গৌরগণোদ্দেশ দীপিকাদি চৈতন্যদেবের অব্যবহিত পরবর্ত্তী বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে রামানন্দ অর্জ্জুন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, এবং ভক্ত বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে কোন্ স্থানে অর্পণ করিবেন, সম্ভবতঃ তাহা স্থির করিতে না পারিয়াই, তাঁহাকে কেহ অর্জ্জুন, কেহ অর্জ্জুনীয়া,

কেহ বা ললিতা সখী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১)। বৈষ্ণবগ্রন্থকারগণ কর্ত্তৃক এইরূপ রামানন্দের পূজ্যতা নির্ণয় হইতে অনায়াসে অনুমিত হইবে যে, তাঁহার সমসাময়িক বৈষ্ণবজগতেও তাঁহার জীবন মহা রহস্যময় ছিল।

বঙ্গীয় বৈষ্ণব গ্রন্থাবলীর সাহায্যে চৈতন্যদেবের ধর্ম্মপ্রচারের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, দ্রাবিড় দেশেই প্রেমধর্ম্ম-স্রোতের আদিম প্রস্রবণ। সেই প্রস্রবণক্ষরিত প্রেমস্রোতঃ উড়িষ্যা হইয়া বঙ্গদেশে তৎপরে চৈতন্যদেবের কৃপায় সমগ্র ভারতবর্ষে প্রবল বন্যা উপস্থিত করে। তবে বঙ্গদেশই প্রেমবন্যায় প্লাবিত হওয়ায় তাহাকেই প্রেমধর্ম্ম-প্রবাহের আদিম উৎস বলিয়া সাধারণের ধারণা জন্মিয়াছে। এইরূপ আলোচনা হইতে আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, উড়িষ্যার রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকার সময়েই প্রত্যক্ষ ভাবেই হউক, আর পরোক্ষভাবেই হউক, রাজা রামানন্দ রায় কোন বৈষ্ণব সাধুর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন।

সমাপ্ত।

শ্রীরাধেশচন্দ্র শেঠ।

(১) প্রিয়নর্ম্মসখা কশ্চিদর্জ্জুনঃ পাণ্ডবোঽর্জ্জুনঃ।
মিলিত্বা সমভূদ্রামানন্দরায়ঃ প্রভোঃপ্রিয়ঃ॥
অতো রাধাকৃষ্ণভক্তি প্রেমতত্ত্বাদিকং কৃতী।
রামানন্দো গৌরচন্দ্রং প্রত্যবর্ণয়দম্বহং॥
ললিতেত্যাহুরেকে যত্তদেকেনানুমন্যতে।
ভবানন্দং প্রতি প্রাহ গৌরো যত্বং পৃথাপতিঃ॥
গোপ্যর্জ্জুনীয়য়া সার্দ্ধমেকীভূয়রপি পাণ্ডবঃ।
অর্জ্জুনোঘত্রায় রামানন্দ ইত্যাহুরুত্তমাঃ॥
গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা।

হাসির গান।

দেশের ক্রমোন্নতি।

হয়নি কি ধারণা, বুঝিতে পারনা
ক্রমে উঠে দেশ উচ্চে,
যে হেতু যে গুলো রুচিত না আগে
এখন সে গুলো রুচ্ছে।

কেননা আমাদের বেড়ে মাথা সাফ্,
"গ্যানো" খুলে পড়্ছি বিদ্যুৎ আলো তাপ্,
মাপ্ছি স্কোয়ার ফুটে বায়ুরাশির চাপ্
আর, মনের অন্ধকার ঘুচ্ছে।

যে হেতু বুঝেছি বিস্কুট কেমন মধুর,
কুক্কুট-অস্থি কেমন স্বাদু,
আর ক্রমে মদিরায় যার মতি যায়,
কেমনে সে হয় সাধু;

যে হেতু আমাদের মনে মুখে দুই,
(যাকে) বল্তে হবে "আপনি" তাকে বলি "তুই",
চাকুরি দেবে ব'লে চরণতলে শুই
আর, ঘৃণা করি গরীব তুচ্ছে।

যে হেতু আমরা হ্যাটে ঢাকি টিকি,
সদা জামা রাখি শরীরে,
"শ্যান্টিপো" বলি "শান্তিপুর"কে
আর "হ্যারি" ব'লে ডাকি "হরি"রে;

যে হেতু আমরা ছেড়েছি একান্ত,
কীটদষ্ট বাতুলতা বেদ বেদান্ত,
মোদের অস্থিমজ্জাগত সাহেবি দৃষ্টান্ত,
দেখ—"চাটুয্যে বাড়ুয্যে"!

কারণ ধর্ম্মহীনতাটাই ধর্ম্ম আমাদের,
কোন ধর্ম্মে নাই আস্থা,
কি হবে ও ছাইভস্ম গুলো ভেবে
মস্তিষ্কটা নয় সস্তা;

অণুবীক্ষণ আর দূরবীক্ষণ ধরে'
বাহিরের আঁখি দুটো ফুটাচ্ছি বেশ করে,
মনশ্চক্ষুঃ অন্ধ তার খবর কে করে
ও সে বেচারি আঁধারে ঘুর্‌ছে।

আর, যেহেতু আমরা নেশা করি,—কিন্তু
প্রাইবেট ক্যারাক্টার দেখ'না;
কংগ্রেশে কি বলি তাই মনে রেখো
আর কিছু মনে রেখ না;

বাপকে করি ঘৃণা মাকে দেই না অন্ন
বাইরের আবরণটা রাখি পরিচ্ছন্ন
কোট প্যাণ্টালুনে ঢাকি কৃষ্ণবর্ণ
যেমন দাঁড়কাক ময়ূরপুচ্ছে!

আর, যেহেতু আমরা পত্নী-আজ্ঞাকারী
প্রাণপণে যোগাই গহনা,—
আরে বাপ্‌রে তার রুষ্ট আঁখি তাপে
শুকায় প্রেমনদীর মোহনা,—

(সে যে) মাকে বলে বেটী,—হেঁসে দেই উড়িয়ে,
(তার) পিতৃবংশ নিয়ে আসি সব কুড়িয়ে,
(মোদের) চিনিয়ে দিতে হয় এ "মাসী" "খুড়ি" এ
(ভুলে) প্রণাম করিনা পূজ্যে!

কারণ খবরের কাগজ, সাইনবোর্ড আর
বিজ্ঞাপনের বেজায় ছড়াছড়ি,
তাতে দেখ্‌বে যথাক্রমে "পঞ্চানন্দ" আর
তিনকড়ি কবিরাজের "প্রেমবড়ি"!

আর যেহেতু আমাদের সাহস অতুল,
সাহেব দেখ্‌লে হয় পিতৃনামটা ভুল,
দেশটা, সংক্রান্তি পুরুষের হাত পা মাথা ছেড়ে—
ধরেছিল বুঝি গুহে!

বৈয়াকরণ দম্পতীর প্রেমপত্র।

(স্ত্রীর পত্র)

কবে হবে তোমাতে আমাতে সন্ধি!
যাবে বিরহের ভোগ, হবে শুভযোগ
দ্বন্দ্ব সমাসে হইব বন্দী।

তুমি মূল ধাতু আমি হে প্রত্যয়,
তোমা যোগে আমার সার্থকতা হয়
কবে স্তিতিস্ততঃ স্তিস্তির ঘুচে যাবে ভয়
হব বর্ত্তমানের তিপ্ তস অন্তি।

(আমি) অবলা কবিতা, তুমি অলঙ্কার
তোমা বিনা আমার কিসের অহঙ্কার,
করিছে অনঙ্গ, ছন্দ-যতি-ভঙ্গ
এসে সংশোধনের কর হে ফন্দি!
(স্বামীর উত্তর)
প্রিয়ে, হয়ে আছি বিরহে হসন্ত।
শুধু আধখানা কোনমতে রয়েছি জীবন্ত।
কি কব ধাতুর ভোগ, নানা উপসর্গ যোগ
জীবনে কে লাগায়েছে বিসর্গ অনন্ত।

প্রেয়সী প্রকৃতি তুমি, প্রত্যয়ের লীলাভূমি
তোমা বিনা কে আমারে ব্যাকরণে মান্ত?
অধ্যয়ন উঠছে চাঙ্গে, রাত্রে যখন নিদ্রা ভাঙ্গে
লুপ্ত অকারের মত মরে থাকি জ্যান্ত।

এ যে সন্ধিবিচ্ছেদের রাজ্য, কবে হব কর্তৃবাচ্য
বিরহ-অসমাপিকা-ক্রিয়া পাইনা অন্ত।
প্রিয়ে তুমি আছ কুত্র, খেয়েছি সব মুল সূত্র
পেয়ে তোমার প্রেমপত্র করি হা হা হন্ত।

পুত্রোদ্বাহের ফর্দ্দ।

(কন্যার পিতার প্রতি)

কন্যাদায়ে বিব্রত হ'য়েছ বিলক্ষণ;
তাই বুঝে সংক্ষেপে করছি ফর্দ্দ সমাপন।
নগদে চাই তিনটী হাজার,
তাতেই আবার গিন্নী বেজার,
বলেন "এবার বরের বাজার
কথা কি রকম!"

(কিন্তু) তোমার কাছে চক্ষুঃ-লজ্জা লাগে যে বিষম!
পড়ার খরচ মাসে তিরিশ,
"হয়না কমে"—বলে গিরিশ
কাজেই সেটা হ্যাঁ হ্যাঁ, বেশী বলা অকারণ;
সোণার চেন ঘড়ী, আইভরি ছড়ি
ডায়মণ্ড কাটা সোণার বোতাম,
দিও এক শেট্ কতই বা দাম,
বিলাতী বুট ভাল শ্লিপার বরের প্রয়োজন।
(আর) ফুলষ্টকিং রেসমী রুমাল দিও দুডজন।

ছাতি বুরুষ আয়না চিরুণ,
ফুট কাটা সার্ট কোট পেণ্টালুন
দুজোড়া শাল সার্জ্জের চাদর গরদ সুচিকণ,
জমকালো ব্যাপার, আতর ল্যাবেণ্ডার,
থান পনের দেশী ধুতী,
রেসমী না হয় দিও সুতি,
—হ্যাদ্ দেখ, ধরেনি চশমা কেমন ভুলা মন!
ছেলে ঠুসী পেলে খুসী,—একটু খাটো দরশন!

খাট চৌকি মশারি গদি,
এর মধ্যে নাই "পারি যদি",—
তাকিয়া তোষক বালিস আদি দস্তর মতন;
হবে দুপ্রস্ত, শয্যা প্রশস্ত
(আর) টেবিল চেয়ার আলনা ডেস্ক,
হাতীর দাঁতের হাত বাক্স;
ষ্টিল ট্র্যাঙ্ক খুব বড় ছুটো যা দেশের চলন;
তারি সঙ্গে পুরো এক শেট্ রুপার বাসন।

গিন্নী বলেন বাউটী গুটে
রূপলাবণ্য উঠে ফুটে
একশ ভরি হলেই হবে একটী শেট্ উত্তম ;
যেন অলঙ্কার দেখে, নিন্দে করেনা লোকে
দিও বারাণসী বোম্বাই, ফর্দ্দ কিছু হ'ল লম্বাই,
তা তোমার মেয়ে তোমার জামাই, তোমার আকিঞ্চন ;
আমার কি ভাই, আজ বাদে কাল মুদ্‌বে দু'নয়ন।

(আর) দিও যাতায়াতের খরচ
না হয় কিছু হবে করজ
তা—তোমার মেয়ে, তোমারি গরজ—তোমার প্রয়োজন।
(আবার) আস্‌বে কুলীন দল
(তাদের) চাই বিলাতী জল
ডজন বিশেক হুইস্কি রেখো
নইলে বড় প্রমাদ দেখো ;
কি কর্‌বো ভাই দেশের আজকাল এমনি চাল চলন।
কেবল চক্ষুঃ লজ্জায় বাধ' বাধ' ঠেক্‌ছে যে কেমন।

(আর) ছেলেটী মোর নব কার্ত্তিক,
ভাবটী আবার খাঁটী সাত্ত্বিক,
এই বয়সেই ভারভাত্তিক,—কত্তাদের মতন ;
যদি দিতেন একটী পাশ, তবে লাগিয়ে দিতাম ত্রাস
ফেল ছেলে তাই এক কম পণ
তাতেই তোমার উঠ্‌লো কম্পন ?—
—কেবল তোমার বাজার যাচাই বকালে অকারণ !
দেশের দশা হেরে কান্ত করে অশ্রু বরিষণ !!

শ্রীরজনীকান্ত সেন

ফলিত জ্যোতিষ-প্রসঙ্গ।

গত চৈত্রের 'প্রদীপে' অশেষ শ্রদ্ধাভাজন গুরুস্থানীয় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র-বাবুর হস্তপ্রসূত "ফলিত জ্যোতিষ" বলিয়া একটা প্রবন্ধ ছিল। বিজ্ঞানশাস্ত্র-নিষ্ণাত, সুপণ্ডিত রামেন্দ্রবাবুর নাম দেখিয়া বড়ই আগ্রহ, বড়ই ভক্তিসহকারে প্রবন্ধটি পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম; ভাবিয়াছিলাম, ফলিত জ্যোতিষ-সম্বন্ধে একটা ভাল কোন যুক্তিতর্কপূর্ণ সিদ্ধান্ত পাওয়া যাইবে। তাঁহার ন্যায় বিজ্ঞান ও জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ্ নানা কলাকুশল পণ্ডিতের রচিত প্রবন্ধে তাহা আশা করাই সঙ্গত, কিন্তু অন্যে কিরূপ বুঝিয়াছেন জানি না, ক্ষুদ্র-বুদ্ধি আমি তো তাহা পাঠে নিরাশ হইয়াছি, তাই সে সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিতে আসিলাম। আমার উদ্দেশ্য প্রতিবাদ নহে, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র-বাবুর সহিত আমার বাদ প্রতিবাদ চলিতেই পারে না, তিনি আমার গুরু-স্থানীয়, তারপর আমি জ্যোতিষশাস্ত্রসম্বন্ধে অনভিজ্ঞ; তবে সাধারণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় যাহা বোধ হয়, তাই আমি নিবেদন করিতে আসিয়াছি। আমার উদ্দেশ্য প্রদীপের* আলোকে সন্দেহধ্বান্ত নিরসনমাত্র। আজকাল অনেকেই মনে করেন যে, কোন প্রবন্ধসম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলেই সেটা লেখকের প্রতি ঈর্ষা, হিংসাবশতঃ বা লেখকের সঙ্গে মনোমালিন্য বশতঃই হইয়া থাকে, তাই উল্লিখিত কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক মনে করিলাম; রামেন্দ্রবাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোন আলাপ পরিচয় নাই, সুতরাং ঐসব কারণের কোনও সম্ভাবনাই নাই।

প্রবন্ধটি পড়িয়া বোধ হয় যে, শ্রদ্ধাস্পদ রামেন্দ্রবাবু ঐ প্রবন্ধে স্বীয় গাম্ভীর্য্য রক্ষা করেন নাই। প্রবন্ধটির আদ্যন্ত রহস্য, শ্লেষ ও উপহাসপূর্ণ; সে সব শ্লেষ ও রহস্য-অস্ত্রগুলি 'মরিচাধরা' নহে, বেশ শাণিত, বেশ উজ্জ্বল,

---

* প্রবন্ধটী "প্রদীপেই" প্রকাশিত হইবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। প্রদীপ সম্পাদক প্রকাশিত করিতে অসম্মত হইয়া ফেরত দেওয়ায়, ইহা উৎসাহে প্রকাশিত হইল।

উৎসাহ সম্পাদক।

বেশ মর্ম্মন্তুদ, কিন্তু তাহার মধ্যে প্রকৃত সারবত্ত্বা যেন কমই আছে বলিয়া বোধ হয়। তিনি প্রথমেই বলিয়াছেন যে, এ বিষয় অতি প্রাচীনকাল হইতে বিবাদস্থানীয় হইয়া আসিতেছে, যুক্তি, তর্কও যথেষ্ট খরচ হইয়া গিয়াছে। আমরা ভাবিয়াছিলাম, তাঁহার মত সুপণ্ডিত ব্যক্তি আধুনিক যুক্তি-তর্কাদির সমাবেশ দ্বারা একটা মীমাংসার চেষ্টা করিবেন, কিন্তু তাহাতো আমি পাই নাই, অথবা বুঝিতে পারি নাই। তিনি এক কথায় সব গোলযোগ মিটিয়া যাইতে পারে বলিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ এক কথায় যদি সব গোল মিটিত, তবে সংসারে অনেক বিবাদই লয়প্রাপ্ত হইত।

প্রত্যেক পক্ষই যখন নিজ বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া যুক্তি তর্কের অবতারণা করেন, তখন প্রত্যেকেই মনে করেন, তাঁহাদের কথাগুলি অভ্রান্ত, যুক্তি অকাট্য, কেহ তদ্বিরুদ্ধে কিছু বলিতে গেলেই সে অর্ব্বাচীন হইয়া দাঁড়ায়; অনেক সময় লোকে যুক্তিতর্কে প্রতিপক্ষের সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া টিট্‌কারী ও হাততালি দ্বারা তাহাকে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করে, সুতরাং সেটা ভাবিয়া দেখিলে সংসারের সাধারণ নিয়ম বা মানবের স্বাভাবিক চরিত্রগত একটা ধর্ম্ম। 'জগতে দুইটি বস্তু আছে, যাহা লোকে প্রায়ই কম দেখেনা, সে দুটি জিনিস :—স্বকীয় বুদ্ধি আর পরকীয় ধন।'

সুতরাং এক পক্ষ অপর পক্ষকে মন্দ বলিলে সেটা অসাধারণ কিছু হয় না। অবশ্য আমি সেটা প্রশংসা করি না, সেরূপ করা কোন ক্ষেত্রেই উচিত নহে, কেবল সম্প্রদায়বিশেষে নহে, কাহারই তাহা করা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু সকলেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন যে, কার্য্যতঃ প্রায়ই তাহার বিপরীত আচরণ দেখা যায়।

ফলিত জ্যোতিষ নূতন নহে। অনেকের মতে ফলিত ও গণিত জ্যোতিষ একই সময়ের পরে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। সুধু ভারতবর্ষে নহে, ইয়ুরোপ খণ্ডের প্রাচীন গ্রীস, রোম হইতে আধুনিক ইংলণ্ড, জারমেনি প্রভৃতি সভ্যদেশে, আমেরিকায়, মিসরে, চীনে এই বিদ্যার আলোচনা চলিয়া আসিতেছে; অবশ্য সর্ব্বদেশেই বিরুদ্ধ মতের লোকও আছেন, বিরোধিদলও আছেন; কোন্ বিষয়েরই বা নাই? সুতরাং তাই বলিয়াই যে বিদ্যাটাকে উপেক্ষা ও শ্লেষের পেষণযন্ত্রে ফেলিয়া নির্দ্দয় পীড়ন করিতে হইবে, সাই-

বিরিয়ার ভূমিকম্প, লুইনেপোলিয়নের পৌত্রের শিরঃপীড়া বা আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণের সম্ভাবনা দেখাইয়া উচ্চ হাসি হাসিতে হইবে, এরূপ কোন কথা আছে বলিয়া বোধ হয় না। আজ যাহা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গৃহীত হইতেছে, পূর্ব্বে হয়ত তাহাই উপেক্ষার বিষয় ছিল, আবার দুদিন পর তাহাই পুনরায় উপেক্ষিত হইতে পারে। জগতের নিয়মই তাই।

অন্যান্য বিজ্ঞানও যে মূলসূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, ফলিত জ্যোতিষও তাহাই। নিখিল বস্তুজাতের ভূতলপতন দৃষ্টে যেমন এইটা বস্তুসমূহের একটা বাধ্যবাধকতা বলিয়া স্থির হইয়াছে, সেইরূপ কপাল, চক্ষুঃ, নাসিকা, ওষ্ঠ প্রভৃতির আকার প্রকার, কর রেখাবলীর বিচারণ এবং আকাশের নক্ষত্র সংস্থানের সহিত ভূতলস্থ জীবগণের জীবনের সম্বন্ধ সম্বন্ধে নানারূপ পরীক্ষা দ্বারাই ফলিত জ্যোতিষের তত্ত্ব সমস্ত নির্ণীত হইয়াছে; বিশেষ বিশেষ রেখা বা চিহ্ন হস্তে বা দেহে থাকায় অনেক লোকের জীবনে এইরূপ ঘটনা হইয়াছে দেখিয়াই সাধারণ-সূত্র স্বরূপে পরীক্ষাকারিগণ স্থির করিয়াছেন যে, এইরূপ চিহ্নে বা রেখায় এইরূপ ফল হইয়া থাকে। গগনের অমুক নক্ষত্র সংস্থানের কালে জন্মিলে জীবনের ফল এইরূপ হইয়া থাকে, ইহা নানাস্থানে পরীক্ষা করিয়াই তাহা সাধারণ সূত্রস্বরূপে গৃহীত হইয়াছে। নতুবা প্রাচীন পণ্ডিত ঋষিগণ সোমরস পানে বিভোর হইয়া যে সূত্রগুলি যথেচ্ছ রচনা করিয়াছেন, তাহা আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে ধারণা হয় না।

তবে বলিতে পারেন যে, গণনা সর্ব্বদা ঠিক হয় না কেন? একথার উত্তরে জ্যোতির্বিক বলিতে পারেন যে, 'গণনা উপযুক্তরূপ হয় না। যে কারণেই হউক, ফলিত জ্যোতিষের আলোচনা লুপ্তপ্রায়! ফলিত জ্যোতিষের গণনাও বিশেষ কঠিন। জন্মকালের ঠিক সময় নিরূপণের উপরই জীবনের গণনার সত্যাসত্য নির্ভর করে, তাহা অনেক সময়ই ঠিকরূপ হয় না, তার পর তাহা ঠিক হইলেও পরবর্ত্তী গণনার অঙ্কপাতে অনেক বিঘ্ন আছে, তাহাতে অনেক ভুলভ্রান্তি হইয়া থাকে। আজকাল গ্রহাচার্য্যগণের উপরই সাধারণতঃ ফলিত জ্যোতিষের ভাগ্য ন্যস্ত আছে। তাঁহাদের অনেকেই নিরক্ষর, বা সংস্কৃতশাস্ত্রানভিজ্ঞ, সুতরাং তাঁহারা যথেচ্ছ গণনা করিয়া যা খুসী তাই বলিয়া থাকেন, তাহা অনেক সময়ই ভুল হয়। এই সব নিরক্ষর

লোকই ফলিত জ্যোতিষের উপর লোককে বীতশ্রদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু সেজন্য জ্যোতিষের অপরাধ কি? রাসায়নিক সংযোগ-বিয়োগে অনেক নূতন বস্তু প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু যে যে পরিমাণে যাহা মিশ্রিত করিতে হইবে তাহা যদি না হয়, তবে কি সে সব দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে? অথবা তাহা না হইলে রসায়নদুষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হয়? কবিরাজ গোক্ষুর দ্বারা ঔষধ প্রস্তুতের ব্যবস্থা করায় যদি গাভীর ক্ষুর কর্ত্তিত হয়, তবে সেজন্য কি আয়ুর্ব্বেদ অপরাধী হইবে?

রীতিমত প্রকৃত সময় নিরূপণ ও গ্রহাদি সংস্থান জ্ঞাত হইয়া শাস্ত্রোক্ত বিধানে গণিত হইলে ফলিত জ্যোতিষ অভ্রান্ত ফল প্রদান করে, একথা জ্যোতিষিক দর্প করিয়া বলেন। সুতরাং সুপণ্ডিত ফলিত জ্যোতিষিকগণকে আহ্বান করিয়া ঐরূপে গণনা করাইয়া সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক, তাহা হইলেই প্রকৃত উপকার হয়, [illegible]কা শ্লেষে কোন কাজ হয় না।

তবে ফলিত জ্যোতি[illegible]নি বিশেষ গণনাসম্বন্ধে যাথার্থ্য অনুসন্ধান করায়, একটা অন্তরায় আছে। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রবাবু প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাহেন, তাঁহার বিজ্ঞান সেরূপ প্রমাণ দিতে সমর্থ; কারণ সে যে তত্ত্বের প্রমাণ করিবে, তাহার প্রমাণোপযোগী বস্তুজাত সর্ব্বদাই একরূপ। জড়জগতের বস্তুজাত একভাবেই আছে। জল, অগ্নির উত্তাপে বাষ্প হয়, ইহা দেখান সহজ; কারণ জল, অগ্নি উত্তাপ দিবার পাত্র প্রভৃতি সবই সর্ব্বকালে একরূপ। বাক্সের টাকা না খুলিয়াও দেখা যায়, ইহাও সর্ব্বদাই প্রামাণ্য, কারণ 'রন্তগেন' আলোক থাকিলেই আর ভাবনা নাই, কিন্তু ফলিত জ্যোতিষে তাহা সম্ভব নহে; কারণ অমুক নক্ষত্রের এই অবস্থায় জন্মিলে জাতসন্তান এইরূপ হইবে, তাহা যখন তখন প্রমাণ করা সহজ নহে; কারণ গ্রহের সেইরূপ সংস্থান এবং সেই সংস্থানের সময় জীব সৃষ্টি করা, জল ও অগ্নি সংগ্রহ করার ন্যায় আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে, সেজন্য আমাদিগকে প্রকৃতির উপর নির্ভর করিতে হয়। জলহীন দেশে বৈজ্ঞানিক শত চেষ্টাতেও জলের বাষ্পীভবন প্রত্যক্ষরূপে প্রমাণ করিতে পারেন না। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রহীন বিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে অতি সুপণ্ডিত বৈজ্ঞানিককেও অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণ সাপেক্ষতত্ত্ব খড়ি ও বোর্ডের সাহায্যে প্রমাণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। এবৎসর

অমুক দিন, অমুক সময় গ্রহণ হইবে, ইহাও ঠিক সেইকালের পূর্ব্বে প্রমাণ করা অসম্ভব! সেইরূপ ফলিত জ্যোতিষের অনেক তত্ত্বও যখন তখন প্রমাণ করা অসম্ভব। যাঁহারা ইহাতে বিশ্বাসী নহেন, তাঁহারা অনেকস্থলেই যত দূর প্রমাণ সংগ্রহের প্রয়োজন, ততদূর প্রমাণ সংগ্রহের ক্লেশ স্বীকারে অস্বীকৃত। তাঁহারা আগে হইতেই বুঝিয়া রাখিয়াছেন যে উহা অসার, সুতরাং সেই স্বতঃসিদ্ধ অসারত্বের প্রমাণ জন্য অন্যের নিকট অনুসন্ধান তাঁহারা আবশ্যক মনে করেন না। এস্থলে আমি রামেন্দ্রবাবুকে লক্ষ্য করিতেছি না, সাধারণ ভাবেই বলিতেছি।

বিদ্যাসাগর মহাশয় জন্মিবার সময়ে যে কোষ্ঠী প্রস্তুত হইয়াছিল, তল্লিখিত ঘটনাবলী যদি তাঁহার পরজীবনে ঠিক মিলিয়া যায়, তবে সে গণনা সত্য হইয়াছে ইহা কেন না বলিব? গণৎকার অবশ্য তখন ভগবানের প্রত্যাদেশলাভে বুঝিতে পারে নাই [illegible]তেই শিশু কালে এইরূপ বড়লোক হইবে, সুতরাং ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বে [illegible] তাহা বলিয়া দেওয়া যায় এবং কালক্রমে যদি তাহা সত্য হয়, তবে তাহা সত্য বলিব না কেন?

সংসারে সর্ব্ববিষয়েই প্রত্যক্ষ দৃষ্টি করিয়া বিশ্বাস অসম্ভব; তাহা হইলে অনেক দেশের অনেক বিষয়ই অবিশ্বাস করিতে হয়; যে বৈজ্ঞানিক নিজ প্রত্যক্ষ দৃষ্টি ব্যতীত আর কিছুই বিশ্বাস করিতে চাহেন না, তাঁহার পক্ষে বিচার্য্য বিষয়ের সম্বন্ধে গভীর গবেষণা, অনুসন্ধান ও নানাপ্রকার পরীক্ষা করা প্রথমে আবশ্যক; যদি বিচার্য্যশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উপদিষ্টরূপে পরীক্ষা দ্বারাও ফল না পাওয়া যায়, তখন তাঁহার অবিশ্বাসের হেতু উপস্থিত হইতে পারে, তৎপূর্ব্বে নহে।

ফলিত জ্যোতিষসম্বন্ধে রামেন্দ্রবাবু তাহা করিয়াছেন কি না, আমি জানি না, তবে অনেকেই যে অনেক বিষয়ে প্রবেশ না করিয়া উপর উপর মত দেন, তাহা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি এবং অভিজ্ঞ রামেন্দ্রবাবুও যে জ্ঞাত না আছেন তাহা নহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি জ্যোতিষশাস্ত্রে অভিজ্ঞ নহি, সে বিষয়ের বিশেষ কিছু জানিও না, সুতরাং সত্য বা অসত্য কিছুই বলিতে পারি না; কিন্তু রীতিমত গণনা হইলে যে অনেক সময় আশ্চর্য্য ফল দেখা যায়, তাহা

নিজেও প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং অনেক বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিয়াছি। এ বিষয়ের পক্ষে যে যুক্তি আমার সাধারণ জ্ঞানে সঙ্গত বোধ করিয়াছি, তাহারই কতক কতক নিবেদন করিলাম।

কলিকাতায় শ্রীযুক্ত রমণকৃষ্ণ, শ্রীযুক্ত হরিমোহন, শ্রীযুক্ত তারিণী-প্রসাদ প্রভৃতি অনেক কৃতবিদ্য, সুপণ্ডিত ফলিত জ্যোতিষী আছেন, মান্দ্রাজ প্রভৃতি দেশেও ঐ শাস্ত্রের ভাল ভাল পণ্ডিত আছেন, তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া এ বিষয়ের প্রমাণের অনুরোধ করিলে সুখের বিষয় হয়। আমাদের দেশের কৃতবিদ্যগণ চেষ্টা করিলে কি তাহা হয় না? তাঁহারা আসিয়া করকোষ্ঠী বিচার পূর্ব্বক ফলিত জ্যোতিষের সত্যতা প্রমাণ করুন, জাত বালকের কোষ্ঠী-প্রস্তুত করিয়া দিয়া তাহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে দায়ী হউন, তাহা হইলে আমরা অজ্ঞেরা বুঝিতে পারি, বিজ্ঞেরাও বুঝিতে পারেন, নতুবা এরূপ মেঘের আড়ালে থাকিয়া বাণবর্ষণ করিলে উভয় পক্ষের বাণকাটা-কাটি ভিন্ন অন্য কোন লাভ হইবে বলিয়া আমরা বিবেচনা করি না। আমাদের কৃতবিদ্য দেশীয় ভ্রাতৃগণ আমার এই নিবেদনের বিষয় একবার বিবেচনা করিলে কৃতার্থ হইব।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

সৌন্দর্য্য।

মর জগতে সৌন্দর্য্যের ক্ষমতা অসীম। যাহা সুন্দর কি জানি কেন, ইচ্ছা না থাকিলেও, হৃদয়ের উপর তাহা অতি আশ্চর্য্যরূপে কার্য্য করিয়া থাকে। তুমি পলিতকেশ বৃদ্ধ হও, তোমারও চিত্ত সুন্দর দেখিলে ছুটিয়া যাইবে; আবার সুকুমার শিশু হও, তুমিও সুন্দর বস্তু দেখিলে কি এক অদ্ভুত শক্তিবলে সেই দিকে হস্ত প্রসারণ করিবে। সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা মনুষ্য-হৃদয়ের একটি স্বাভাবিক ধর্ম্ম। [illegible] মনুষ্য যাহা কিছু সুন্দর দেখিতে পায়, তাহারই অনুকরণ করে এবং বাহ্য জগতে যাহা নাই, এরূপ বস্তু সকলও কল্পনা দ্বারা গঠন করিয়া বিধাতার সৃষ্টি রাজ্যকেও হা'র মানাইয়া

দিতে চেষ্টা করে। ইংরাজী ভাষায় যাহাকে "Fine Arts" কহে, তাহা মনুষ্য-হৃদয়ের এইরূপ সৌন্দর্য্য-প্রিয়তারই ফল। সভ্যতার সোপানে যে জাতি যত উঠিয়াছে, সৌন্দর্য্য প্রিয়তা সেই জাতিরই তত অধিক। তাই সভ্য জাতির বাস-ভবন, তাহাদিগের পরিচ্ছদ, তাহাদিগের যানবাহন, তাহাদিগের বৃক্ষ-বাটিকা এবং পুষ্পকানন এমন কি, তাহাদিগের অতি ক্ষুদ্র এবং সামান্য প্রত্যেক বস্তুতেই এই সৌন্দর্য্য-প্রিয়তার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়! এমন কি অনেক সময়ে এই সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা একটী উৎকট ব্যাধি-স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। এই সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা মনুষ্যের হৃদয়ে অনেক সময়ে অতি আশ্চর্য্যরূপে কার্য্য করিয়া থাকে, যাঁহারা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া চিরকাল কঠোরতার ক্রোড়ে লালিত হইয়া চিত্তের কোমল অংশটুকুর প্রায় বিলোপ সাধন করিয়াছেন এবং নরশোণিতে পৃথিবী রঞ্জিত করিয়া আপনাদিগের কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও সৌন্দর্য্যের মোহিনী শক্তির প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। আবার যাঁহারা পৃথিবীতে আপনার স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া আপনার সুখ দুঃখের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না করিয়া, পরহিতব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, এবং পরার্থে জীবন পর্য্যন্ত সংকল্প করিয়াছেন, তাঁহারাও অনেক সময়ে জীবনের মহামন্ত্র ভুলিয়া বাহ্য সৌন্দর্য্যের সেবায় রত হইয়াছেন।

মনুষ্য হৃদয়ের উপর যাহার এতদূর আধিপত্য, তাহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনায় উপকার দর্শিতে পারে।

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের প্রতি পদার্থে এবং পদার্থের প্রতি পরমাণুতে একটা অব্যক্ত অথচ মনোমুগ্ধকর ভাবের বিকাশ দেখিতে পাই। ভাষার সাগর মন্থন করিয়া হৃদয়ের অতি গুপ্ত স্থানগুলি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া এই অব্যক্ত ভাবটির যথাযথ নামকরণ করা দুর্ঘট বলিয়া বিবেচনা করি। যাঁহারা দ্রব্যের নামকরণ করিয়াছেন, বোধ হয় এই ভাবটিকেই তাঁহারা সৌন্দর্য্য নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণতঃ সৌন্দর্য্য বলিলে যাহা বুঝা যায়, তাহা এই ভাবটি ব্যক্ত করিতে সক্ষম কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ করি।

যাহারা মনোবিজ্ঞানবিৎ তাঁহারা বলিবেন, কতকগুলি সম্বন্ধরহিত বস্তুর একত্র সমবায় দ্বারা যে সামঞ্জস্যের উৎপত্তি হয়, তাহারই নাম সৌন্দর্য্য। বহু পদার্থের মধ্যে একতা স্থাপনেই সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি (Unity in

plurality)। তাহা হইতে পারে, কিন্তু এই plurality র মধ্যে unity স্থাপিত হয় কিসে? সৌন্দর্য্য অবশ্যই অনুভবের বিষয়। অনুভব বলিলে আমরা স্বতঃই দুইটি পদার্থের অস্তিত্ব বুঝিয়া লই—একজন দ্রষ্টা এবং আর একটি দৃশ্য পদার্থ। সুতরাং সৌন্দর্য্য, এই দ্রষ্টা এবং দৃশ্য পদার্থের মধ্যে সম্বন্ধ-জনিত কোন ভাব বিশেষ। ইহার পর স্বতঃই এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, তবে সৌন্দর্য্যের আধার কোথায়—বাহ্য পদার্থে অথবা হৃদয়াভ্যন্তরে। বাহ্য পদার্থ সৌন্দর্য্যের আধার হইতে পারে না, ইহা সহজেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। তুমি যে বস্তুকে অতি সুন্দর বলিয়া মনে কর, হয়ত আমি তাহাতে সৌন্দর্য্যের কোনই লক্ষণ দেখিতে পাই না, আবার আমার চক্ষে যাহা সুন্দর, হয়ত তুমি তাহা অতি কুৎসিত বলিয়া মনে কর। বাড়ী ঘর গাছ পালা প্রভৃতির ন্যায় যদি সৌন্দর্য্যও কেবল একটি বাহ্য বস্তু হইত, তাহা হইলে সুন্দর ও কুৎসিত লইয়া এত মতভেদ, বাদানুবাদ সম্ভব হইত না। কলিকাতার মনুমেণ্ট কঠিন ইষ্টক-নির্ম্মিত, এ বিষয়ে বিকৃত বুদ্ধি ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাহারও সহিত মতদ্বৈধ হইতে পারে কি? তাই বলি সৌন্দর্য্যের আধার বাহ্য জগতে নহে, অন্তর্জগতে এবং এই কারণেই সৌন্দর্য্য লইয়া এত মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। বিধাতার সৃষ্টি বৈষম্যে পরিপূর্ণ, মনুষ্য-প্রকৃতিতে এই বৈষম্যের বোধ হয় পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কোটী কোটী মনুষ্যের মধ্যে অবিকল একরূপ প্রকৃতি-বিশিষ্ট দুইটি মনুষ্য বোধ হয় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই প্রকৃতিগত বৈষম্যই সৌন্দর্য্যে এইরূপ মতভেদের কারণ। মোটামুটি দেখিতে পাওয়া যায়, যিনি সাত্ত্বিক প্রকৃতিবিশিষ্ট, তিনি শান্ত, শুদ্ধ রূপ ভালবাসেন। যে রূপে উগ্রতা নাই, যে লাবণ্যে নয়ন ঝলসিয়া যায় না, যে মূর্ত্তির আবির্ভাবে হৃদয় এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে পূরিয়া উঠে—তিনি সেই রূপ ভালবাসেন। আর যিনি তামসিক প্রকৃতি-বিশিষ্ট, তিনি উগ্রমূর্ত্তির সেবক। যেখানে উগ্রতা, যেখানে রূপের বিভীষিকায় হৃদয় [illegible] স্তম্ভিত হয়, তামসিকের নিকট তাহাই প্রিয়। তিনি সেই রূপই সৌন্দর্য্যময় দেখেন।

প্রকৃতিগত বৈষম্য ব্যতীত, অন্য অনেক কারণেই সৌন্দর্য্য লইয়া মতভেদ ঘটিয়া থাকে। শিক্ষা, সংসর্গ, দেশ, কাল ইত্যাদি ভেদেও সৌন্দর্য্যে

মতভেদ ঘটিয়া থাকে। তুমি আমি যাহাকে সুন্দর মনে করি, হয়ত সুদূর ইংলণ্ডবাসী তাহাকে অতি কুৎসিত বিবেচনা করেন, আবার তিনি যাহাকে সুন্দর বলিয়া থাকেন, তুমি আমি তাহাতে সৌন্দর্য্যের কোন লক্ষণই দেখিতে পাই না। ইহা ব্যতীত সৌন্দর্য্যে মতভেদের আর একটি কারণ, সুখ দুঃখ। মনুষ্য-হৃদয় যখন সুখের সাগরে ভাসিতে থাকে, তখন পৃথিবীকেই সৌন্দর্য্যময় দেখে, আবার যখন দুঃখের সাগরে হাবুডুবু খাইয়া চিত্ত অস্থির হয়, তখন পৃথিবীর সকল পদার্থই যেন একটা অতি কুৎসিত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে।

তাই বলি, সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি মনুষ্য-হৃদয়। যত কিছু সুন্দর, যত কিছু কুৎসিত বস্তু সংসারে আছে বলিয়া, আমাদিগের প্রতীতি জন্মিয়া থাকে, তৎসমুদয়েরই সৃষ্টি এবং স্থিতি এই মনুষ্য-হৃদয়ে। মনুষ্য-হৃদয় সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি বলিয়া মনুষ্য-হৃদয়ের যেটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি, তাহার সহিত সৌন্দর্য্যের অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। সেটি প্রেম অথবা ভালবাসা। হৃদয় যাহা চাহে—যাহা প্রাপ্ত হইলে হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হয়, প্রাণের চক্ষে তাহাই সুন্দর। আবার যাহা সুন্দর, হৃদয় অনিচ্ছা সত্বেও তাহাতে আকৃষ্ট হয়, অলক্ষিতে তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলে। যাহা মনোমুগ্ধকর এবং হৃদয়ের প্রীতিকর, তাহাই সুন্দর এবং মনুষ্যহৃদয় তাহাতেই আকৃষ্ট হয়, সুতরাং তাহাই ভালবাসে। সেই জন্যই সৌন্দর্য্যের সহিত ভালবাসা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেখানে সৌন্দর্য্যের সমাবেশ, জানি না কেন, হৃদয় স্বভাবতঃই সেখানে আকৃষ্ট হয়, আবার যেখানে ভালবাসার স্ফূর্ত্তি, কি জানি, কি এক নিগূঢ় কারণ বশতঃ, সেখানে সকলই পরম সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। এক হৃদয়ের সহিত অন্য হৃদয়ের মিলনের নামই ভালবাসা অথবা এইরূপ মিলনেই ভালবাসার উৎপত্তি। নতুবা বাহ্য সৌন্দর্য্যের মোহবশতঃ যে ভালবাসার উৎপত্তি, তাহাকে প্রকৃত ভালবাসা বলিতে পারি না, তাহা একটা অপকৃষ্ট বৃত্তিমাত্র। বাহ্য সৌন্দর্য্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উপাদান বৈ আর কিছুই নয়। সুতরাং বাহ্যেন্দ্রিয় সকলের সেবাই, যে ভালবাসার চরমফল, তাহা একটা অতি তুচ্ছ বৃত্তি বৈ আর কি হইতে পারে? এবং এই প্রকার বাহ্যেন্দ্রিয়-সেবার উপাদানমাত্র যে সৌন্দর্য্য, তাহাও অতি তুচ্ছ পদার্থ। যে সৌন্দর্য্য হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়া হৃদয় উদ্বেলিত করিতে

পারে না, যাহার অব্যক্ত শক্তিবলে হৃদয়ে স্বর্গীয় আনন্দের সঞ্চার হয় না, যাহার অনুভূতিমাত্র প্রাণে এক অব্যক্ত ভাবে পূরিয়া উঠে না, বাহেন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়াই যাহা বিলয় প্রাপ্ত হয়,—সে সৌন্দর্য্যের পূজা জগৎ হইতে উঠাইয়া দাও, জগতের কোন ক্ষতি হইবে না। আর কবি অন্তরালে বসিয়া প্রকৃতির প্রতি কার্য্যে প্রতি বস্তুতে যে সৌন্দর্য্যের খেলা দেখিতেছেন, যে সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে এক এক বার হৃদয়ে আনন্দের জোয়ার আসিয়া সৌন্দর্য্যরাশিকে কবিতা-স্রোতে পরিণত করিয়া থাকে, দার্শনিক যে সৌন্দর্য্যের লীলা দেখিয়া আপন ভাবে আপনি বিভোর হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় শান্তিরস পান করিয়া থাকেন, যে সৌন্দর্য্য প্রতিনিয়ত সাধকের হৃদয়ে উদ্‌ভাসিত হইয়া তাঁহার চিত্তকে পরম সুন্দর সেই জ্যোতির্ম্ময়ের নিকট লইয়া যাইতেছে,—সে সৌন্দর্য্য এক স্বতন্ত্র পদার্থ। তাহার পূজা জগতে বাড়িতে থাকুক, জগতের মঙ্গল হইবে। এ সৌন্দর্য্যে পাপের আবিলতা নাই, উপভোগ-জনিত ক্লান্তি বা বিতৃষ্ণা নাই, বাহ্য চাকচিক্যের সম্মোহন নাই। ইহাতে হৃদয় নির্ম্মল ও চিত্ত শুদ্ধ হইয়া প্রাণ এক অভিনব ভাবে পূর্ণ হয়। এ সংসারে যে সকল ব্যক্তি চিরকাল কেবল মস্তিষ্কের পরিচালনা করিয়া হৃদয়ের কোমল প্রবৃত্তিগুলি উন্মূলিত করিয়া আপনাদিগকে জ্ঞানী এবং পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন, তাঁহারা হয়ত, এ সৌন্দর্য্যের কথায় উপহাস করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা মস্তিষ্কের সঙ্গে সঙ্গে নিজ হৃদয়কেও উপযুক্তরূপে সমুন্নত করিয়াছেন, যাঁহাদিগের ভালবাসা শুধু নিজ হৃদয়ে আবদ্ধ না হইয়া, সমস্ত জীব-জগতে ছড়াইয়া পড়ে, তাঁহারাই এ সৌন্দর্য্যের স্বাদ গ্রহণ করিতে সক্ষম। তাঁহারাই এ সৌন্দর্য্যের প্রকৃত উপাসক। এইরূপ হৃদয়বান ব্যক্তি এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডময় একটা বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্য্যের খেলা দেখিতে পান। তাই তাঁহার নিকট এই বিশ্বের যিনি স্রষ্টা, তিনি নির্গুণ নিরাকার রূপে আবির্ভূত হইতে পারেন না। তিনি আপনার মনোমত একটি সৌন্দর্য্যময় রূপ কল্পনা করিয়া, আপনার প্রাণের দেবতাকে সেইরূপেই চিন্তা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শিক্ষাভেদে, সংসর্গভেদে, প্রকৃতিভেদে মনুষ্যের সৌন্দর্য্যের আদর্শ বিষয়েও বৈলক্ষণ ঘটিয়া থাকে। এই কারণে তুমি যাহা পরম সুন্দর মনে করিয়া থাক, আমি

সে রূপ গ্রাহ্য করি না, আবার যাহা আমার চক্ষে সৌন্দর্য্যের আদর্শ বলিয়া বোধ হয়, তুমি তাহা অতি বীভৎস রূপ বলিয়া বিবেচনা কর। এই জন্য এই বিশ্বের নিয়ন্তাকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি, ভিন্ন ভিন্ন আকারবিশিষ্ট বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে। তাই ভগবানের অসংখ্য রূপ, তাই হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতা। কিন্তু যিনি যে আকারেই চিন্তা করুন না কেন, সকলেই সেই এক এবং অদ্বিতীয় পরম পুরুষকেই চিন্তা করিয়া থাকেন; এবং যিনি যে রূপে ভগবানকে চিন্তা করিয়া থাকেন, তিনি সেই রূপেই তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া থাকেন। ভক্তের নিকট ভগবান সর্ব্বদা বিক্রীত। ভক্তের অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য, তিনি ভক্তকল্পিত রূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তাই ভক্ত-চূড়ামণি অর্জ্জুন যখন ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া ভীত স্তম্ভিত হৃদয়ে করজোড়ে সেই "কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তম্" ইত্যাদি রূপে দর্শন কামনা করিলেন, তখন ভগবান তাঁহার ভক্তের মনোমত—"সৌম্য মনুষ্যরূপে" আবির্ভূত হইয়া বলিলেন :—

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবং বিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি যন্মম॥
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যো অহমেবং বিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ॥

ইহা ভগবদ্‌বাক্য। ভগবদ্‌বাক্যে যাঁহাদিগের আস্থা আছে, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন, ভালবাসার শক্তি অতি অপরিসীম,—ভক্তির ক্ষমতা অতি আশ্চর্য্য।

কেন এরূপ হয়? ভালবাসার সহিত সৌন্দর্য্যের এত ঘনিষ্ঠতা কেন? যেখানে ভালবাসা সেইখানেই সৌন্দর্য্য, আবার যেখানে সৌন্দর্য্যের সমাবেশ, সেইখানেই চিত্তাকর্ষণ হয় কেন? জগতে সৌন্দর্য্যের উপাসনা সর্ব্বত্র দেখিতে পাই কেন? শুভ্র জ্যোৎস্না-বিধৌত রজনীতে প্রকৃতির শোভা দর্শন করিয়া, কবির হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের সঞ্চার হয় কেন? অসীম অনন্ত জলরাশিতে অসংখ্য ঊর্ম্মিমালার বিচিত্র খেলা দেখিতে দেখিতে শান্ত হৃদয়েও তরঙ্গ উঠে কেন? পর্ব্বতের অভ্রভেদী চূড়ার সম্মুখীন হইলে মন স্তম্ভিত হয় কেন? সুমধুর কণ্ঠ-নিঃসৃত স্বর্গীয় সঙ্গীত শুনিলে মন

ছুটিয়া যায় কেন? ভাবুকের চক্ষুঃ প্রকৃতির স্তরে স্তরে কি এক অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে করিতে বাষ্পাকুল হইয়া উঠে কেন?

কেমন করিয়া বলিব—কেন? যিনি মনুষ্যকে হৃদয় দিয়াছেন এবং বিচিত্র সুন্দর পদার্থে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পুরিয়া রাখিয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন—কেন? যিনি আকাশে পূর্ণচন্দ্র দিয়াছেন এবং চন্দ্রে স্নিগ্ধোজ্জ্বল কমনীয়তা দিয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন—কেন? যিনি বৃক্ষে পুষ্প দিয়াছেন এবং পুষ্প সকল সৌগন্ধে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন—কেন? যিনি ধরাতলে শৈলশ্রেণী দিয়াছেন এবং শৈলশ্রেণীতে উচ্চতা দিয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন—কেন। যিনি পৃথিবীতে স্রোতস্বতী দিয়াছেন এবং তাহার কলনাদে অপূর্ব্ব মাধুর্য্য দিয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন—কেন।

বিধাতার কি এক অপূর্ব্ব নিয়মবশে হৃদয়ের সহিত হৃদয় মিলিলে বড়ই আনন্দ হয়। তাই মনুষ্য-হৃদয় স্বতঃই মনুষ্য-হৃদয়াকাঙ্ক্ষী। তাই প্রেম ভালবাসা ইত্যাদি বৃত্তিগুলির মনুষ্য-হৃদয়ে এত উচ্চ স্থান। যেখানে এক হৃদয় অন্য হৃদয়ের সহিত মিলিয়াছে, যেখানে একে অপরকে সুন্দর দেখে। বলিয়াছি ভালবাসার সহিত সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের মিলনের নামই ভালবাসা। তাই তোমার হৃদয়ের সহিত আমার হৃদয়ের মিলন অসম্ভব হইলে, তুমি অপরের চক্ষে অতি সুন্দর হইলেও, আমার নিকট তোমার ও সৌন্দর্য্য স্থান পায় না। তাই যেখানে ভালবাসা নাই, সেখানে হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের মিলন নাই, সুতরাং সেখানে সৌন্দর্য্যের বিকাশ নাই।

এই বিশ্ব-জগতের যিনি মহাপ্রাণ, যে মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া বিশ্বচরাচর নিয়ত ঘুরিতেছে, যাঁহা হইতে এ জগতের উৎপত্তি, যাঁহাতে জগৎ স্থিত এবং যাঁহাতে এই জগৎ লয় প্রাপ্ত হয়, তাঁহারই বিচিত্র কৌশলগুণে অনন্ত বিশ্বস্থিত পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব-সম্পন্ন অসংখ্য পদার্থের মধ্যে এক অব্যক্ত সামঞ্জস্য রহিয়াছে। বাহ্য দৃষ্টিতে যাহাকে জড় প্রকৃতি বলিয়া থাকি, বাস্তবিক তাহা এই মহাপ্রাণের আবরণমাত্র। এই অব্যক্ত সামঞ্জস্যের অপর নাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য। এই বিশ্বনিহিত অনন্ত হৃদয়ের সহিত মানবের সান্ত হৃদয় একই সূত্রে গাঁথা, তাই মনুষ্য বাহ্য সৌন্দর্য্য

উপলব্ধি করিতে পারে। মনুষ্য-হৃদয়ের তন্ত্রীগুলি বাহ্য জগতের তন্ত্রীর সহিত একই সুরে বাঁধা। হৃদয়ের তারগুলি যতক্ষণ বাহ্য জগতের তন্ত্রী-গুলির সহিত একই সুরে বাঁধা থাকে, ততক্ষণই মনুষ্য সৌন্দর্য্যের আস্বাদ লাভ করিতে পারে। যাঁহার হৃদয়ের তার] ছিঁড়িয়াছে, সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়াছে, তাহার হৃদয় কেবলই বেসুরা বকিতে থাকে, প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্য সে হৃদয়ে স্থান পায় না। যাঁহারা এই অনন্ত সৌন্দর্য্যের সেবক, তাঁহারাই প্রকৃত হৃদয়বান এবং তাঁহারাই প্রকৃত সুখী। জগতে তাঁহারা কিছুই কুৎসিত দেখেন না। সকলই তাঁহাদের চক্ষে সুন্দর,—সুতরাং তাঁহারা সর্ব্বদাই আনন্দময়। এই বিশ্ব-নিহিত মহাপ্রাণের সহিত তাঁহাদিগের প্রাণ একই সূত্রে গাঁথা। সুতরাং তাঁহারা বিশ্বকে সৌন্দর্য্যময় দেখেন।

সংসারের আবর্ত্তে পড়িয়া নানা কারণে আমরা এই ঐক্যতা ঠিক রাখিতে পারি না। তাই আমাদিগের জীবন এত দুঃখময়। যিনি হৃদয় শাসিত করিয়াছেন, অনন্তের সহিত সান্তের সামঞ্জস্য যিনি রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, তিনি দুঃখের হাত এড়াইয়াছেন। সংসারের চুবানি খাইয়া আর ক্লেশ পাইতে হয় না। তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া সর্ব্বদা এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দরস পান করিতে থাকেন। গ্রীক দার্শনিক-গণের মধ্যে যে "গোলক সঙ্গীতের" উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, সে সঙ্গীত এই প্রকার ব্যক্তির কর্ণেই ধ্বনিত হইয়া থাকে। সংসারাবর্ত্তে পড়িয়া যাহার হৃদয়ের সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়াছে, তিনি সে সঙ্গীত শুনিতে পান না। যিনি প্রকৃত কবি, তিনিই এ সঙ্গীতের মর্ম্মগ্রাহী, তাই তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদাই আনন্দময়। প্রকৃত কবি সংসারে অতি দুর্লভ। ইহারা জগতে সকলেরই পূজ্য। সংসারে যদি শান্তি চাও, প্রাণে যদি আরাম চাও, কবির ন্যায় হৃদয়কে গঠিত কর। অভ্যাস দ্বারা সিদ্ধ হইবে। সাধনায় সকলই সম্ভব, হৃদয় গঠিত হইবে না? প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা প্রভৃতি বৃত্তিগুলির স্ফুরণ কর। আপনার হৃদয়াভ্যন্তরে ঐ গুলিকে আবদ্ধ না রাখিয়া সমগ্র জীব-জগতে বিস্তার করিতে শিখ। হৃদয়ের সহিত হৃদয় মিলাইতে শিখ। হৃদয় ক্রমে প্রশস্ততা লাভ করিয়া যখন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে ভালবাসিতে শিখিবে, যখন প্রেমের [illegible] হৃদয় সদাই নাচিতে থাকিবে, বিধাতার সৃষ্ট পদার্থে কু ও

তু লইয়া যখন বৃথা বিতণ্ডা করিতে প্রবৃত্তি হইবে না, তখন বিশ্বময় এক অসীম অনন্ত সৌন্দর্য্যের খেলা দেখিতে পাইবে, আর সেই অসীম অনন্ত সৌন্দর্য্যের খেলা দেখিতে দেখিতে এক এক বার হৃদয়ে ভাবের জোয়ার আসিয়া নয়নে ধারা বহিবে—তখনই বুঝিবে সাধনা সফল হইয়াছে, তখনই বুঝিবে দুঃখের অপ্রতিহত গতি তোমার সম্মুখে আর দাঁড়াইতে পারিবে না। তাই যদি দুঃখের হাত এড়াইতে চাও, হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিও। সৌন্দর্য্যের পূজা করিও। সৌন্দর্য্যের সাধনায় সিদ্ধ হইলে জীবন সুখময় হইবে।

শ্রীযোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

জাহাঙ্গীরের অনুশাসন।*

জাহাঙ্গীর বাদশাহ মোগল সাম্রাজ্যের সুশাসন জন্য কতিপয় অনুশাসন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন; তজ্জন্য তিনি তৎকালীন মুসলমান সমাজে একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিশারদ বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন। আমরা বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে তাঁহার অনুশাসনগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়া জাহাঙ্গীর বাদশাহ নিজে তাহাদের কিরূপ মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা প্রদর্শন করিব।

প্রথম অনুশাসন।

"আমি তমঘা ও মিরবারি নামক শুল্ক গ্রহণের প্রথা রহিত করিয়াছি। সুভা ও সরকারের জায়গীরদারগণ আপনাদের স্বার্থের জন্য নানারূপ কর সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাও আমি তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছি।"

তদীয় পিতা আকবরও তমঘা এবং মিরবারি নামক শুল্ক গ্রহণ না করার জন্য কঠোর নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন। বাদশাহগণ

* Elliot's History of India. Vol. VI.

পুনঃ পুনঃ একই প্রকার অনুশাসন প্রচার করিয়াছেন; ইহাতে ইহাই প্রকাশ পায় যে, প্রথমে যিনি ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন; তিনি স্বপ্রণীত নিয়ম কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই, অথবা তাঁহার পরবর্ত্তী বাদশাহগণ পূর্ব্বপুরুষের যশোপ্রভা ম্লান করিয়া আত্মগৌরব বর্দ্ধন করিতে যত্নশীল হইয়াছিলেন। বাবর ও আকবরের ন্যায় প্রবল প্রতাপান্বিত শাসনকর্ত্তার সময়েই যদি তাঁহাদের কৃত অনুশাসন প্রতিপালিত না হইয়া থাকে, তবে দুর্ব্বলচিত্ত জাহাঙ্গীর যে সিদ্ধকাম হইয়াছেন, তাহা সম্ভবপর নহে।

দ্বিতীয় অনুশাসন।

"দস্যুসঙ্কুল পথপার্শ্বের নির্জ্জনাংশে সরাই ও মসজিদ নির্ম্মাণ করিতে আমি আদেশ করিয়াছি। জায়গীর ভূমির অন্তর্গত সরাই ও মসজিদ জায়গীরদারের ব্যয়ে নির্ম্মিত হইবার ও খালেসা ভূমির সরাই ও মসজিদ নির্ম্মাণের ব্যয়ভার রাজকোষ হইতেই বহন করার আদেশ ছিল।"

জাহাঙ্গীরের সিংহাসনে আরোহণের বহু পূর্ব্ব হইতেই রাজপথপার্শ্বে সরাই ও মসজিদ নির্ম্মাণ করার প্রথা প্রচলিত ছিল। সেরশাহ ও তদীয় পুত্র সেলিম শাহের রাজত্বকালেই বহুসংখ্যক সরাই ও মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যবর্ত্তী দূরত্ব, জাহাঙ্গীর যত দূরে দূরে সরাই ও মসজিদ নির্ম্মাণ করিতে কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা অল্প ছিল বলিয়াই অনুমিত হয়। *

এই সময় রাজপথ সর্ব্বদা দস্যুসম্প্রদায়-কর্ত্তৃক পরিবৃত থাকিত। পুরচন্দ্রের ভ্রমণ বৃত্তান্ত নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, দস্যুভয়ে কেহ

---

* Salim Shah in the beginning of his reign issued orders that as the sarais of Sher Shah were two miles distant from one another, one of similar form should be built between them for the convenience of the public; and that a mosque and resorvior should be attached to them, and that Vessels of water and of Victuals, cooked and uncooked should be always kept in readiness for Hindu as well as Mahamedan travellers. *Tarikh-i Baudini.*

রক্ষকশূন্য হইয়া ঘরের বাহির হইতে পারিত না। সার্ টমাস রো আপন ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, নিরাপদে ভ্রমণের বন্দোবস্ত করার জন্য তাঁহাকে সময় সময় কালবিলম্ব করিতে হইয়াছে। কাম্বে হইতে সুরাট ত্রিশ ক্রোশ পথ; এই পথে সর্ব্বদা লোক যাতায়াত করিত; এ পথেও পথিকগণ সর্ব্বদা দস্যুগণ-কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও সর্ব্বস্ব হৃত হইত। এমন কি আগ্রা, লাহোরের প্রসিদ্ধ পথেও দস্যুর অভাব ছিল না। জন ব্রোথার ও রিচার্ডষ্টিল নামক পরিব্রাজকদ্বয় বলিয়াছেন যে, এই পথ রাত্রিকালে দস্যুসমাগমে পূর্ণ হইত, কিন্তু দিবাভাগে তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যাইত না। সেকালে রাজপথ-পার্শ্বে সরাই অবস্থিত না থাকিলে পর্য্যটন অথবা বাণিজ্য অচল হইয়া পড়িত। টেরীনামক একজন বৈদেশিক পর্য্যাটক নির্দ্দেশ করিয়াছিল যে, জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ভ্রমণকারিগণের বাস জন্য পান্থশালার একান্ত অভাব ছিল; কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ নগরে তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য সরাই নামক সুদৃশ্য প্রাসাদমালা দৃষ্টিগোচর হইত। ধনশালী হিন্দুগণ আপনাদের ধনের কিয়দংশ রাজপথ-পার্শ্বে সরাই নির্ম্মাণ ও কূপ খননে ব্যয় করিয়া দানশীলতার পরিচয় প্রদান করিতেন। অতএব ভ্রমণকারিগণের আশ্রয় জন্য যে সকল সরাই নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাতে রাজকোষের অর্থ কতদূর কার্য্যকরী ছিল, তাহা নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে।

তৃতীয় অনুশাসন।

"মালিকের বিনা অনুমতিতে কোন ব্যক্তিই পথপার্শ্বস্থ পণ্য দ্রব্যের ভার খুলিতে পারিবেক না। কোন রাজপুরুষ মৃত মুসলমান অথবা হিন্দুর সম্পত্তি দাবী করিতে পারিবেক না। তাহার উত্তরাধিকারীই পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবে। যদি কাহারও উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান না থাকে, তবে নির্দ্দিষ্ট রাজকর্ম্মচারিগণ তাহার সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিবে এবং তাহার আয় সরাই নির্ম্মাণ, সেতুসংস্কার ও পুষ্করিণী খননে ব্যয়িত হইবে।"

উত্তরাধিকারিগণের সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবার আদেশ তৈমুর লঙ্গের অনুশাসনের পুনরুক্তিমাত্র। আকবর বাদশাহ ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নিয়মের প্রচার করিয়াছিলেন। "Let him look after the effects of deceased

persons, and give them up to the relations or heirs of such, but if there be none to claim the property let him place it in security, sending at the same time an account of such to court, so that when the true heir appears he may obtain the same. In fine, let him act conscientiously and virtuously in this matter, lest it should be the same here as in the kingdom of Constantinople.”

আমীরগণ পরলোক গমন করিলে, তাঁহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি রাজকোষে গ্রহণ করাই মোগল বাদশাহগণের সাধারণ নিয়ম ছিল; মৃত ব্যক্তির সন্তানগণ বাদশাহের ইচ্ছামত পৈতৃকধনের কিয়দংশমাত্র প্রাপ্ত হইতেন, বাদশাহগণ সচরাচর তাঁহাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিতেন। †

জাহাঙ্গীর বাদশাহ স্বরচিত জীবন বৃত্তের একস্থানে উল্লেখ করিয়াছিল যে, আকবরের খোজাপ্রধান দৌলত খাঁ অসদোপায়ে অতুল ধনের অধিকারী হইয়াছিল, তাহার মৃত্যুর পর আকবর তৎসমুদয় বাজেয়াপ্ত করিয়া, রাজকোষ স্ফীত করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু তজকিরত-উল-উমরা নামক ইতিহাস গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, এই ব্যক্তি জাহাঙ্গীরের সিংহাসন আরোহণের সপ্তমবর্ষে কালগ্রাসে পতিত হন। অতএব তাহার বিপুল ধনরাশি পিতার পরিবর্তে পুত্রের হস্তগত হইয়াছিল বলিয়াই অনুমান করা যাইতে পারে। জাহাঙ্গীর বাদশাহের দরবারে সমাগত সার টমাস রো লিখিয়াছেন যে, কোন প্রজাই উত্তরাধিকার সূত্রে ভূমি দখল করিতে পারিত না; রাজার ইচ্ছার উপরেই সমস্ত নির্ভর করিত; এজন্য বহুসংখ্যক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি যত্র আয় তত্র ব্যয় করিতেন। বণিকগণ সযত্নে আপনাদের ধন সংগোপন করিয়া রাখিতেন। বাদশাহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সন্তানবর্গের ভরনপোষণ জন্য সামান্য ভাবে বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন; রাজানুগ্রহ লাভ করিতে না পারিলে তাহাদের অবস্থা উন্নতির কোন উপায় থাকিত না। বন্দর সমূহে যথেচ্ছাচার পূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। এমন কি যদিচ সার টমাস

one
should

Victual * Gladwin's Ain-Akbari.

ness for Hindu as† ...ve by W. Hawkins in Purchas's pilgrims.

রো পরম সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন, তথাপি বন্দররক্ষক বলপূর্ব্বক তাঁহার দ্রব্য তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাহার কিয়দংশ আত্মসাৎ করিতে বিরত হয় নাই।

চতুর্থ অনুশাসন।

"কেহ মদ অথবা অন্য প্রকার মাদক দ্রব্য প্রস্তুত অথবা বিক্রয় করিতে পারিবে না।"

জাহাঙ্গীর স্বয়ং আজীবন আকণ্ঠপূর্ণ করিয়া মদ্য পান করিতেন। সমস্ত সভাসদের সম্মুখেও মদ্য পান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। জাহাঙ্গীর বাদশাহ খ্রীষ্টধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন। ইতিহাসবেত্তা কাত্রু নির্দ্দেশ করিয়াছিল যে, মদ্যপান ও সর্ব্বপ্রকার মাংস আহার সম্বন্ধে খ্রীষ্ট-শাস্ত্রে কোন প্রকার প্রতিষেধক বিধি না থাকাতেই বাদশাহ তাদৃশ পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর কখনও বা মদের আড্ডায় গমন করিয়া ইতর জাতীয় লোকের সঙ্গে মিলিত হইয়া আমোদ প্রমোদে মত্ত হইতেন। সার টমাস রো লিখিয়াছিল যে, চেপছাইডের সমস্ত মণি মাণিক্য অপেক্ষা ৪।৫ বাক্স লাল মদ জাহাঙ্গীর অধিকতর মূল্যবান বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। জাহাঙ্গীর চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে অহিফেন সেবন পরিত্যাগ করেন। তৎপূর্ব্বে তিনি নিয়ত অহিফেন সেবন করিতেন। অনুশাসন কর্ত্তা নিজেই স্বকৃত নিয়ম ভঙ্গে অগ্রগণ্য ছিলেন, এ অবস্থায় প্রকৃতিপুঞ্জ যে, তাঁহার প্রবর্ত্তিত নিয়ম প্রতিপালন করিয়াছে, তাহা কখনও সম্ভবপর নহে।

পঞ্চম অনুশাসন।

"আমি আদেশ করিয়াছি যে, কেহ বলপূর্ব্বক অন্যের গৃহে বাস করিতে পারিবে না। আমি বিচারকদিগকে আদেশ করিয়াছি যে, অপরাধ যতই গুরুতর হউক না কেন, অপরাধীর নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া শাস্তি বিধান করা হইবে না। আমি নিজেও ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া এ কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি।"

এই নিয়মও জাহাঙ্গীরের নিজের উদ্ভাবিত নহে। ইহার পূর্ব্বে আকবর বাদশাহ এই প্রকার অনুজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন।

যুদ্ধোপলক্ষে মহাবত খাঁ দূরদেশে বাস করিবার সময় বাদশাহ শাহজাদা পরবেজের • অবস্থান জন্য অনুপস্থিত সেনাপতির পরিবারবর্গকে স্থানান্তরিত করিয়া তাঁহার প্রাসাদ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর সমগ্র নগর ভস্মীভূত করিবার সময় দরিদ্র প্রজার বাসভবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার অবসর পাইতেন না। সার টমাস রো লিখিয়াছেন যে, বাদশাহ আজমির সহরের সমগ্র লস্করে অগ্নি প্রদান করাতে তিনি বাসভবন পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। সমগ্রস্থান ভস্মীভূত ও উচ্ছিন্ন হইয়াছিল; এবং তিনি চোরের উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। গ্রন্থান্তরে বর্ণিত হইয়াছে যে, দরিদ্র অধিবাসিগণ মান্দুনগর পরিত্যাগ করিয়াছিল, রাজকীয় ঘোষণা প্রচার দ্বারাও তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক নগরবাসী স্ব স্ব বাসস্থান পরিত্যাগ করিতে আদিষ্ট হইয়াছিল। জাহাঙ্গীর নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া কাহাকেও শাস্তি প্রদান করেন নাই। কিন্তু তদপেক্ষা কঠোর শাস্তি প্রদান করিয়া তিনি ক্রূরতার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা ইলিয়ট সাহেব তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা বাহুল্য ভয়ে তৎসমুদয়ের উল্লেখ করিলাম না। কাহাকেও বা শূলে চড়াইয়া হত্যা করা হইত, কেহ বা সর্প দংশনে প্রাণ পরিত্যাগ করিত, কাহাকেও বা জীবিত অবস্থাতেই ভূ-প্রোথিত করা হইত। অপরাধীর প্রাণ বিনাশ করিবার জন্য নানাবিধ নিষ্ঠুর উপায় উদ্ভাবন করা হইয়াছিল। হস্তীর পদতলে মর্দ্দিত করিয়া প্রাণ সংহার করার নিয়মই অধিকাংশ স্থলে অনুষ্ঠিত হইত। জাহাঙ্গীর স্বরচিত জীবন বৃত্তে লিখিয়াছেন যে, তিনি খান-ই দৌওরণের পুত্রের অসম্মানসূচক বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার প্রাণনাশ জন্য জীবিত অবস্থাতেই চর্ম্ম তুলিয়া লইয়াছিলেন এবং তৎপর নগরবাসীদিগকে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন জন্য মৃত দেহ নগরের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করাইয়াছিলেন। হাসন বেগ ও আবদুল রহিম নামক দুইজন রাজ-দ্রোহীকে বধ করিবার জন্য জাহাঙ্গীর বাদশাহ এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। হাসন বেগকে ষাঁড়ের চর্ম্ম মধ্যে ও আবদুল রহিমকে গর্দ্দভের চর্ম্ম মধ্যে পুরিয়া উহার মুখ শেলাই পূর্ব্বক গর্দ্দভ-পৃষ্ঠে নগর প্রদক্ষিণ করান হইয়াছিল। হাসন বেগ এই অবস্থায় নিশ্বাসরুদ্ধ হইয়া প্রাণ

পরিত্যাগ করে; কিন্তু আবদুল রহিম ঈশ্বরানুগ্রহে ও বন্ধুগণের সাহায্যে প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

ষষ্ঠ অনুশাসন।

"আমি আদেশ করিয়াছি যে, রাজপুরুষ অথবা জায়গীরদারগণ আমার প্রজাবর্গের ভূমি হরণ করিতে অথবা আত্ম স্বার্থের জন্য উহা আবাদ করিতে পারিবেন না।"

জাহাঙ্গীর বাদশাহের শাসন-কালে প্রকৃতি-পুঞ্জের অবস্থা শোচনীয় ছিল। সার টমাস রো লিখিয়াছেন, "এ রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রজার সর্ব্বনাশ ও উচ্ছেদ হইয়া থাকে, কারণ রাজাই সর্ব্ব সাধারণের সম্পত্তির অধিকারী বলিয়া কোন ব্যক্তিই কিছুতে যত্ন প্রকাশ করে না। এজন্য সর্ব্বত্র ভগ্ন দশা দৃষ্টিগোচর হয়।" গ্রন্থান্তরে লিখিত আছে, "For all the great men live by farming Governments in which they all practise every kind of tyrany against the natives under their jurisdiction, oppressing them with continual exactions."

সপ্তম অনুশাসন।

আমি রাজ্যসংসৃষ্ট আমিন ও [illegible]রদারগণকে আমার অনুমতি ব্যতীত আপন আপন শাসিত প্রদেশের প্রজাগণের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে নিষেধ করিয়াছি।

অ[illegible]

"আমি রাজ্যের প্রধান প্রধান নগরে দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপন করিয়াছি। পীড়িত ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য চিকিৎসক নিযুক্ত রাখিতে এবং তাহার সমস্ত ব্যয় রাজকোষ হইতে প্রদান করিবার জন্য আদেশ করা হইয়াছে।"

নবম অনুশাসন।

"আমি পিতার অনুকরণে আমার জন্মদিনে জীবহত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত আমার সিংহাসনে আরোহণের দিন

বৃহস্পতিবার এবং পিতার জন্মদিন রবিবারেও জীবহত্যা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। পিতা এই দিনকে ভক্তিভাবে দর্শন করিতেন। এইদিন সূর্য্যের নামে উৎসৃষ্ট, কেবলমাত্র এজন্যই যে তিনি তাদৃশ ব্যবহার করিতেন তাহা নহে; রবিবারে সৃষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়াও তিনি এই অত্যন্ত পবিত্র মনে করিতেন। এজন্য তিনিও রবিবারে জীবহত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।"

জাহাঙ্গীর মুসলমানধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন না। সমস্ত মুসলমান জাতি রমজান মাসের উপবাসকে একান্ত পবিত্র কার্য্য বলিয়া মনে করে; কিন্তু তিনি উহা লইয়া বিদ্রূপ করিতেন। যে সকল শাস্ত্রজ্ঞ মুসলমান এসলাম ধর্ম্মের অনুশাসন প্রতিপালন করিতে একান্ত তৎপর ছিলেন, তিনি তাহাদিগকে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক কৌশল ক্রমে নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণে ও মদ্যপানে সহকারী করিয়া তুলিতে অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিতেন। ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তাগণ তাঁহাকে সর্ব্বদা ভক্ষ্যাভক্ষ্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেন; তাঁহাদের উপদেশ বাক্যে বিরক্ত হইয়া তিনি একদা জিজ্ঞাসা করেন যে, কোন্ ধর্ম্মে মদ্যপান ও নির্ব্বিচারে মাংস ভোজন নিষিদ্ধ নহে। প্রত্যুত্তরে একমাত্র খ্রীষ্টানধর্ম্মে মদ্য পান ও নির্ব্বিচারে মাংস ভোজন নিষিদ্ধ নহে, অবগত হইয়া তিনি বলেন, "তাহা হইলে আমরা সকলে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের পক্ষপাতী হইব। দর্জ্জি আনয়ন করিয়া আমাদের আচকান খাট কোটে ও পাগড়ী টুপিতে পরিবর্ত্তিত করা হউক।" এই বাক্যে ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তাগণ মুসলমানের অদৃষ্টে কি নিহিত আছে, তাহা ভাবিয়া কম্পিত হন এবং সকলেই একবাক্যে বলেন যে, [illegible] কোরাণের অনুশাসনে বাধ্য নহেন, এবং তিনি যথেচ্ছভাবে মদ্য পানে ও নির্ব্বিচারে মাংস ভক্ষণ করিতে পারেন।

দশম অনুশাসন।

"পিতা [illegible] ও [illegible] তাহা স্থির রাখিবার জন্য আমি [illegible] কিছুকাল অতিবাহিত হইলে আমি [illegible] দিয়াছি। [illegible] হইতে [illegible] হইয়াছে এবং [illegible]

বেতনও দশ হইতে বারতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। রাজান্তঃপুরের মহিলাদের বৃত্তিও বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে।”

জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বহুসংখ্যক সুভাদারকে এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন; আপনার প্রিয়পাত্র ও সাহায্যকারীদিগকে নিয়োজিত করিবার জন্য কাহাকে কাহাকেও বা পদচ্যুত করিয়াছিলেন। পদচ্যুত রাজপুরুষগণ রাজধানীতে আগমন করিয়া উৎকোচ প্রদান করিয়া ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া পূর্ব্ব-মর্য্যাদা লাভ করিবার জন্য যত্নশীল হইয়াছিলেন। যাঁহারা সিদ্ধকাম হইতে পারিয়াছিলেন না, তাঁহারা রাজদ্রোহাচরণ করিয়াও আপন আপন লুপ্ত ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি উদ্ধারের জন্য প্রয়াসী হইয়াছিলেন। একজন বিদেশী পর্য্যটক রাজান্তঃপুরের মহিলাদের বৃত্তিনির্দ্ধারিত অর্থ দিবার প্রণালীকে দরিদ্রকে ভিক্ষাদানের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন।

একাদশ অনুশাসন।

আয়মাভোগী ও মদ্দআশগণ (ইহাদের দ্বারা আশীর্ব্বাদপ্রার্থী সৈন্যদল পূর্ণ ছিল) স্ব স্ব কারমানের সর্ত্ত অনুসারে আপনাদের ভূমিতে স্থিরতর থাকিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। হিন্দুস্থানের বিশুদ্ধ সৈয়দ-বংশোদ্ভব মিরণ সদরজাহান পিতার অধীনে রাজধানীতে কিয়ৎকাল উচ্চ রাজপদে অভিষিক্ত ছিলেন। ইনি প্রত্যহ দরিদ্রদের অভাব মোচন করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন।

দ্বাদশ অনুশাসন।

“রাজ্যের যাবতীয় কারাগার ও দুর্গের বন্দীদিগকে মুক্তি দিবার জন্য আদেশ করিয়াছি।”

উইলিয়ম ফিঞ্চ নামক একজন পরিব্রাজক জাহাঙ্গীরের মৃগয়াসম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমরা এই প্রসঙ্গে তাহার সার মর্ম্ম প্রদান করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। জাহাঙ্গীর মৃগয়া উপলক্ষে নবেম্বর মাসের প্রথমে রাজধানী হইতে বহির্গত হইতেন, এবং দেশাভ্যন্তরে ত্রিশ চল্লিশ ক্রোশব্যাপী স্থানে শিকার করিয়া মার্চ্চ মাসের শেষে গ্রীষ্মাধিক্য নিবন্ধন

প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। জাহাঙ্গীর শিকারের উপযোগী বন্যস্থান লোক দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া লইতেন; তৎপর এই পরিবেষ্টিত স্থান মধ্যে মানুষই হউক, পশুই হউক, যাহা কিছু ধৃত হইত, তাহাই রাজকীয় শিকার বলিয়া গণ্য করার নিয়ম ছিল। যে সকল পশু ধৃত হইত, তন্মধ্যে মনুষ্যের যাহা ভক্ষ্য থাকিত, তাহা বিক্রয় করিয়া বাদশাহ বিক্রয়লব্ধ অর্থ দরিদ্রদিগকে দান করিতেন। বাদশাহ শিকারলব্ধ মনুষ্যদিগকে ক্রীতদাসরূপে গণ্য করিয়া প্রতি বৎসর তাহাদিগকে কাবুলে প্রেরণপূর্ব্বক তাহাদের বিনিময়ে কুকুর ও বিড়াল গ্রহণ করিতেন। এই সকল মনুষ্য আচার-ব্যবহারে পশুবৎ ছিল, এবং চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত বলিয়াই জাহাঙ্গীর তাদৃশ ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। বাদশাহের কয়েদীর দুর্ভাগ্যে সহানুভূতি থাকিলে, তিনি কখনও ঈদৃশ কঠোর ব্যবহার করিতে পারিতেন না।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

চাঁদের হাসি।

ঢল ঢল ঢল হাসিছে শশী
নীলিমা সুচারু আকাশতলে,—
থল থল থল হাসিছে সিন্ধু
সে ছায়া ধরিয়া হৃদয়তলে।

২

ঢল ঢল ঢল হাসিছে ধরা
চাঁদের হাসিটি পরশ করি,
হাসে কুমুদিনী সরসি মাঝে
বঁধুয়া নেহারি প্রেমেতে ভরি।

হাসিছে প্রকৃতি গরব ভরে
প্রভাত ভাবিয়া গাহিছে পিক,
চাঁদের হাসিতে জগত হাসে
কাঞ্চন ছটায় উজলি দিক।

৪

এ জগত মাঝে কেবা না হাসে
এমন মধুর হাসিটি কার?
বালক যুবক স্থবির মাতে
হেরিলে ইহারে একটিবার!

৫

হাসির সাগর বিরলে পেয়ে
যতনে তাহা মথিয়া সুখে,—
বঞ্চিয়া সবারে চন্দ্রমা একা
রেখেছে মাখায়ে আপন মুখে।

৬

হেরিয়া চাঁদের মধুর হাসি
শিশুরা নাচিছে মধুরতালে
কবির হৃদয়ে স্বভাব সুখে
ঝলকে ঝলকে অমিয়া ঢালে।

৭

হাস হাস চাঁদ এমনি ক'রে
মধুর মধুর মধুর পারা,
মোর আঁখিজল যাউক ভেসে
তোমাতে হ'য়ে আপনা হারা!

শ্রীনগেন্দ্রবালা মুস্তোফী।

প্রেম-বৈচিত্র্য

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অদ্য দিবাবৈঠকে মধ্যাহ্নে প্রভাতের অন্তঃপুরে ডাক পড়িল। প্রভাত ঘরে গিয়া দেখেন, কুসুমপ্রমুখা সখীর দল সিন্ধুকে ঘিরিয়া মেজেয় বসিয়া আছে। প্রভাত গৃহে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু কৈ, কেহত কিছু বলে না! সকলেই অন্যদিকে চাহিয়া আছে! যেন তাঁহাকে কেহ দেখে নাই! প্রভাত কিছু গোলে পড়িলেন, বুঝি একটু অপ্রতিভও হইলেন! এই সময়, সিন্ধু একবার, সখীদের লুকাইয়া, স্বামীর পানে চাহিল, তাহার মধুর অধরে, একটু মধুর হাসি খেলিল! প্রভাত ব্যাপার বুঝিলেন, বলিলেন—"আসামী হাজির।" কিন্তু তবু কোন উত্তর নাই, কেবল সিন্ধু, আর একবার তেমনই হাসিয়া চাহিল,—প্রভাত পুনশ্চ বলিলেন,—

"তলব হ'য়েছে কেন রাইয়ের দরবারে?"

এবার কুসুমের মুখ ফুটিল,—তুমি গরহাজির, তাই রাইরাজার কাছে, মান বাদী হ'য়েছে!

প্রভাত। তলব মাত্রত হাজির হ'য়েছি!

কুসুম। তলব করতে হয় কেন? তা অতশত বুঝিনে, এখন মান ভাঙ্গ।

প্রভাত। কেমন ক'রে ভাঙ্গতে হবে?

কুসুম। "তা আমি কেমন ক'রে বল্‌ব? আমি কি পুরুষ মানুষ? এত তোমাদেরই কাজ, ঐ দেখ" বলিয়া দেওয়ালের একখানি ছবি দেখাইয়া দিল—প্রভাত দেখিলেন—মানভঞ্জনের ছবি—তার নিচে ছাপার অক্ষরে লেখা—"দেহি পদপল্লবমুদারং"। প্রভাত একটু হাসিয়া বলিলেন,—

"তোমরা সব সখী মিলে তাল ফলালে তিল গাছে,
মানের সাগর প্রবল আমি কেমনে ফেলি ছেঁচে!"

সকলে হাসিয়া উঠিল। কুসুম হাসি থামাইয়া বলিল, "কেন, তোমার কি কোন দোষ হয়নি নাকি? এতদিন ভুলেছিলেন, সেটা বুঝি অপরাধ নয়! সই যেই সই অম্নে ছেড়েচে!"

প্রভাত। আর তুমি হলে?

কুসুম একটু অপ্রতিভ হইয়া ভ্রূকুটি করিয়া—"আহা কি কথাই বল্লেন আর কি?" বলিয়া সইয়ের দিকে চাহিল! বলিল, "মিন্সের আক্কেল খানা দেখ একবার!" সই একটু হাসিল!

তারপর সে শুকশারীর দ্বন্দ্ব মিটিয়া গেল। সিন্ধুর অনুরোধে কুসুম কপাট বন্ধ করিয়া আসিল—পাছে কর্ত্তা মা, কি আর কেউ ঘরে আসে! তা হ'লে ত বড় অপ্রতিভ হ'তে হ'বে।

এতক্ষণ কুসুন একলা আসর রাখিয়াছিল, দোর বন্ধ করার পর, বৌ ঝি সবাই এখন নিশ্চিন্ত হইয়া কুসুমের সহকারিণীরূপে বাক্‌যুদ্ধে যোগ দিল! মহারথী হইলেও সপ্তরথি-বেষ্টিত অভিমন্যুর মত প্রভাতকে এযুদ্ধে কিছু বিব্রত হইতে হইল!

ধম্, ধম্, ধম্, কে দরজায় ধাক্কা দিল। ধাক্কা, ধাক্কা, ধাক্কার পর ধাক্কা, সে ধাক্কা আর থামে না—সিন্ধু জিভ্ কাটিয়া, এক হাত ঘোম্‌টা টানিয়া, এক কোণে লুকাইল, বৌর দলও যেন কিছু শশব্যস্ত হইয়া উঠিল! কুসুম তাড়াতাড়ি দরজার নিকট আসিয়া হাকিল, "কে গা? বাহির হতে কে উত্তর দিল, "বলি তোরাই কি একলা একলা রাসলীলা কর্‌বি—বুড়িকে কি নিবিনে?" ও হো, এ যে চেনা গলা! সকলে চিনিল, ডাক্তারঠাকরুণ দিদি—তবু রক্ষে!

'এস এস চন্দ্রাবলি দিদি এস' বলিয়া কুসুম দরজা খুলিয়া দিল। হাসিতে হাসিতে ডাক্তারগিন্নি গৃহে প্রবেশ করিলেন—প্রভাত, খাট হইতে নামিয়া, ঠাকুরাণীকে প্রণাম করিলেন। ঠাকুরাণী আশীর্ব্বাদ ও কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলে প্রভাত বলিলেন, "বাগানের যে এত দেরী।"

ডাঃ গিঃ। "আর ভাই, আমাদের ভাঙ্গা বাগান, এখন আর জোগান দেওয়া ভার!" তারপর সিন্ধুর দিকে চাহিয়া, "ও কিলো বাগান, আমার কাছে এত লজ্জা কেন? ওলো লজ্জা রাখ্" বল্‌তে বল্‌তে তাহাকে ধরিয়া আপনার কাছে টানিয়া আনিলেন। সিন্ধু জড়সড় হইয়া, ঠাকুরাণী

দিদির কাছে ঘেসিয়া বসিল। প্রভাত, ঠাকুরাণী দিদির অনুমতি ক্রমে আবার স্বস্থানে গিয়া বসিলেন। তখন, ডাক্তার গিন্নি, কুসুমের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হাঁলা আতরদানি, আমাকে ডেকে আনতে নেই কি? তোরা গেলিনে দেখে আমি শেষ গন্ধে গন্ধে এলাম!" প্রভাত হাসিয়া বলিল, "ঠান্‌দিদির ত খুব ঘ্রাণশক্তি।" ডাক্তার গিন্নি একটু চাপা হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তুমি যখন এসে বাগানে পড়েছ, তখন আমি না এলে কি আর রক্ষা ছিল!"

প্রভাত বুঝিলেন, উত্তর উপযুক্ত হইয়াছে।

ডাক্তার গিন্নি বলিয়াই চলিলেন, "তুমি ত ভারি নিষ্ঠুর, এতদিন কি ভুলে থাকতে হয়! পা'ট অভাবে, আমার এমন সুন্দর বাগান যেন শুকিয়ে উঠেছে! তুমি কি রকম মালী? মালী উপস্থিত না থাক্‌লে ফলন্ত বাগানের কি দশা হয়, তা কি জান না?"

এবার সিন্ধু ঠাকুরাণী দিদির দিকে ভ্রূকুটি করিল। প্রভাত বলিলেন, "ওজন্য ত এতক্ষণ অনেক খোটা খেলাম।"

ডাঃ গিঃ। খোটার এখনই হয়েছে কি?

প্রভাত। তা বটে! যে রকম দেখছি, তাতে কেবল খোটায় পার পেলে বাঁচি, আর কিছু খেতে না হয়!

সকলে হাসিয়া উঠিল, সিন্ধুও মৃদু হাসিল, তারপর, ঘোমটার ভিতর হইতে একটু কোপ-কুটিল কটাক্ষে একবার স্বামীর পানে চাহিল। ডাক্তার গিন্নি আবার বলিলেন, "দেখ নাত্‌জামাই, একটা মজা শুনেছ! ওমাসে তুমিত ভাই, আসবো বলে এলেনা, সিন্ধুর যে কান্না! একদিন দেখি, হেমকে আর শৈলকে সিন্ধু শ্লোক শেখাচ্চে, সে শ্লোকটা কেন শেখাচ্ছিল তুমি শুন্‌লেই বুঝবে এখন।" বলিয়া ডাক্তারগিন্নি দরজা খুলিয়া বাহিরে গিয়া শৈলকে ধরিয়া আনিলেন। হেম পলাইয়া গেল। শৈল সিন্ধুর জ্ঞাতি ভগ্নী, তারাও সব দল বাঁধিয়া উকিঝুকি মারিতেছিল। শৈলকে ধরিয়া আনিয়া ডাক্তারগিন্নি বলিলেন, "বল্‌ত শৈল—সেদিন তোর সিন্ধুদিদি যে শ্লোকটা শেখাচ্ছিল, সেটা বল্‌ত? এখনি পুতুল আর পুতুলের গয়না দেব।" সিন্ধু হাত নাড়িয়া, ঘোমটার ভিতর হইতে চোক পাকাইয়া

শৈলকে বারণ করিল—কিন্তু সে পুতুল পাওয়ার লোভ পাইয়াছে, নিষেধ শুনিবে কেন? শৈল তখন হাঁফাইতে হাঁফাইতে আধ আধ কথায় বলিতে আরম্ভ করিল—

"বালিকা ছিলাম, ছিলাম ভাল সই;
ছিলনা সুখ অভিলাষ।
পতি চিন্তামনা, ও রস জান্‌তাম না,
হৃদ্‌পদ্ম ছিল অপ্রকাশ।
এখন সেই শতদল মুদিত কমল, কাল পেয়ে ফুটিল,
পদ্মের মধু পদ্মে রেখে ভৃঙ্গ উড়ে গেল।
একে"——

আর বলা হ'ল না। সিন্ধু আসিয়া শৈলের মুখ চাপিয়া ধরিল! আর কাণে কাণে কি বলিল—শৈল "আচ্ছা" বলিয়া ছুটিয়া পলাইল। ডাক্তারগিন্নি বলিলেন,—ওকে তাড়িয়ে দিলি কেন লো বাগান? এখন আবার এত লজ্জা কেন?

তারপর অন্য কথা পড়িল। এদিকে বেলা যায় যায় দেখিয়া ক্রমে আসর ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল। তখন প্রভাতের জল খাবারের ডাক পড়িল। প্রভাত উঠিলেন। আসুন, আমরাও আজ এইখানে বিদায় গ্রহণ করি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

'জোর্‌-সে হাঁকাও' প্রভাত বারম্বার গাড়োয়ানকে তাড়া দিতেছেন! আজ আট্‌টার ট্রেণ ধরিয়া এগারটার পূর্ব্বে আফিস যাইতেই হইবে, নতুবা,—সহসা,—প্রভাতের মানসচক্ষে বড় সাহেবের রাগ-রক্ত-বদনমণ্ডল উদিত হইল, প্রভাত তখন ব্যাকুলভাবে দ্বিগুণ আগ্রহে আবার হাঁকিলেন, 'জল্‌দি হাঁকাও'। বক্‌সিসের লোভে গাড়োয়ান চাবুক কিছু জল্‌দি হাঁকাইতে লাগিল সত্য, কিন্তু অশ্বের বেগ তাহাতে বড় বাড়িল না; প্রভাত উৎসুক নয়নে ঘড়ি খুলিয়া, ষ্টেসনের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া তাকাইয়া কেবল আফিসের

চিন্তাতেই আকুল হইতেছিলেন, এমন সময়, পশ্চাৎ হইতে কোন গাড়ির রসিক গাড়োয়ান গাহিয়া উঠিল,—

"বিরহিণী বিবি আমার বাঁধে নাকো চুল!"

এ সঙ্গীতে প্রভাতের হৃদয় যেন স্পন্দিত হইল! সেই বিদায়ের দৃশ্য, সিন্ধুর সেই ছল ছল জলভরা আঁখি দুটী, যেন তাঁর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল! সিন্ধু যে তাঁকে আর একটী দিনের জন্ম থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু প্রভাত বালিকার সে আব্দার রক্ষা করিতে পারেন নাই। সহসা প্রভাত, বড় অন্যমনস্ক হইলেন, আফিস, সাহেব, মুহূর্ত্তে সব ভুলিয়া গেলেন। সিন্ধুর স্মৃতি, হৃদয়সিন্ধু উদ্বেলিত করিয়া দিল!

কবি বলিয়াছেন, জীবন অস্থায়ী, ইহা দুঃখের বিষয় বটে, কিন্তু অধিকতর কষ্টের কথা, জীবনের উপভোগ্য সুখের দিন আরও ক্ষণভঙ্গুর! এ উক্তির সত্যতা প্রভাত আজ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছিলেন। হায় দাসত্ব! আবার দাসত্ব,—প্রভাত তখন ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আকুলকণ্ঠে ডাকিলেন, 'গাড়োয়ান!'

* * * * *

আর সিন্ধু! সমবয়স্কাদের সহিত সিন্ধুর সে খেলা আর ভাল লাগিল না, সে উচ্চহাসি আর আসে না, দুইদিনে সে যেন কত বিজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছে, সে সদা-প্রফুল্লমুখে, যেন বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে, সে কাঁচা বাঁশে যেন ঘুণ ধরিয়াছে! সত্যই যেন এতদিন সিন্ধুর "হৃদ্-পদ্ম ছিল অপ্রকাশ!" কিন্তু যে ভৃঙ্গের মধুর ঝঙ্কারে সে হৃদয়-কোরক বিকশিত হইল, কোথায় সে আজ? হায় পথিক, কেন তুমি দুদিনের জন্য আসিয়া, এই অবলা বালিকার হৃদয়ে এ আগুন জ্বালাইয়া গেলে!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শরৎকাল! চারিদিকে সুদূর-বিস্তৃত, বায়ু-হিল্লোল-বিধূত, শ্যামলশস্যরাজি দেখিতে দেখিতে মন মুগ্ধ হইয়া যায়। এ যেন বিক্ষুব্ধ সাগর-বক্ষে শ্যামতরঙ্গরাজির অপূর্ব্ব ক্রীড়া! গ্রামে গ্রামে অশ্বথ, বট, আম্র প্রভৃতি

বৃক্ষ সকল কেমন সতেজ, তাহাদের শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়, চিক্কণ যৌবন উদ্ভাসিত। মাঝে মাঝে স্তবকে স্তবকে 'রাধা চূড়া' পুষ্পের লোহিত আভা, শ্যামল পত্রের অবকাশ-পথে পড়িয়া মন হরণ করিতেছে। বিল খাল পুষ্করিণী সবই কাণায় কাণায় পুরিয়া উঠিয়াছে! এই সরিৎ-শীতলা, শস্য-শ্যামলা পত্র-পুষ্প-বিভূষিতা শরৎরাণীর পরিপূর্ণ শোভা দেখিতে দেখিতে হৃদয়ে যেন কি এক নূতন শক্তির সঞ্চার হয় না? আশায় আকাঙ্ক্ষায় হৃদয় মাতিয়া উঠে। আর সেই 'শক্তি সাধনায়' সঙ্গে সঙ্গে প্রবাসী আত্মীয়ের জন্য বাঙ্গালীর মন আকুল হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ জননীর প্রাণ তখন পরগৃহ-বাসিনী, প্রাণ-প্রতিমা নন্দিনীর জন্য নিতান্তই অধীর হয়। তখন শত জননীর ব্যাকুলতাপূর্ণ করুণ-আগমনীগীতি বাঙ্গলার গৃহে গৃহে ধ্বনিত হয়। এমন সময়ে কি কোন জননী প্রাণ ধরিয়া 'ঘরের মেয়েকে পরের বাড়ী' পাঠাইতে পারেন? তাই আজ সিন্ধুর জননীর এত দুঃখ! "বেয়ান মাগীর কি আক্কেল গা, পূজা সাম্‌নে করে, কিনা নিতে পাঠিয়েছে? তার কি পেটের মেয়ে নাই! মায়ের ব্যথা কি সে জানেনা?" কিন্তু হায়! মেয়ের মায়ের যে সবই অরণ্যে রোদন। সিন্ধুর মা, মেয়ে পাঠাইয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন,—কিন্তু [illegible]

"মা তুমি বোকা মেয়ে কেন কেঁদে মর—
ভেবে দেখ মা তুমি কার ঘর কর!"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।*

শারদীয়া পূজার মোট আর দুই দিন বাকী। আজ আফিস করিয়া প্রভাতের ছুটী। অন্যবার ছুটী হয় বারদিন, এবার বড় সাহেব দয়া করিয়া,

---

* "প্রেমবৈচিত্র্যের" এই কয়েকটী পরিচ্ছেদের কতকাংশে "পূজার ছুটী" নামে "সাধনায়" প্রকাশিত হইয়াছিল।

লেখক।

জোড়া তাড়া দিয়া, ছুটীটা দিন দুই বাড়াইয়া দিয়াছেন ;—আনন্দের কথায় আর কাজ কি ? বড় সাহেবের জয় জয়কার হোক্।

প্রভাত আফিস হইতে বাসায় আসিয়া তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া, যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া লইলেন ;—বলিতে লজ্জা করে, বাড়ী যাবার আমোদে, এ বয়সেও প্রভাতের উদর পূরিয়া উঠিল। চিরপ্রবাসী কেরাণী সংবৎসর পর বাড়ী যাইতেছে, তার আহ্লাদ তোমরা সবাই বুঝিবে কি ? ক্ষিপ্রহস্তে জিনিস পত্র গুছাইয়া লইয়া "নদী যথা ধায় সিন্ধু পানে"—প্রভাত গৃহোদ্দেশে ছুটিলেন।

হাওড়া ষ্টেশনে ঢুকিতে না ঢুকিতে একটা অস্ফুট জনকল্লোল শুনা গেল। বোধ হইল যেন দূরে সমুদ্র গর্জ্জিতেছে। ষ্টেশনে, টিকিট-ঘরে, লোকে লোকারণ্য ; টিকিট লইয়া প্রভাত অমনই গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী কিন্তু সব ভরপূর। বহুকষ্টে বসিবার স্থান মিলিল। যে স্বর্গে উঠিতেছে সে সিঁড়ির ভয় করে না, কাজেই প্রভাতও এ কষ্ট গায়ে মাখিলেন না। একটু পরে, গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল ; ত্রাস্তা, ভীতা ফণিনীর মত তীরবেগে গাড়ী ছুটিল।

প্রভাতের গাড়ীতে অধিকাংশই গৃহযাত্রী বাঙ্গালী। কেহ বালক, কেহ বৃদ্ধ, কেহ যুবক। কাহারও জন্য স্নেহময়ী জননী পথ চাহিয়া চাহিয়া আছেন,—কবে তাঁহার অঞ্চলের নিধি, কাঙ্গালের সোণা বিদেশ হইতে ফিরিবে ! কাহারও পুত্র কন্যা, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব আশাপথ ধরিয়া আছেন ; কাহারও বা প্রণয়িনী কাঁদিয়া কাঁদিয়া দিন গণিতেছেন, কবে আবার তাঁহার সেই প্রবাসক্লিষ্ট, হৃদয়সর্ব্বস্ব স্বামী গৃহে ফিরিবেন। হায় ! আবার কতদিনে, সেই বিরহ-সন্তাপিতা পথিকবধূ, বঁধুর বুকে মাথা রাখিয়া, সারা বছরের দুঃখ-যন্ত্রণা ভুলিবেন।

আনন্দময়ী মার আগমনে, বঙ্গে যে এত আনন্দ, এত উচ্ছ্বাস, বুঝি বা প্রিয়জনের মিলন-আশাই এর প্রধান কারণ ! ক্রমে গাড়ী ষ্টেশনের পর ষ্টেশনে থামিতে থামিতে প্রভাতের গন্তব্য ষ্টেশনে উপস্থিত হইল, প্রভাত নামিয়া পড়িলেন। রাত্রি তখন আটটা। ষ্টেশনের বাহিরে, প্রভাতদের গ্রামস্থ তিনটী স্কুলের ছাত্রের সঙ্গে দেখা হইল ; একজন কিশোরবয়স্ক, অপর

দু'টী বালক। তাঁহারা তিনজনেই এক পরিবারভুক্ত, কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশুনা করেন। সম্প্রতি ছুটিতে বাড়ী যাইতেছেন। ইহারা চারিজনে একখানি ঘোড়াগাড়ি ভাড়া করিবেন, স্থির হইল। বহুত গ্রাহক, এদিকে গাড়ী কম, গাড়োয়ানদের সুতরাং পোয়াবারো! অন্য সময় তাহারা ছুটিয়া আসিয়া হাতের ব্যাগ বহিয়া গাড়ীতে লইয়া যায়, আজ আর তাহাদের মাটীতে পা পড়ে না। তারা কোচবাক্সে গম্ভীরভাবে সমান বসিয়া রহিল। কিন্তু গরজ বড় বালাই, প্রভাত নিজের দায়ে অগত্যা মহম্মদের সেই উপদেশ-বাক্য স্মরণ করিলেন। গাড়োয়ানেরা কেহ অগ্রসর হয় না দেখিয়া, প্রভাতই শেষ, গাড়ীর কাছে হাজির হইলেন। অন্য সময় দুই টাকার মধ্যেই গাড়ী মিলে, কিন্তু আজ আর কেহ পাঁচ টাকায় কমে যাইতে স্বীকার হইল না। তাই স্বীকার করিয়া প্রভাতেরা গাড়ীতে উঠিলেন; গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল; পক্ষিরাজদ্বয়, গজেন্দ্র-গতিতে ছুটিলেন। তাহাদের প্রতি পাদক্ষেপে, একটা গভীর ঔদাস্য ও নির্লিপ্ততার ভাব প্রকাশ পাইতেছিল। হায়! এই অশ্বিনীকুমার-যুগলেরও বুঝি গাড়োয়ানদের মত পায়াভারি হইয়াছে।

যাই হোক্, কোনরূপে প্রভাত রাত্রি এগারটার সময় যথাস্থানে পৌঁছিলেন। এইবার নৌকায় যাইতে হইবে, এখান হইতে প্রভাতদের বাড়ী সাতক্রোশ, তবে জলপথে কিছু ঘুরিয়া যাইতে হয়।

সেদিন চতুর্থী; সুতরাং জ্যোৎস্না অনেকক্ষণ ডুবিয়া গিয়াছে, রাত্রি কিছু অন্ধকার, তবে ঘোর নহে; সেই তরল অন্ধকার ভেদ করিয়া তারকারাজি অল্প অল্প কিরণ দিতেছিল। প্রভাত তখনই নৌকা ছাড়িয়া দিলেন। অনুকূল বাতাস বহিতেছিল, মাঝিরা পাল তুলিয়া দিল, সেই নিশীথ রাত্রে, অনন্ত আকাশতলে, প্রশান্ত ভাগীরথী-বক্ষে, পালভরা নৌকা তর তর বেগে মুক্তপক্ষ কলহংসীর মত চলিল। আশ্বিনে, বর্ষার সে দুর্দ্দমনীয় চাঞ্চল্য নাই, কিন্তু ভাগীরথী এখনও কলায় কলায় পূর্ণ। যৌবনের মত্ততা গিয়াছে, কিন্তু যৌবন আজিও টল টল। গঙ্গার উভয়কূলের দূরস্থ গ্রামগুলি, কুয়াশাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইতেছিল। গাছপালা সবই ছায়া ছায়া, যেন চিত্রার্পিত! দেখিতে বড় সুন্দর! কোথায়ও বা অদূরে দুই একটা সৌধশ্রেণী পড়িয়া আছে, কোনটীর বা মুক্তবাতায়ন পথে আলো দেখা যাইতেছে। দূরে মাঝি

মাল্লারা সারি গাহিয়া চলিয়াছে, গান বুঝা যায় না, কিন্তু সেই গভীর নিস্তব্ধ রজনীতে সঙ্গীতের সেই শেষ ভাগ বড়ই মধুর শুনাইতেছিল।—আর প্রভাতের মনে যে সঙ্গীত বাজিতেছিল, তাহা আরও মধুর! ক্রমে প্রভাতের তন্দ্রা আসিল, তন্দ্রা স্বপ্নময়, আর স্বপ্ন যে কি-ময়, তাহা বলিতে হইবে কি?

কখন প্রভাত হইয়াছিল, প্রভাত জানিতে পারেন নাই। বেলা তিন চারি দণ্ডের সময় মাঝিদের ডাকে প্রভাতের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মাঝিরা বলিতেছে, "বাবু! ঘাটে এসেছি, উঠুন"—

কথাটা কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,—
আকুল করিল তার প্রাণ,

প্রভাত আর কি স্থির থাকিতে পারেন? তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন। সঙ্গে যে বালক দুইটী ছিল, তাহারা নৌকা ঘাটে লাগিবামাত্রই লাফ দিয়া ঘাটে উঠিয়াছিল—তীরে উঠিতে না উঠিতে তাহারা কতদূর চলিয়া গেল।

গঙ্গার ধার হইতে প্রভাতদের বাড়ী এক পোয়া পথ। গ্রামের নীচেই বিল, কিন্তু ঘুরিয়া সেই বিলপথে গেলে প্রায় দুই ঘণ্টা লাগে। প্রভাত ততটা ঘুরিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

বালক দুইটী চলিয়া গেলে, প্রভাত সেই কিশোরটীকে বলিলেন— "কই উপেন্, তুমি যে ওদের সঙ্গে গেলে না," সে কোন উত্তর দিল না; কেবল প্রভাতের দিকে চাহিল, চাহিয়া একটু হাসিল। সে হাসি ঔদাস্তের! তাহার মত বয়সে সকলেরই একদিন এইরূপ উদাসভাব আসে। বাল্যকালে পূজা বলিয়া, গৃহ বলিয়া, যে একটা দুর্দ্দমনীয় টান থাকে, আমোদে যত উৎসাহ থাকে, বয়সে ক্রমে তাহা হ্রাস হইয়া থাকে। শেষে কিশোর বয়সে একেবারেই কমিয়া যায়। তখন একটা উদাস ভাব, হৃদয় ছাইয়া ফেলে। বাল্যকালের সে সব আমোদে মন আর মাতে না, সে সব বাঁধনে আর তেমন টান থাকে না, যেন কি একটা অভাবে, কি একটা শূন্যতায় হৃদয় সদাই খাঁ খাঁ করিয়া বেড়ায়। পুরাতনের কিছুতেই আর তাহা পূর্ণ হয় না। শেষ আর এক নূতন বন্ধন হয়, সে বন্ধনে শিথিল গ্রন্থি সব আবার দৃঢ় হইয়া পড়ে, জগৎ আবার স্নেহময় হইয়া উঠে; শীতের পর বসন্তের উদয় হয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রভাত বাটী প্রবেশ করিতে না করিতে "কাকা বাবু দাও সন্দেশ আমরা সবাই খাই" বলিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভাইঝি ছুটী ছুটিয়া প্রভাতের কাছে আসিল। প্রভাতও অতটা খেয়াল করিয়া সন্দেশ আনেন নাই, মনে মনে কিছু অপ্রতিভ হইলেন। হায়! নবকৃষ্ণবাবু কাকাবাবুদের সহিত আপনার কি এমন শত্রুতা ছিল! যাইহোক প্রভাত সন্দেশ দিতে না পারিলেও বালক-বালিকা-দলের উৎসাহ ভঙ্গ হইল না। তাহারা কেহ ঝাঁপাইয়া প্রভাতের কোলে উঠিল, কেহ বা হাত ধরিয়া 'কাকা এসেছে গো' 'কাকা এসেছে গো' রবে তোলপাড় করিতে করিতে প্রভাতকে 'অন্দরের' দিকে টানিয়া লইয়া গেল; তখন একে একে প্রভাতের মা, ভগিনী, পিসিমাতা, ঠাকুর-মাতা, প্রভৃতি সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন; গুরুজনদের যথারীতি প্রণাম করিলে পর ভগিনী প্রভাতকে বসিবার জন্য একটী মাদুর বিছাইয়া দিলেন। বালক-বালিকার দলও তখন কেহ প্রভাতের কোলে, কেহ পাশে বসিল। মা খাবার আনিতে গেলেন, আর সকলে কাছে বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন; অনেক দিনের পর স্নেহের পুত্তলি ও ভক্তির প্রতিমাগুলি দেখিয়া প্রভাতের হৃদয় আনন্দে উছলিয়া উঠিল; আমরা সত্য কথা লুকাইব না, কথা কহিতে কহিতে প্রভাত মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হইতেছিলেন। তাঁহার চঞ্চল চক্ষু কোন একটী নেপথ্যবর্ত্তিনীর উদ্দেশে ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। আরও একটী উৎসুক দৃষ্টি যে, অদূরে অন্তরালের ছিদ্র পথে ঘনপক্ষচ্ছায়া তলে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা প্রভাতের অন্তর জানিত।

জল খাওয়ার পর প্রভাত বন্ধু বান্ধবদের সহিত দেখা করিতে বাহির হইলেন। পূজায় অনেকেই বাটী আসিয়াছেন, একে একে প্রায় উপস্থিত সকলের সঙ্গেই দেখা করিলেন।

বাল্যকালের সেই বাঁধাঘাট, সেই বটগাছ, সেই বকুলতল সকলই দেখিলেন। শৈশবের কত কথা মনে পড়িল, হায়, আজ সে সব দিন কোথায়? আর সেই শৈশবের সেই যে সঙ্গী তারাই বা আজ কোথায়?

কেহ দেশান্তরে, বহুকাল দেখা নাই, কেহ লোকান্তরে, এ জীবনে দেখিবার আশা নাই!

দেখা সাক্ষাতে, আসরে নিদ্রায় গল্প গানে সমস্ত দিন কাটিয়া গেল; রাত্রি নয়টার পর প্রভাত আহারাদি করিয়া শয়ন-গৃহে গেলেন। আজ এ পর্য্যন্ত প্রভাত তাঁর সেই নয়নানন্দ-দায়িনীর সাক্ষাৎ পায় নাই। বালিকা বা যুবতী বধূর প্রথম শ্বশুর বাটী আসিয়া দিবসে স্বামিসন্দর্শন বড় কঠিন কথা! গৃহে আসিয়া প্রভাত প্রায় আধ ঘণ্টা শুইয়া রহিলেন। পাতাটী নড়িলে, বায়ু একটু সশব্দে বহিলে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন, কিন্তু বৃথা আশা! তখন তাঁর মনে হইতে লাগিল—

জানে কাঁদি তার তরে,
তবু সে বিলম্ব করে—
রমণী নির্দ্দয়!

কাজ কর্ম্ম সমাধা করিয়া সিন্ধুর আসিতে এ বিলম্ব টুকু হইতেছে বুঝিয়াও প্রভাতের অবুঝ মন চঞ্চল হইয়া উঠিল, ক্রমে যেন শয্যা-কণ্টক উপস্থিত হইল, প্রভাত পাশ ফিরিয়া শুইলেন; ধীরে ধীরে সহসা কে আসিয়া প্রভাতের চক্ষু টিপিয়া ধরিল।

কি কোমল স্পর্শ!

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রভাতদের বাটীতে পূজা হয়। আজ সপ্তমী পূজা। পূজার বাদ্য বাজিয়া উঠিয়াছে। দলে দলে বালক-বালিকা "আঙ্গা কাপড়" পরিয়া পূজা দেখিতে ছুটিয়াছে।

সন্ধ্যার পর আরতি। পুরোহিত ঠাকুর যথাসময়ে পঞ্চপ্রদীপহস্তে আরতি আরম্ভ করিলেন। তাঁহার হস্তের সেই কৌশলময় সঞ্চালন দেখিবার জিনিষ বটে। প্রতিমার নিকটে ঘন ঘন ধূপধূনা আলান হইতেছিল—উভয় পার্শ্বে সারি বাঁধিয়া চামরব্যজন চলিতেছিল, মাঝে মাঝে লাল নীল আলোর

চণ্ডীমণ্ডপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। কাঁশর ঘণ্টার রবে দিক পুরিয়া উঠিয়াছিল; সঙ্গে সঙ্গে ঢাক ঢোল শানাই বাজিতেছিল। অসংখ্য নরনারী ভক্তিভরে, একদৃষ্টে প্রতিমা নিরীক্ষণ করিতেছে, সে সময়ে এ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মনে কেমন একটা পবিত্র ভাব আসে, ভক্তিভরে হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠে।

পরদিন অষ্টমী পূজা। অন্যবার সন্ধিপূজা গভীররাত্রে হইয়া থাকে, এবার আরতির সঙ্গে সঙ্গেই সন্ধিপূজার আরম্ভ হইল। আজ পূজার জমজমাটা আরও কিছু বেশী রকমের।

নবমীর দিন লোক জন খাওয়াইতেই কাটিয়া গেল। তারপর বিজয়া দশমী; বৈকালে প্রতিমাবরণ হইল। আজ গ্রাম ও আশপাশ হইতে অনেক লোক বিসর্জ্জন দেখিতে আসিয়াছে।

সে গ্রামে আরও দুইখানি পূজা হইত। তিনখানি প্রতিমা একত্রে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া একসঙ্গে বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। গ্রামের প্রান্তেই বিল। সেই বিলে প্রতিমা বিসর্জ্জন হয়; বিল এখনও জলে পূর্ণ, সুতরাং প্রতিমা লইয়া "বাচখেলার" বড় সুবিধা। প্রভাতেরাও নৌকাবিহারের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। প্রকাণ্ড বিল, বিলের একধার হইতে অন্য ধার স্পষ্ট নজর হয় না। চারিদিকে কেবল স্থির জলরাশি, মাঝে মাঝে নিমোজ্জনোন্মুখ শুষ্ক বৃক্ষাদির শাখা জাগিয়াছে মাত্র। সেই সব শাখায় শাখায় শ্যামলপত্রের অন্তরালে বক, সারসাদি বসিয়া আছে। কোথাও বা কলহংসী, কারণ্ডব, চক্রবাক, মিথুন প্রভৃতি জলচর পক্ষী সন্তরণ করিতেছিল—সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে কুলায়-উদ্দেশে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর বিসর্জ্জন দিয়া প্রভাতেরা নৌকা ফিরাইলেন। কূলে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল। কৌমুদী-কিরণ-সম্পাতে জলরাশির শোভা দেখিতে দেখিতে সকলে উপরে উঠিলেন। তখন শানায়ে পূরবী রাগিণীতে বিসর্জ্জনের গান গাহিতেছিল—সেই গানের সঙ্গে তখনকার প্রাণের সুর মিলিল।

গৃহে ফিরিতে একটু রাত্রি হইল। তারপর সকল পরিবার একত্র হইয়া সম্বন্ধ অনুসারে প্রণাম, আলিঙ্গন আশীর্ব্বাদ চলিতে লাগিল। শেষ,

গ্রামস্থ স্বজাতি, কুটুম্ব, আত্মীয় সকলের বাটীতে বিজয়ার প্রণাম উদ্দেশে সকলে বাহির হইলেন। আজ আর শত্রুমিত্র ভেদ নাই, শত্রু শত্রুতা ভুলিয়া মহাশত্রুকে আলিঙ্গন করিতেছে, আজ সকলের মন যেন শান্তি ও ক্ষমায় পূর্ণ।

আহারাদির পর প্রভাত শয়ন-গৃহে বসিয়া আছেন, সহসা তাঁর গৃহিণী আসিয়া ঢিপ করিয়া একটী প্রণাম করিলেন। নূতন নিয়মে, গৃহিণীকুলের নিকট আর বড় একটা প্রণাম পাওয়া যায় না, তাই, বোধ হয় প্রভাত প্রথমে একটু বিস্মিত হইয়াছিলেন। বিস্ময়ের প্রথম মুহূর্ত্ত অতীত হইলে প্রতিদানে প্রভাতও তাঁর কর্ত্তব্যসাধন করিলেন।

আজ পূর্ণিমা। রাত্রে ওপাড়ায় রায়েদের বাটীতে যাত্রা হইবে। প্রভাত এখন একটা রাত্রিও নষ্ট করিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু কি করেন, বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধে ও বিদ্রূপে পড়িয়া যাত্রা শুনিতে যাইতে হইল। রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত থাকিয়া শেষ পাশ কাটাইয়া চলিয়া আসিলেন। শয়ন-গৃহের দ্বারে আসিয়া শিকল নাড়িলেন, দরজা খুলিয়া ঠাকুরমাতা বাহির হইলেন। একটু রহস্য করিতেও ছাড়িলেন না! প্রভাত ঘরে গিয়া দেখিলেন তাঁর গৃহিণী নিদ্রাভিভূতা। কয়েকদিন উপর্য্যুপরি রাত্রি জাগিয়া আজ এই অবকাশে একটু ঘুমাইয়া লইতেছেন। এতক্ষণ ঠাকুরমা তাঁর কাছে ছিলেন, শিকল নাড়ার শব্দ শুনিয়াই তাঁর ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল, তিনি আর ইহার ঘুম না ভাঙ্গাইয়া দুয়ার খুলিয়া দিয়াছিলেন।

মুক্ত বাতায়নপথে পূর্ণচন্দ্রের কিরণ আসিয়া শয্যায় পড়িয়াছিল। প্রভাত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেই শরৎজ্যোৎস্নার সহিত তাঁহার গৃহ-জ্যোৎস্নার মিলন দেখিতেছিলেন।

* * * * *

ক্রমে ছুটীর দিন ফুরাইল। আজ রাত্রি দশটার পর প্রভাতকে কলিকাতায় রওনা হইতে হইবে।

প্রভাত সমস্তদিন কোথাও বড় একটা বাহির হইলেন না—মা, পিসিমা, ভগিনী ইহাদের কাছে কাছেই রহিলেন। আর সন্ধ্যার পরই আহার করিয়া শয়ন করিতে গেলেন।

প্রভাত যাওয়ার একটু পরেই গৃহিণী উপস্থিত হইলেন। সেই স্বভাবপ্রফুল্ল মুখখানি বড় আজ বিষণ্ণ।

অন্য দিনের অপেক্ষা দশটা আজ যেন দু'চারি ঘণ্টা পূর্ব্বে বাজিল। বিদায়কালীন মিলন যখন নিবিড়তম, তখন কে ডাকিল,—

"বাবু মাঝি এসেছে।"

প্রভাত একে একে সকলের কাছে বিদায় হইলেন, নৌকায় উঠিলেন। নৌকা ছাড়িয়া দিল।

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

ইংরেজী বিবাহ।

সকলেই জানেন ইংরেজদের মধ্যে বাল্যবিবাহ নাই। আমাদের দেশে যে বয়সে মেয়েদের দৌহিত্র, এমন কি পৌত্র পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, ইংরেজ কন্যাদের প্রায় সেই বয়সে বিবাহ হয়। সচরাচর স্ত্রীলোকদের ২০ হ'তে ৩০ আর পুরুষদের ২৫ হ'তে ৩৫ বৎসর বিবাহের সময়। অনেক সময় উহা অপেক্ষাও অধিক বয়সে বিবাহ ঘটিয়া থাকে। কারণ, সংসার-পালনের উপযুক্ত অর্থ উপার্জ্জিতে না পারিলে কোন ব্যক্তিই বিবাহ করে না, কি ধনী, কি দরিদ্র, সকলেই ব্যায়াচিত ধন হস্তগত না হ'লে বিবাহে অগ্রসর হয় না।

আমাদের দেশের মত বিলাতে ঘটক ও ঘটকালির ব্যবস্থা নাই। কোন সভায় বা প্রকাশ্যস্থানে, কি বন্ধুবান্ধবদের বাড়ীতে অনেক স্ত্রীলোক ও পুরুষের একত্র সমাগম হইলে পরিচিত যুবকযুবতীরা নিজেই প্রণয়ী ও প্রণয়িনী জুটাইয়া লয়। এই পাত্রপাত্রীর আলাপ করার সময়কে ইংরেজীতে 'কোর্টশিপ' বলে। পুরুষই প্রথমে পত্র বা কথা দ্বারা স্ত্রীলোকের নিকট নিজের প্রেমের কথা জানায়, যুবতীরও তাহার প্রতি আসক্তি জন্মিলে সে যুবকের প্রণয়ে উপেক্ষা করে না। ক্রমে দুজনে সর্ব্বদা দেখাশুনা করিয়া উভয়ের মন জানিয়া লয়। এইরূপ আলাপের পর উভয়ের কোন বিষয়ে

আপত্তি না থাকিলে যুবক যুবতীর কাছে বিবাহের প্রস্তাব করে। কন্যা তাহাতে স্বীকৃত হ'লে উভয়ের পিতামাতার মত লওয়া হয়। পিতামাতারা প্রায়ই নিজ নিজ পুত্রকন্যাদের মনোনীত পাত্রপাত্রীর সঙ্গে বিবাহে আপত্তি করেন না।

এই বিবাহে অঙ্গীকারের পর উভয়ে আইনমতে বিবাহ করিতে বাধ্য হয়। এই কড়ার করাকে ইংরেজীতে 'এন্‌গেজ্‌মেণ্ট' বলে। ইহার পরে পাত্রী পাত্রের প্রদত্ত একটী আংটী পরে, তাহাকে 'এন্‌গেজ্‌মেণ্ট রিং' বলে। এই সম্বন্ধে সেদিন খবরের কাগজে আমাদের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দৃঢ় পতিপ্রেমের একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পড়িয়াছি। এন্‌গেজমেণ্ট ও বিবাহের সময় মহারাণীর মৃতস্বামী প্রিন্স কন্সর্ট যে দুটী আংটী দিয়াছিলেন, তাহা তিনি এতকাল স্বামীকে স্মরিয়া পরিয়া আসিতেছেন—এখন বয়সাধিক্য বশতঃ আঙুল অত্যন্ত স্থূল হইয়া আংটী অপেক্ষা অনেক মোটা হয়ে পড়েছে, আর আংটীর চারধারে মাংস জমিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত যন্ত্রণা দিতেছে—তথাপি তিনি জীবন থাকিতে স্বামীর প্রথম উপাহার কাটিয়া আঙুল থেকে বাহির করিতে ইচ্ছুক নহেন। এরূপ পাতিব্রত্য ইংরেজ-মহিলাদের ত কথাই নাই, আমাদের হিন্দু-মহিলাদের পক্ষেও অতি গৌরবের বিষয়।

ইংরেজ স্ত্রীপুরুষেরা এরূপ স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ভাবী স্বামী স্ত্রী মনোনীত করিলেও বিবাহের প্রতিজ্ঞাভঙ্গের কথা মাঝে মাঝে শুনা যায়। ঐ কড়ারের পর স্ত্রীলোকের বিনা দোষে পুরুষ বিবাহে অস্বীকৃত হইলে স্ত্রীলোক প্রতিজ্ঞাভঙ্গের জন্য পুরুষের বিপক্ষে নালিশ করিতে পারে, মোকদ্দমা জিত হইলে পুরুষের অনেক অর্থদণ্ড হইয়া থাকে।

এন্‌গেজ্‌মেণ্টের পর পরস্পর ভাবী স্ত্রীপুরুষের মত ব্যবহার করে। দুজনে একসঙ্গে বেড়ায়, খেলা করে, গির্জ্জায় যায়, থিয়েটরে যায় ইত্যাদি। এই কোর্টশিপের কাল ছয়মাস হতে কাহারও ছয় বৎসর কাটিয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সকল দিকে সুবিধা না হলে ইংরেজরা বিবাহ-বদ্ধ হয় না। অনেকে পরস্পর সব ঠিকঠাক করিয়াও উঁহারা উপযুক্ত অর্থাভাবে অনেক দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে। ইংরেজরাও বিশুদ্ধ প্রণয়কে অতিশয় আদর করে, আর উহা মানবজীবনের পবিত্র বন্ধন বলিয়া স্বীকার

করে। উহাদের মধ্যে ব্যভিচার প্রশ্রয় পায় না, পুরুষেরা পর্য্যন্ত ব্যভিচারকে ভয়ানক পাপ বলিয়া ভাবে।

বিবাহের দিন সকলদেশেই অত্যন্ত ঘটা হইয়া থাকে। বরকনের ত কথাই নাই, বাড়ীর পরিবার ও ছেলে মেয়েদের আহ্লাদের সীমা থাকে না। আমাদের দেশের মত ঢাকঢোলের ও হুলুধ্বনির শব্দে গৃহ পূরিয়া যায় না বটে, কিন্তু মেয়েদের গানবাজনা ও হাসিধ্বনিতে সমস্ত বাড়ী রৈ রৈ করে। বিলাতে কন্যার পিতৃগৃহে বা রাত্রিতে বিবাহ হয় না; সকালবেলা গির্জ্জায় গিয়া বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ধনীলোকদের বিবাহে ফুল, পাতা, নিশান ইত্যাদি দিয়া গির্জ্জা ও বাড়ী সাজায়; ও খুব ভাল ভাল গাড়ী করিয়া বিবাহ করিতে যায়। এদেশের মত সে দেশেও বরের ছোট ভাই কি বন্ধু নীতবর হয়, আর অবস্থানুসারে কন্যার একটী হতে বারটী পর্য্যন্ত নীতকনে সাজিয়া থাকে। নীতবরকে 'বেষ্টম্যান' আর নীতকন্যাদের 'ব্রাইড্‌স্‌মেড' বলে।

সকলে গির্জ্জায় উপস্থিত হলে বর ও কন্যা বেদির নিকট দাঁড়াইয়া আচার্য্য ও আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করে যে, তাহারা পরস্পরকে স্ত্রী ও স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতেছে—জীবিত থাকিতে দুজনে পৃথক হইবে না, ইত্যাদি। পরে উভয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে ও তাঁহার আশীর্ব্বাদ চায়। আচার্য্য বাইবল হইতে কোন কোন অংশ পড়েন, নবদম্পতিকে উপদেশ দেন ও তাহাদের মঙ্গলের জন্য মঙ্গলময় পিতার নিকট প্রার্থনা করেন। এই প্রার্থনাতে উপস্থিত সকলেই যোগ দেন। এদেশের মত বিলাতেও পিতা কি বড় ভাই, কন্যাকে বরের হস্তে সমর্পণ করেন। বিবাহের প্রতিজ্ঞা ও প্রার্থনার পর বরকনে অন্য ঘরে গিয়া সকলের সমক্ষে রেজিষ্টারী পুস্তকে নিজেদের নাম সহি করে। বেদির কাছে দাঁড়াইয়া প্রতিজ্ঞার পর তাহাদের সম্বন্ধ ধর্ম্মমতে যেমন অলঙ্ঘনীয়, সেইরূপ এই রেজিষ্টারীতে নাম লেখার পর পতিপত্নীর সম্পর্ক আইনমতে অখণ্ডনীয় হয়। বিবাহক্রিয়া নির্ব্বাহ হলে বরকনে যখন গির্জ্জা হতে বাহিরে আসিয়া গাড়ীতে উঠে, তখন সেখানকার আচারানুসারে সমবয়স্কেরা বরের চারদিকে চাল ছড়াইয়া দেয় ও তাহাকে জুতা ফেলিয়া মারে। এ জুতা মারার প্রথা

অনেকটা এদেশের বরের কাণমলার মত। গির্জ্জা হতে সকলে আসিয়া কনের বাপের বাড়ীতে সমাগত হয়, ও আত্মীয়-বন্ধুরা মিলিয়া সকলে মহাভোজ লাগায় ও আমোদ আহ্লাদ করে।”

হিন্দু-স্ত্রীদের বামহাতের লোহার মত, সোণার সাদা আংটী ইংরেজমহিলাদের মধ্যে বিবাহের চিহ্নস্বরূপ, উহা তাহারা বামহাতের তৃতীয় অঙ্গুলে পরিয়া থাকে। সে দেশেরও প্রাচীনা ও কুসংস্কারাপন্ন স্ত্রীলোকেরা ঐ আংটী খোলাকে অমঙ্গলের চিহ্ন বলিয়া বিশ্বাস করে। ইংরেজদের মধ্যেও বিবাহের সময় সামাজিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দুচারিটী কুসংস্কার দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সে সব প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। হিন্দু ও ফরাসী পিতার মত ইংরেজ পিতাকে কন্যাদের বিবাহের সময় অনেক গহনা, টাকা বা কাপড় দিতে হয় না। অবশ্য, ধনীলোকেরা ইচ্ছা করিলে মেয়েকে বিষয় পর্য্যন্ত দিতে পারেন বটে, কিন্তু উহার কোন বন্দোবস্ত নাই। বিবাহের সময় যৌতুকের মত পিতামাতা আত্মীয় বন্ধুরা বরকনেকে নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য—ঘড়ি, চেন, পুস্তক, পোষাক, চাদার আসবাব—ইত্যাদি উপহার দিয়া থাকেন।

নববিবাহিত স্ত্রীপুরুষ কিছুদিনের জন্য কোন নূতন স্থানে গিয়া আমোদ করে। এই সময়কে ইংরেজীতে ‘হনিমুন’ অর্থাৎ মধুচাঁদ বলে। বোধ হয়, বিবাহের পর এই সময় সর্ব্বাপেক্ষা সুখকর বলিয়া ইহার এই মিষ্ট নাম। এইকালে নবদম্পতি সংসারের জ্বালা, সন্তানের উপদ্রব ও দাসদাসীর ঝঞ্ঝাট ইত্যাদি গার্হস্থ্য-জীবনের কোনপ্রকার কষ্টই জানে না—বিবাহিত জীবনকে কেবল সুখের আধার বলিয়াই বিশ্বাস করে। অবস্থানুসারে ৭৫ দিন হইতে ৬ মাস পর্য্যন্ত নূতন স্ত্রীপুরুষে হনিমুনে কাটায়, পরে বাড়ীতে আসিয়া নূতন সংসার আরম্ভ করে।

ইংরেজদের মধ্যে অবিবাহিতা স্ত্রীলোকদেরকে ‘মিস’ অর্থাৎ কুমারী, আর বিবাহিতাদেরকে ‘মিষ্ট্রেস্’ সংক্ষেপে মিসেস অর্থাৎ কর্ত্রী বা গিন্নি বলিয়া ডাকে। অনেকে মনে করেন, বিবাহের পর ইংরেজ স্ত্রীদের নাম বদলাইয়া যায়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। আমাদের অন্নপ্রাশনের সময় নামকরণের ন্যায় সেদেশে ধর্ম্মদীক্ষার সময় নাম রাখা হয়—পিতামাতারা

সেইকালে নিজ নিজ ইচ্ছামত সন্তানদের নাম দেন। সেই নামকে খৃষ্টান বা ডাকনাম বলে, তাহা কখন বদলায় না। বিবাহের পর আমাদের দেশেও যেমন স্ত্রীরা পিতৃপরিবারের নাম বা পদ্ধতি ছাড়িয়া স্বামিকুলের নাম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, বিলাতেও সেইরকম। মিস্ বেল জোন্সের কোন হণ্টরের সঙ্গে বিবাহ হলে তার নাম মিসেস্ বেল হণ্টর হইয়া থাকে।

ইংরেজদের মধ্যে মামাতো, পিসতুতো, মাসতুতো ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ হইয়া থাকে, এরূপ ঘরে ঘরে বিবাহে তাহাদের কোন আপত্তি নাই, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সেখানে স্ত্রী মরিয়া গেলে তার ভগিনীকে বিবাহ করিবার রীতি নাই, উহা আগে সমাজ ও আইনবিরুদ্ধ ছিল, এখন তাহারা অনেক চেষ্টায় আইন পাশ করিয়াছে বটে, কিন্তু সমাজে এখনও চলিত হয় নাই।

সেদেশে বিবাহিত ছেলেমেয়েরা পিতামাতার সঙ্গে এক বাড়ীতে বাস করে না; নবদম্পতি একটী ভিন্ন বাড়ীতে নিজেদের নূতন সংসার স্থাপন করে। তখন থেকে তাহাদের গার্হস্থ্যজীবন আরম্ভ হয়।

শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস।

প্রবাস-চিত্র (সমালোচনা)।

"প্রবাস-চিত্র" অর্থাৎ বঙ্গীয় সাময়িক সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত সুলেখক শ্রীযুক্ত বাবু জলধর সেন বিরচিত তাঁহার নিজের ভ্রমণ-কাহিনী। বিলাত-প্রত্যাগত কতিপয় ব্যক্তি-লিখিত "ভূ-প্রদক্ষিণ" প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থে বৈদেশিক বিবরণ কিয়ৎ পরিমাণে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও, বাঙ্গলা বা ভারতীয় সাহিত্যে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত নূতন কথা। বাঙ্গালী বা হিন্দু তীর্থ পর্য্যটন করিতেন, এখনও করেন। হিন্দু-সন্ন্যাসিগণ কত কত বৎসর ধরিয়া ভারতের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এ ভ্রমণের উদ্দেশ্য ভিন্ন, ইহার মূলে স্বার্থ ভিন্ন পরার্থ কখনও ছিল না থাকিয়া থাকে, এরূপ কেহ জ্ঞাত নহে—স্বদেশ, স্বজাতি বা মানব-সাধারণের উপকার বা

উন্নতি-সাধন, মাতৃভাষার সেবা বা ভূপৃষ্ঠসম্বন্ধে সভ্য জগতের জ্ঞানবৃদ্ধি জীবনের সংকল্প করিয়া বাঙ্গালী কখনও দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন, এরূপ শুনি নাই। পাশ্চাত্য পর্য্যটকগণ বিবিধ অভীষ্ট সাধন মানসে বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন এবং করিয়া থাকেন। কেহ বা দূরদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও শিল্প-গৌরবের উজ্জ্বল চিত্রে জাতীয় সাহিত্য অলঙ্কৃত করিবার মানসে বিভিন্ন দেশের সুশোভন স্থানাদি পরিদর্শন করিতে যান, কেহ বা বৈদেশিক রীতিনীতি শাসন ও কার্য্যপদ্ধতি সম্যক্ আলোচনা করিয়া স্বদেশে সংস্কার প্রবর্ত্তনের পথ উদ্ভাবনে যত্নবান; কেহ বা সভ্যতার আলোক প্রসারিত করিবার জন্য, সভ্যতার ফল সর্ব্বত্র মানবজাতির উপভোগে আনিবার অভিলাষে, আন্তর্জাতিক সম্মিলনের উপায় স্বরূপ, গমনাগমনের সহজ পথ আবিষ্কারে নিযুক্ত হইয়া গিরিনদী বনপ্রান্তর অতিক্রম করেন, কেহ বা পৃথিবীর অজ্ঞাত প্রদেশ আবিষ্কার করিয়া স্বজাতীয় উপনিবেশ-সংস্থাপন, স্বজাতির বাণিজ্য-বিস্তার বা লুক্কায়িত প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য সভ্যজগতের জ্ঞান-গোচরে আনিয়া মানবসমাজের সুখ সংবর্দ্ধন করিতে প্রয়াসবান। মানবকুলের ভবিষ্যদ্বংশীয়দের কখন কোন উপকারে আসিতে পারে, কেবলমাত্র এই বিশ্বাসে মানবের ভৌগোলিক জ্ঞানবৃদ্ধির প্রয়াসে কত মহাত্মা মেরু-প্রদেশের তুহিনরাশিতে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন। ইহারাই প্রকৃত পর্য্যাটক, এইরূপ পর্য্যটনেই পৃথিবীর মঙ্গল সাধিত হইবার সম্ভব। স্বজাতি বা মানবকুলের উপকারকল্পে এরূপ আত্মোৎসর্গের, এরূপ গৌরবের দিন বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে কখনও হইয়াছিল কি না জানি না, কখনও হইলে কত দিনে হইবে, তাহাও ভবিষ্যদ্গর্ভে নিহিত। বর্ত্তমানে গৌরব করিবার এরূপ কিছু আমাদের নাই, এ কথার প্রতিবাদ বোধ হয় কেহ করিবেন না, জলধর বাবুও প্রকৃত পর্য্যাটক নহেন। তিনি শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তির অন্বেষণে দেশত্যাগী হইয়াছিলেন, তবে তিনি সুশিক্ষিত, মার্জ্জিতরুচি এবং সহৃদয়াশয়, নিজের হৃদয়ের ব্যথা প্রশমিত করিবার আশয়ে নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া যাহা দেখিয়াছেন, যাহা শুনিয়াছেন, তাহা মাতৃভাষার সেবায় নিয়োগ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি কৃতকার্য্যও হইয়াছেন, যে ভ্রমণ তিনি প্রথমে লক্ষ্যহীন মনে করিয়াছিলেন, তাহা মহদুদ্দেশ্যে প্রযুক্ত করিয়াছেন; তিনি

শিক্ষিত বাঙ্গালীর ধন্যবাদের পাত্র। এ দুঃখময়, এ জালাময় সংসারে জলধর বাবুর সমদুঃখীর সংখ্যা কম নহে, যাহারা তাঁহার ন্যায় ব্যথিত হৃদয়ে শান্তির তল্লাসে ছুটাতে সর্ব্বদা ব্যগ্র; সুতরাং তাঁহার ভ্রমণোদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতির অভাব হইবে না, অনেকে কৌতূহলপরবশ হইয়া তাঁহার গ্রন্থ পড়িবে।

জলধর বাবু তাঁহার গ্রন্থ ভ্রমণ-কাহিনী নামে আখ্যাত করেন নাই; তাঁহার গ্রন্থের নাম প্রবাস-চিত্র, অর্থাৎ তিনি যত কাল প্রবাসী ছিলেন, সেই সময় মধ্যে তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন এবং যাহা শুনিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ের বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়া তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব তাঁহার গ্রন্থ একখানি বড় রকমের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত নহে, অথবা তিনি প্রকৃত পর্য্যটক নহেন, ইহা বলিয়া তাঁহার নিন্দা করিবার, তাঁহার প্রবাস-চিত্রে দোষারোপ করিবার আমাদের অধিকার নাই। কল্পিত উৎকর্ষের অভাব দেখাইয়া সমালোচনা করা ন্যায়সঙ্গত নহে। প্রবাস-চিত্রে যাহা আছে, আমরা তাহারই সমালোচনা করিব, এবং তাহার সৌন্দর্য্য যাহা তাহাই যখন আমাদের আদরের জিনিস, আমরা তাহার দোষানুসন্ধানে বিশেষ তৎপরতা দেখাইবার চেষ্টা করিব না। প্রবাস-চিত্র উচ্চ দরের ভ্রমণ-কাহিনী না হইলেও, তাহাতে অনেক সৌন্দর্য্য আছে, তাহাতে প্রশংসার জিনিস অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। লেখক সুশিক্ষিত, উচ্চনীতি, চিন্তাশীল ও উদারপ্রকৃতি হইলে, তিনি মূলে যে বিষয় অবলম্বন করিয়াই লিখিতে প্রবৃত্ত হউন না কেন, তাঁহার শিক্ষা ও প্রকৃতির পরিচয় তাঁহার লেখায় সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকে। প্রবাস-চিত্রের গ্রন্থকার উচ্চশ্রেণীর ভ্রমণকারী না হইলেও তাঁহার শিক্ষা, রুচি, প্রকৃতি ও সৌন্দর্য্যানুভূতি সর্ব্বত্র প্রশংসনীয়; তাঁহার হৃদয় প্রীতিপ্রবল ও পরহিতেচ্ছু; তিনি শোকপীড়িত হৃদয়েও উদ্যমশীল, আপনা ভুলিয়া পরোপকার করিতে এবং কর্ত্তব্যের অনুসরণে বিমুখ নহেন। তিনি মাতৃভাষার ঐতিহাসিক সাহিত্যের শরীর পুষ্ট করিবার জন্য প্রচলিত ইতিহাস-গ্রন্থে সচরাচর যে সকল ঘটনার উল্লেখ বা বিস্তৃত বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায় না, এরূপ কোন ঘটনার বিবরণ প্রাপ্ত হইলেই তাহা সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, রুচিবিগর্হিত কার্য্য বা নীচপ্রকৃতির চিহ্ন তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইলেই তৎপ্রতি কটাক্ষ করিতে তিনি ত্রুটি করেন নাই। যে হৃদয়ে প্রকৃতির ছবি প্রতি-

বিম্বিত হয়, স্বভাবের সহিত সহানুভূতিতে যে হৃদয় সমর্থ, সে হৃদয় কবিত্ব-বিহীন নহে; জলধর বাবু ভাবুক, তিনি ভাবুক এবং ভক্তও বটেন।

বলিয়াছি জলধর বাবু উদারপ্রকৃতি, তাঁহার হৃদয় প্রীতিপ্রবল, ইহা তাঁহার লেখা পড়িয়া বেশ বুঝা যায়। এরূপ হৃদয় সর্ব্বত্র প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনে সমর্থ। পরোপকার এরূপ হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া, স্বদেশ ও বন্ধুবান্ধবের নিকট বিদায় হইয়া, শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে, শান্তির অন্বেষণে, জলধর বাবু প্রবাস-যাত্রা করিলেন; স্বদেশ পরিত্যাগ ও বন্ধুবিরহজনিত বিষাদ-চিন্তায় মগ্ন, রেলগাড়ীতে বসিয়া তিনি আপনার কথা আপনার মনে ভাবিতেছেন। ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছে; এমন সময়ে গাড়ীর দরজায় খট্‌খট্ শব্দ হইল, তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি উঠিয়া বসিলেন, একটী হিন্দুস্থানী যুবক শিশুসন্তান ক্রোড়ে তাহার কনিষ্ঠা ভগিনীকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া তাহাকে একটু বসিবার স্থান দিবার অনুরোধ করিয়া, ষ্টেসন-ঘরের দিকে তাহার জিনিষপত্র আনিতে গেল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল, সে উঠিতে পারিল না, নিরাশ্রয়া রমণী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল, ব্যাকুল হইয়া গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িবার উদ্যোগ করিল। জলধর বাবু নিবারণ করিলেন, তাঁহার পরোপকার প্রবৃত্তি জাগরিত হইল, তিনি আপনা ভুলিলেন, রমণীকে আশ্বস্ত করিলেন—প্রতিশ্রুত হইলেন তাহাকে তাহার পিত্রালয়ে পৌঁছাইয়া রাখিয়া যাইবেন। রমণীকে অস্থিরচিত্ত দেখিয়া তিনি তাহার শিশু সন্তানটী কোলে লইয়া বসিলেন, পরে ঘুমাইলে তাহার মাতার ক্রোড়ে অর্পণ করিলেন। গাড়ী যথাস্থানে পৌঁছিল, রমণীর সহিত অবতরণ করিয়া তাহাকে তাহার পিত্রালয়ে লইয়া গেলেন, তথায় দুই এক-দিনের জন্য তাহাদের আতিথ্য স্বীকার করিয়া, তাহাদের শান্তি সন্তুষ্টি ও সহৃদয়তায় প্রীত হইয়া, পুনরায় প্রবাস-পথে যাত্রা করিলেন। প্রবাস-চিত্র-প্রণেতার এই পরোপকার কার্য্যে অসাধারণ আত্মত্যাগ বা আত্মবিসর্জন কিছু না থাকিলেও, ইহাতে তাঁহার প্রকৃতি, তাঁহার হৃদয়ের গতি সূচিত করিতেছে। জলধর বাবু তাঁহার গ্রন্থশেষে যে অতি-প্রকৃত কথার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও আমি এইরূপ পরোপকার প্রবৃত্তির, এইরূপ পরোপকার প্রবৃত্তির উচ্চ বিকাশ মনে করি। অতি-প্রকৃতে বিশ্বাস করিলে জীবন কবিত্বময়

হয়। যাহারা তাহা করিবেন না, তাঁহারা এরূপ বিশ্বাস করিতে বাধ্য কি যে কুটীরবাসী সন্ন্যাসী স্বয়ং না হউন, তাঁহার নিকট পরহিত-ব্রতে দীক্ষিত তাঁহার কোন শিষ্য মৃতপ্রায় অবস্থায় জলধর বাবুকে জলপান করাইয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিল। সন্ন্যাসী অতঃপর কার্য্যতৎপর হইলে, নিজেই যে অতি অল্প সময়ে কোন গুপ্ত সহজ পথে গিয়া ব্রত পালন করিয়া ফিরিয়া আসেন নাই কে বলিবে? এরূপ সন্ন্যাসী ভারতে কয়টি আছে জানি না, থাকিলে সন্ন্যাস-ধর্ম্মে পরহিতার্থে আত্মোৎসর্গ নাই এ কথা মনে করা যাইতে পারে না। কবিবর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার চন্দ্রশেখর আখ্যায়িকায় এইরূপ কল্পিত চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন। রমানন্দ স্বামী তাঁহার আদর্শ সন্ন্যাসী, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি তাঁহার মন্ত্রশিষ্য। এ আদর্শ বিশ্লেষণ করিলে তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়, অসীম জ্ঞান, অসাধারণ আত্ম-সংযম, পরহিতে আত্মোৎসর্গ, পরিশ্রমে অক্লান্তি, ক্ষমা, দয়া, গাম্ভীর্য্য, দৃঢ়তা, সাহস, স্বাধীনতা, উদারতা, বল, বীর্য্য ও কর্ম্ম-কুশলতা, একান্তচিত্তে, অলক্ষিত ভাবে, যশের জন্য নহে, কর্ত্তব্য জ্ঞানে, ব্রতপালন-মানসে, সতত পরোপকার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিব, এইরূপ দৃঢ় সংকল্প। সর্ব্বত্র, সকল অবস্থায়, প্রকৃত পরোপকার করিতে হইলে, এ সকল গুণেরই প্রয়োজন, তাই বঙ্কিম তাঁহার আদর্শ সন্ন্যাসীতে এ সকল গুণের সমাবেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, সামান্য পরোপকার কার্য্যের উল্লেখ করিতে গিয়া পরহিতব্রতাবলম্বী সন্ন্যাসীর উচ্চ আদর্শের অবতারণা করা হইল কেন। আমি বলি, কোন কার্য্য সামান্য হইলেও, তাহার আনুষঙ্গিক অবস্থার আলোচনা করিতে গেলে, যদি উক্ত আদর্শের চিন্তায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইতে হয়, তবে সে সামান্য কার্য্যও প্রশংসনীয়; সে সামান্য কার্য্যেরও বিশেষ একটা মূল্য হইয়া উঠে, কেননা তাহার আলোচনায় [illegible] হৃদয়ে, মনুষ্যত্ব উন্নত হয়। হিমালয়বাসী স্বামী ও তাঁহার শিষ্যবর্গের প্রতি জলধর বাবুর [illegible] তিনি আমাদের নিকট [illegible] এক স্থানে সুন্দর বলিয়া [illegible] ব্যতীত [illegible] হয়। জলধর বাবু [illegible] বলিতেছেন—"তাহাকে দেখিয়া [illegible] সুন্দর শিশু ও তাহার

স্নেহময়ী মাতার কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল—তাহারা আর এ পৃথিবীতে নাই।" ইহাই জলধর বাবুর সন্ন্যাসাবলম্বনের কারণ, এই দুঃখ প্রশমনের জন্যই তিনি প্রবাস-যাত্রা করিয়াছিলেন।

প্রবাস-চিত্র-প্রণেতা স্বভাব সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী, কাব্যে প্রকৃতির চিত্রে তাঁহার অনুরাগ বেশী, তিনি স্বভাব-কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি ভক্ত। তাঁহার হৃদয়ে প্রতিফলিত স্বভাবের প্রতিকৃতি যেখানেই তাঁহার পূর্ব্ব স্মৃতির সহিত মিলিয়া গিয়াছে, সেইখানেই তিনি, উভয় ছবি একত্র করিয়া, তাঁহার পাঠকবৃন্দের সম্মুখে ধরিয়া, তাহাদের মিলিত সৌন্দর্য্যে, তাঁহাদের আনন্দ বর্দ্ধনের চেষ্টা করিয়াছেন। সঙ্গীতেও জলধর বাবুর অধিকার আছে বলিয়া বোধ হয়, যেখানে প্রকৃতির ছবি তাহার অনুরূপ ভাব তাঁহার হৃদয়ে উদ্বোধিত করিয়া দিয়া সঙ্গীত-প্রবাহে সে ভাব প্রবাহিত করিবার প্রবৃত্তি উদ্রিক্ত করিয়াছে, সেখানে অনুস্মৃতি পূর্ব্বাভ্যস্ত বা পূর্ব্বশ্রুত সঙ্গীতের উপনয়ন করিতে ত্রুটি করে নাই। সময় ও অবস্থার উপযোগী সঙ্গীত অন্যকণ্ঠনিঃসৃত হইলেও, সে সঙ্গতি গায়ক নিজে অনুভূত করিয়া থাকুন বা না থাকুন, জলধর বাবু তাহা সম্পূর্ণ অনুভূত করিয়াছেন। আমরা এই স্থলে প্রবাসচিত্রের এক স্থানে জলধর বাবু রেলগাড়ীর যে চিত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব। ইহাতে দুই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে—আমরা উপরে যাহা বলিলাম, তাহার কতকটা সপ্রমাণিত হইবে এবং লেখক অবলোকিত দৃশ্যের অবিকল চিত্র কিরূপ করিতে পারেন, তাহারও পরিচয় পাওয়া যাইবে। "গাড়ী যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, লোক জনের ভিড়ও তত বাড়িয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে কথা, গল্প, হাস্য, পরিহাস, গণ্ডগোল—সে সকলের আর ইয়ত্তা রহিল না। এক জন তাঁহার ভ্রাতার সঙ্গে পৃথক হওয়ার গল্প বলিতেছি[illegible] শুনিলাম, তাঁহার সহোদর কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত পরিমাণে [illegible] এবং তাহাই তাঁহাদের এই পারিবারিক বিপত্তির কারণ। আর এক জন লোক তাহার [illegible] [illegible] ফাঁকি দিয়ে এক জন যুবকের সঙ্গে [illegible] [illegible] এক জন বেঞ্চে হেলান দিয়া গান গাহিতেছিল; হঠাৎ অর্দ্ধপথে গান [illegible] পার্শ্ববর্ত্তী আর এক জনকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাশয়! কটা একবার দেবেন?' নিকটে

আর একটি তাম্রকূটপায়ী কম্বেটোতে একটা দম দিবার জন্য অনেকক্ষণ হইতে উমেদার ছিল, সে তাহার অধিকার-হানির সম্ভাবনা দেখিয়া একটু রাগিয়া চোখ গরম করিয়া উঠিল; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত গায়কবর তাহাতে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া দুইটা উৎকট দমে কলিকা-সঞ্চিত তামাকটুকু নিঃশেষ করিয়া সেই গরম লোকটার হাতে দিল, এবং পূর্ব্ববৎ গাহিতে লাগিল,—

'ঘোরা তিমিরা রজনী, সজনি,
না জানি কোথায় শ্যাম গুণমণি,
পৃষ্ঠে দুলিছে লম্বিত বেণী।' ইত্যাদি।

পৃষ্ঠে লম্বিত বেণী দুলার কথা মিথ্যা, তবে মস্তকে একটা অনতিদীর্ঘ শিখা দুলিতেছিল বটে এবং গায়কবর শ্যাম-দরশনের জন্য কিরূপ কাতর হইয়াছিলেন, শুধু গান শুনিয়া তাহা ঠাহর করা যায় না; কিন্তু সেটি যে, 'ঘোরা তিমিরা রজনী', তাহাতে আর সন্দেহ ছিল না।

* * * * * *

* * মাথা তুলিয়া দেখি, আমার কামরার দ্বার ধরিয়া এক লোক টানাটানি করিতেছে। কামরাটি এমন নিস্তব্ধ যে, ভদ্রলোকটি শ্যাম-দরশনের আশায় হতাশ হইয়া বেহাগ গাইয়া বিরহ জ্বালা মিটাইতে ছিলেন, দেখিলাম, আর একটা বেঞ্চে তাঁর মুণ্ডুটা লুটাইতেছে। যুদ্ধশেষে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত বীরের ন্যায় যাত্রিদল গাড়ীতে নানারকম ভঙ্গী করিয়া শুইয়া পড়িয়াছে।" অল্প কথায় গায়কবরের সঙ্গীতের সহিত তাঁহার হৃদয়ভাবের অসঙ্গতি এবং তাঁহার সঙ্গতি-বোধ-বিহীনতা প্রদর্শিত হইয়াছে, যে হৃদয়ে এ অসঙ্গতি বাধিতেছিল, তাহারও পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, ইহা মানুষের হৃদয়-শূন্যতার প্রতি সুন্দর কটাক্ষ।

প্রবাস-চিত্রে [illegible] ঈশ্বরভক্তি এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ। [illegible] অপূর্ব্ব সৃষ্টি দেখিয়া ভক্তের হৃদয় কৃতজ্ঞতারসে আপ্লুত হয়, যিনি অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধার, তাঁহার দিকে হৃদয় প্রধাবিত হয়, মনের আনন্দ স্তোত্র বা সঙ্গীতে স্ফুরিত হইতে থাকে। জলধর

বাবু ও তাঁহার বন্ধু, পালাপাণি পাহাড় দেখিতে গিয়া সে স্থানের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া, উভয় বন্ধু শালবৃক্ষের মূলে বসিয়া, রবি কবিকে স্মরণ করিয়া মুক্ত প্রাণে গাহিয়াছিলেন——

"তাঁহারি আনন্দধারা জগতে যেতেছে বয়ে,
এস সবে নরনারী আপন হৃদয় লয়ে।
সে আনন্দে উপবন, বিকশিত অনুক্ষণ,
সে আনন্দে ধায় নদী আনন্দ বারতা কয়ে॥
সে পুণ্য নির্ঝর স্রোতে বিশ্ব করিতেছে স্নান,
রাখ সে অমৃতধারা পূরিয়া হৃদয় প্রাণ;
তোমরা এসেছ তীরে, শূন্য কি যাইবে ফিরে,
শেষে কি নয়ন নীরে ডুবিবে তৃষিত হয়ে।
চিরদিন এ আকাশ নবীন নীলিমাময়,
চিরদিন এ ধরণী যৌবনে ফুটিয়া রয়;
সে আনন্দরস পানে চিরপ্রেম জাগে প্রাণে,
দহেনা সংসার তাপ সংসার-মাঝারে র'য়ে।"

এইরূপে "প্রাণের আনন্দ ও উচ্ছ্বাস সঙ্গীতে ধ্বনিত" করিয়া, গ্রন্থকার নিম্নোদ্ধৃত বাক্যে, রবি কবির প্রতি তাঁহার ভক্তির প্রমাণ প্রদান করিয়াছেন——

"গানের শেষে মনে হইল, এই নির্ঝরপার্শ্বে, শৈল-অন্তরালবর্ত্তী এই তরুচ্ছায়ায়, প্রকৃতির এই রমণীয় নিভৃত কুঞ্জে প্রকৃতির কবি পূজনীয় রবীন্দ্রনাথকে বসাইয়া যদি তাঁহার মুখে এই গানটী শুনিতে পাইতাম, তাহা হইলে চতুর্দ্দিকের এই পবিত্র সৌন্দর্য্য আরও সুন্দর বলিয়া বোধ হইত। এই সঙ্গীতশ্রবণে হয়ত তাহার যথার্থ উপভোগ হইত, এবং হৃদয়ের পিপাসাও কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইত। চক্ষুদ্বারা সর্ব্বদা সকল সৌন্দর্য্যে অনুভব করা যায় না, কিন্তু কর্ণে যদি মধুর ভাষায় সেই সৌন্দর্য্যের [illegible] ধ্বনিত হয়—এবং সঙ্গে সঙ্গে সকল সৌন্দর্য্যের [illegible] তাহার বিকাশ অনুভব করা যায়, তাহা হইলে হৃদয়ের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা অনেকাংশে পরিতৃপ্ত হয়। যখনই যে সুন্দর স্থানে গিয়াছি, কবিবরের রচিত সেই সকল স্থানের রমণীয় দৃশ্যবৎ

সুন্দর গান গাহিতে ইচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু এ ভাঙ্গা গলায় শূন্যহৃদয়ে কি তেমন করিয়া গাহিতে পারা যায়?—পারি নাই, তাই সেই দূর প্রবাসে, নির্জ্জন অরণ্য, হৈমমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ, উপলসঙ্কুল খরস্রোতা পার্ব্বত্য প্রবাহিণী, প্রকৃতির প্রমোদ উদ্যান, সকল সুন্দর স্থানেই কবিবরের অভাব বড় গভীরভাবে অনুভব করিয়াছি।"

আমরা যে কেবল রবি কবির প্রতি গ্রন্থকারের অগাধ ভক্তি সপ্রমাণিত করিবার জন্য তাঁহার প্রবাস-চিত্র হইতে উল্লিখিত অংশ উদ্ধৃত করি নাই, তাহা বলা বাহুল্য। উদ্ধৃতাংশ একাধিকরূপে লেখকের পরিচয় দিতেছে। প্রকৃতির সুন্দর মূরতি দর্শনে তাঁহার মন যে কিরূপ ভাবে ভরিয়া যায়, তাঁহার কিরূপ তন্ময়তা জন্মে, ইহা তাহারও প্রমাণ। উদ্ধৃতাংশ তাঁহার লিপিকুশলতারও আদর্শ। শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তির কাঙ্গাল হইয়া, জলধর বাবু বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ভাবার কাঙ্গাল নহেন, তাঁহার লিপিনৈপুণ্য বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। আমরা এইস্থলে লেখকের লিপিশক্তির আর দুই একটী দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিব।—চন্দ্রভাগা নদীতীরস্থ একটী দৃশ্য বর্ণন করিতে করিতে গ্রন্থকার বলিতেছেন—

"জীর্ণ মন্দিরটীর একদিকের দেওয়াল ফাটিয়া গিয়াছে, এবং তাহারই ভিতর হইতে একটী নির্ঝর বাহির হইয়া চন্দ্রভাগায় মিশিয়াছে। এই নির্ঝরের জল কেমন নির্ম্মল; যেন বীরের শরাঘাতে বিদীর্ণবক্ষা বসুন্ধরার মর্ম্মস্থান হইতে প্রসন্নসলিলা ভোগবতী সমুদ্ভূত হইয়া তৃষাতুরের অভীষ্ট সিদ্ধ করিতেছেন। ভগ্নমন্দিরের সোপানে বসিয়া, এই ক্ষুদ্রকায়া তরঙ্গিণীর অনাবিল পুণ্যপ্রবাহের দিকে চাহিয়া, কত কথাই ভাবিতে লাগিলাম; এই শুভ্র দিবালোকে বায়ুহিল্লোলিত উন্নত বৃক্ষরাজির ঘন পল্লবের সঘন মর্ম্মর শব্দ, নদীর অস্ফুট কলধ্বনির সহিত মিশ্রিত হইয়া যুগান্ত-প্রবাহিত মহত্তাতানের ন্যায় শ্রুত হইতে লাগিল, বুঝি ইহা বিশ্বপিতার অনাহত যশোগীতির ক্ষীণ প্রতিধ্বনি।"

উত্তর-কাশী বর্ণন করিতে গিয়া গ্রন্থকার লিখিতেছেন—

"একটী সুন্দর, অপার্থিব পুণ্যতীর্থ দিব্যতা ও প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ হইয়া নয়নসমক্ষে উদ্ভাসিত হয়। চতুর্দ্দিকে সমুন্নত গিরিশৃঙ্গ, মধ্যে অনতিবিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্রে উত্তর-কাশী প্রতিষ্ঠিত। সেই পবিত্র পীঠতল প্রক্ষালন-

পূর্ব্বক প্রসন্নসলিলা কলনাদিনী ভাগীরথীর পুণ্যপ্রবাহ অসংখ্য উপলখণ্ডে প্রতিহত হইয়া দ্রুত প্রবাহিত হইতেছে। চির-তুষার-মণ্ডিত শুভ্র গিরিশৃঙ্গগুলি যেন মস্তকে শ্বেত শিরস্ত্রাণ পরিধানপূর্ব্বক শ্যামল তরুরাজিতে মধ্যদেশ আবৃত করিয়া কোন মহাপুরুষের অলঙ্ঘ্য ইঙ্গিত অনুসারে এক স্মরণাতীত যুগ হইতে বিশ্বস্ত প্রহরীর ন্যায় এই দেবভূমিকে রক্ষা করিতেছে। নিদাঘের খর-রৌদ্রোদ্ভাসিত উজ্জ্বল মধ্যাহ্ন এবং শীতের তুষার-সমাচ্ছন্ন-কুজ্ঝটিকাময়ী হিমযামিনী—সর্ব্বকালেই এক মধুর প্রশান্তিতে এই পুণ্যভূমি পরিব্যাপ্ত থাকে।"

আর একটী স্থল উদ্ধৃত করিয়া আমরা সমালোচনার এই অংশ শেষ করিব। তাহা কেবল লেখকের ভাষা-কৌশলের দৃষ্টান্ত নহে, তাহাতে তাঁহার চিন্তাশীলতারও পরিচয় আছে।—তাঁহার সঙ্গী বন্ধু মুগ্ধনেত্রে কোন সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে বলিতেছেন, "এমন সুন্দর দৃশ্যের মধ্যে ডুবিয়া থাকিলে জীবনের পূর্ণ উপভোগ হইতে পারে। এই সমস্ত সৌন্দর্য্যের অনুভূতি জ্ঞানানুভূতি অপেক্ষা কত মহত্তর; এই সৌন্দর্য্যানুভূতি তখনই সার্থক হয়, যখন তাহা সেই পরমসুন্দর পুরুষকে বা মহিমান্বিতা অনন্ত প্রকৃতির অখণ্ড মাধুরীকে ধারণা করিতে পারে। আমরা বৃথা জ্ঞানের উদ্বোধনে রত রহিয়াছি, ইহাতে না আছে তৃপ্তি, না আছে শান্তি; ইহাতে কেবল অহঙ্কার বৃদ্ধি করে, এবং সন্দেহের ভিতর হইতে আমরা গভীরতর সন্দেহে ডুবিয়া যাই।" তিনি বলিলেন, "জগতের অভিব্যক্তিই সৌন্দর্য্যমূলক; এমন কি, জ্ঞানের মধ্যেও যদি সৌন্দর্য্যের বিকাশ না থাকিত, তাহা হইলে জ্ঞানের এত আদর থাকিত না। জ্ঞান অপেক্ষা বিধাতার সৌন্দর্য্যেই অধিক প্রীতি, এবং এই কথা য়ুনানীর অন্ধকবি মিল্টন অতি সুন্দর বুঝিয়াছিলেন, তাই আদমকে জ্ঞানের পরিবর্ত্তে চির-সৌন্দর্য্যের লীলা-নিকেতন ত্রিদিবের প্রমোদকানন পরিত্যাগ করিতে হইল।"

তাহার পর অনেকটী ক্ষুদ্র কথা। কলুঙ্গার যুদ্ধে গুর্খাজাতীর বীরত্বের কথা ইতিহাসে সবিশেষ উল্লিখিত হয় নাই। তাহাদের বল ও সাহসের সম্মুখে সুশিক্ষিত ইংরেজ সৈনিকগণকেও বিমুখ হইতে হইয়াছিল, একথা ইংরেজ ইতিহাস প্রণেতৃগণ, জাতীয় গৌরব রক্ষার জন্য, লিপিবদ্ধ করেন নাই। গ্রন্থকার ইংরেজ ইতিহাস-লেখকদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিতে-

ছেন, "মানুষ চিত্রকর, তাই সিংহ মানবহস্তে পরাভূতরূপে চিত্রিত হয়, ইহা কোন বিখ্যাত গ্রন্থের লেখকের উক্তি,—কিন্তু চিরকালই কি এ নিয়ম থাকিবে? ইহাতে মনুষ্যের বল এবং কৌশল প্রমাণিত হউক, কিন্তু মহত্ব প্রমাণিত হয় কি না সন্দেহ।" কথাটী ক্ষুদ্র, কিন্তু যে নীচ নীতির প্রতি ইহার কটাক্ষ, তাহার ফলাফলের বিষয় চিন্তা করিতে গেলে, এ ক্ষুদ্র কথা অতি বৃহদাকার ধারণ করে।

কোন এক ঝরণার জলে লতাপাতা যাহা কিছু পড়ে, পাথর হইয়া যায়। এই কথার আলোচনা করিতে করিতে, লেখক বলিতেছেন, "কোমল লতা পাষাণের সঙ্গে থাকিয়া নিজেও পাষাণ হইয়াছে! কত দেবচরিত্র যে নরপিশাচদের সহবাসে মনুষ্যত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়া পশুত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহার সংখ্যা নাই!" এ আর একটী ক্ষুদ্র কথা; কথাটী ক্ষুদ্র এবং সাধারণ, কিন্তু উহাতে লেখকের প্রকৃতির কতকাংশ প্রতিবিম্বিত হইতেছে। যাহা কিছু দেখিতে প্রস্তরবৎ, তাহাই তিনি, প্রস্তরখণ্ড বলিয়া, তুচ্ছ বা ঘৃণা করিতে প্রস্তুত নহেন। মানবচরিত্র-বিচারে তিনি উদারপ্রকৃতি।

আর একটী ক্ষুদ্র কথায় আমরা প্রবাস-চিত্র-প্রণেতার স্বদেশ-প্রেম দেখিতে পাই। কোন গুর্খা সৈনিকের বীরত্ব ও স্বদেশানুরাগের কথা শুনিয়া তিনি গাহিয়াছিলেন :—

"তোমারই তরে মা সঁপিনু বীণা, তোমারই তরে মা
সঁপিনু প্রাণ,
তোমারই তরে এ আঁখি ঝুরিবে, তোমারই তরে মা
গাহিব গান।"

আমরা প্রবাসচিত্রের কোন কোন স্থান বুঝিতে পারি নাই, গ্রন্থকার একস্থলে বলিতেছেন, "অতৃপ্তি অশান্তি লইয়া আমি হিমালয়ের মহামহিমাময় সৌন্দর্য্য-সাগরে ডুবিতে পারিতাম না। স্বর্গের সুন্দর মনোমোহন দৃশ্যপট আমার নয়নসমক্ষে নূতন শোভায় উদ্ভাসিত হইয়া আবির্ভূত হইত, আমার অশান্ত প্রেমহীন নীরবদৃষ্টির ঔদাসীন্য তাহাদিগকে দূরে অপসারিত করিয়া দিত; নন্দনকাননের অপূর্ব্ব শোভা আমার তাপিত বক্ষে প্রেমের সঞ্চার করিত না। এত বিড়ম্বনা, এত নিরাশাকে সঙ্গী করিয়া পথ চলিবার কষ্ট

বুঝাইবার নহে—ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, কাহাকেও যেন বুঝিতে না হয়।” সুন্দর লেখা। কিন্তু বুঝিলাম না, স্ত্রীপুত্রবিয়োগদুঃখ সংসারে বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া যাঁহাকে সন্ন্যাস অবলম্বন করাইল, তাঁহার হৃদয়ে তৃপ্তি অতৃপ্তির কথা আসে কোথা হইতে। বৈরাগ্য এবং আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি-জনিত দুঃখ, এ উভয়ের সামঞ্জস্য হয় কিরূপে জানি না। অন্যান্য স্থলে লেখক প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে বিশেষ অনুরাগই প্রকাশ করিয়াছেন, সে মাধুর্য্য চিন্তা করিয়া অনেক সময়ে তাঁহার হৃদয় ভাবে ভোর হইয়াছে। এখানে অন্যরূপ কথা কেন? প্রবাসচিত্র পড়িয়া আমরা জলধর বাবুকে প্রেমিক বলিয়াই বুঝিয়াছি; স্ত্রীপুত্রের প্রতি প্রেমাধিক্য না থাকিলে, তাহাদের বিয়োগে বৈরাগ্য জন্মে না; মনুষ্যে প্রেম না থাকিলে, পরোপকারে প্রবৃত্তি হয় না; ইহার পর স্বদেশপ্রেম, স্বজাতিপ্রেম, সর্ব্বোপরি ঈশ্বরপ্রেম তাঁহাতে দেখিতে পাইয়াছি। তবে কেন তিনি বলেন তিনি প্রেমহীন, প্রীতির দৃশ্য তাঁহার বক্ষে প্রেম সঞ্চার করিতে পারিত না? আবার বলিতেছেন, তিনি নিরাশাকে সঙ্গী করিয়া পথ চলিতে যে কষ্টবোধ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝাইবার নহে। আমরা জানি, তাঁহার গ্রন্থের সূচনায় যাহা দেখিতে পাই, তাহা হইতে আমাদের এই উপলব্ধি, তিনি শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তির অন্বেষণে দেশভ্রমণে বহির্গত হন, প্রকৃতির মাধুরীময় মূরতি তাঁহার সন্তাপ অনেক পরিমাণে প্রশমিতও করে। তবে “নিরাশা” কিসের? নিরাশা বলিলেই ত অতৃপ্তির কথা আসে। বিয়োগকাতরতা যাঁহাকে সকল সংসার-সুখের আশায় জলাঞ্জলি দেওয়াইয়া গৃহের বাহির করিল, তাঁহার আবার আশা নিরাশার কথা কেন? আর এক স্থলেও কতকটা ঐরূপ সুরের, আমাদের নিকট কতকটা দুর্ব্বোধ্য রকমের কথা দেখিলাম। গ্রন্থকার তাঁহার ভ্রমণের ইতিহাস বলিতেছেন:—এখনও দুই একজন হতভাগ্য লোকের অভাব নাই, যাহারা শ্মশানক্ষেত্রে জীবনের যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জন দিয়া, উদাস হৃদয়ে, ব্যাকুল অন্তরে, লক্ষ্যহারা ধূমকেতুর ন্যায়, এক অনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইয়াছে। সেই ধরণীর নেপথ্য উজ্জ্বলজ্যোৎস্নাসমাচ্ছন্ন, কুসুম-সুরভি-পরিব্যাপ্ত, সুমধুর সমীরণহিল্লোলিত এবং বিহগ-কল-কাকলী-মুখরিত বাহ্যপ্রকৃতির দিব্য সৌন্দর্য্যে সজ্জিত থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার হৃদয় সে সৌন্দর্য্য-গ্রহণের অধিকারী নহে, সমগ্র পৃথিবীর

বিচিত্র শোভা সন্দর্শন করিয়া আসিলেও তাহার মুখ হইতে তৎসম্বন্ধে কোনও বিশেষ কথা বাহির হইবার সম্ভাবনা নাই। উত্তর-ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া যাহা দেখিয়াছি, অনেকেই তাহা দেখিবার সুযোগ পান নাই, কিন্তু সেই সমস্ত মহান্ সুন্দর দৃশ্য, প্রকৃতির সেই বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যক্ত সৌন্দর্য্য প্রাণ দিয়া উপভোগ করিতে পাই নাই; কিন্তু তথাপি দেশে দেশে ঘুরিয়াছি। জীবনে কখনও কবিতার সেবা করি নাই, প্রভাত-বায়ুর মৃদুমন্দ সঞ্চালন, প্রস্ফুটিত কুসুমের স্নিগ্ধ শোভা কখনও আমাকে ব্যাকুল করে নাই; বজ্র-কঠোর হৃদয় লইয়া সংসারের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে জীবনপথে অগ্রসর হইতেছিলাম, হঠাৎ একদিন কেন্দ্রভ্রষ্ট হইয়া পড়ায় যেদিকে দুই চক্ষু গেল, সেই দিকে চলিলাম। ইহাই আমার ভ্রমণের ইতিহাস।" অতি সুন্দর ভাষা, কিন্তু বলিয়াছি, আমরা সর্ব্বত্র ভাবের সামঞ্জস্য করিতে সমর্থ হই নাই। জানি না জলধর বাবু তাঁহার কোন্ সময়ের মানসিক অবস্থা এইখানে বর্ণিত করিতেছেন। হয়ত, প্রথম শোকের পর তাঁহার মনের যেরূপ উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা হইয়াছিল, এ তাহারই চিত্র। যদি তাহাই হয়, তবে এ চিত্র গ্রন্থশেষে সন্নিবেশিত হইয়াছে কেন? হয়ত, বিভিন্ন সময়ে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি, গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার জন্য, একত্রীকরণ সময়ে, আশ্লেষণ শক্তির সম্যক ব্যবহার করা হয় নাই; গ্রন্থের ভবিষ্যৎ সংস্করণে এ দোষের নিরাকরণ হইতে পারিবে। তথাপি আমাদের সকল প্রশ্নের শেষ হয় নাই। গ্রন্থকার পূর্ব্বে অতৃপ্তির কথা বলিয়াছেন, এস্থলে সংসার সংগ্রামের কঠোরতার উল্লেখ করিতেছেন। ইহা পড়িয়া, তাঁহার পাঠকগণ মনে করিতে পারে, তাঁহার ভ্রমণের ইতিহাস বা মূল কারণ শোকজনিত ঔদাস্য নহে, সংসার সংগ্রামে জয়লাভে নিরাশা, জীবনে অপূর্ণ মনোরথই তাঁহার উদাসীনভাবে দেশ ভ্রমণের মূল। অথচ তিনি গ্রন্থসূচনায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা পড়িয়া বুঝিতে হয়—শোকসন্তপ্ত হইয়া তিনি শান্তির অন্বেষণে গৃহের বাহির হইয়াছিলেন। পৃথক আর এক স্থলে তিনি লিখিতেছেন, "সেই বাল্যকাল হইতে আমার মনে কিন্তু উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ভ্রমণের একটা দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছিল; আমার নবজাগরিত কল্পনায় দেখিতে পাইতাম, ধূসর পর্ব্বতশ্রেণী উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, কটিতটে মেখলার ন্যায় শ্যামল তরুরাজি ঊর্দ্ধে তুষার-

মণ্ডিত শুভ্র কিরীট, উপত্যকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর, এবং সেই সকল কুটীর-প্রান্তে ও বনান্তরালে দণ্ডায়মান পার্ব্বত্য অধিবাসিবৃন্দ।” ইহা হইতে তাঁহার ভ্রমণের অন্য কারণও অনুমিত হইতে পারিত, কিন্তু তিনি নিজেই আভাস দিয়াছেন, পরজীবনে কোন বিষাদময় ঘটনা তাঁহার এই দুর্দ্দমনীয় ভ্রমণাকাঙ্ক্ষা কার্য্যে পরিণত করিয়াছিল। সম্ভবতঃ এ ত্রিবিধ কারণের সমবায়েই তাঁহার ভ্রমণ-কার্য্য ঘটিয়াছিল; বাল্যে ভ্রমণের দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা, পরজীবনে সংসার-সংগ্রামে ক্লান্তি ও নিরাশা হইতে সে আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা বৃদ্ধি, তৎপর জীবনের সেই বিষাদময় ঘটনায় তাহার কার্য্যে পরিণতি। যাহা হউক, জলধর বাবুর ভ্রমণকাহিনীগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ায়, এখন এগুলি তাঁহার জীবনের একাংশের ধারাবাহিক বিবরণ বলিয়া পরিগণিত হইবে। যাহাতে সে ধারা-বাহিকতার, আদ্যন্তের সংলগ্নতার অভাব বোধ না হয়, বোধ হয়, তদুদ্দেশ্যে, স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন। গ্রন্থের অভ্যন্তর ভাগ পড়িয়া পাঠকের মনে হইতে পারে, জলধর বাবু বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে দেরাদুনে জীবনের কতকাংশ কাটাইয়াছিলেন, তৎকালে দেরাদুনের নিকটবর্ত্তী হিমালয়-দৃশ্যগুলি অবসর সময়ে পরিদর্শন করিয়া বাল্যের ভ্রমণপ্রবৃত্তির পরিতোষ করিতেন, সম্ভবতঃ শোকপীড়িত হৃদয়ে ভ্রমণে বহির্গত হইয়া তিনি দেরাদুনে গিয়া, তাহার প্রাকৃতিক শোভায় মোহিত হইয়া, সেইখানে অবস্থান করেন এবং অনেক সময় আলস্যে কাটাইতে কষ্ট হইবে ভাবিয়া, উপস্থিতমত কার্য্য স্বীকার করেন। কিন্তু লিখার কোন কোন অংশ কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন না করিলে পাঠকের সহসা এইরূপ ধারণা হওয়া কঠিন। বিশেষতঃ গ্রন্থসূচনায় তিনি তাঁহার যে ঔদাসীন্য তাঁহার দেশভ্রমণের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, গ্রন্থপাঠে অগ্রসর হইয়া, গ্রন্থের শেষভাগে উপনীত হইবার পূর্ব্বে, আমরা সে উদাসীনতার কারণের আর বিন্দুমাত্রও উল্লেখ দেখিতে পাই নাই। শোক-পীড়িত হৃদয়ে দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়া, প্রথমে যে সকল দৃশ্য দেখিবেন, তন্মধ্যে যাহা কিছুর চিন্তা তাঁহার হৃদয়ের বিষণ্ণতার সহিত মিশ খাইবে, তাহারই দিকে তাঁহার মন অধিকতর আকৃষ্ট হইবে এবং তাঁহার বিষাদের কারণ পুনঃপুনঃ স্মৃতিপথে উদিত হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু গ্রন্থের প্রায় তিন চতুর্থাংশের মধ্যে আমরা সেরূপ কিছু অনুস্মৃতি দেখিতে পাই

নাই। এমন কি, দেরাছুনের শ্মশান-ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া, তাহার ভস্মরাশির মধ্যে তিনি তাঁহার দেরাছুনস্থ বন্ধুবান্ধবের স্নেহসামগ্রীর অবসান চিন্তা করিয়া বিষাদে মগ্ন হইয়াছেন, কিন্তু আপনার স্নেহসর্ব্বস্ব যে বঙ্গের শ্মশানভূমিতে ভস্মে লীন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, সে কথা তাঁহার স্মরণপথে একবারও উপস্থিত হয় নাই। আরও একটী জিজ্ঞাস্য। জলধর বাবু বলিয়াছেন, তিনি জীবনে কখনও কবিতার সেবা করেন নাই, প্রভাত বায়ুর মৃদুমন্দ সঞ্চালন, প্রস্ফুটিত কুসুমের স্নিগ্ধ শোভা কখনও তাঁহাকে ব্যাকুল করে নাই, তিনি বজ্রকঠিন হৃদয় লইয়া সংসারের সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন। আমরা কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ পড়িয়া তাঁহাকে যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে তাঁহার হৃদয় কবিত্ব-বিহীন মনে করি নাই। তাঁহার শোকের অবস্থাও কবিত্বের অনুপযোগী বলিয়া স্বীকার করি না। প্রভাত বায়ুর মৃদুমন্দ সঞ্চালন, প্রস্ফুটিত কুসুমের স্নিগ্ধ শোভা বা ইত্যাকার অন্য কোন প্রফুল্লতার দৃশ্য তাঁহার শোক-গম্ভীর হৃদয়ে স্থানাধিকার করিয়া থাকিতে না পারে, কিন্তু গাম্ভীর্য্যে কি কবিত্ব নাই? কবিত্ব কি বিষাদজড়িত হয় না? জানি না, গ্রন্থকার তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে প্রকৃতির মাধুর্য্যের প্রতি তাচ্ছীল্যকে বা কবিত্ব-বিলোপী তাঁহার সাংসারিক জীবনের কঠোরতাকে তিরস্কার করিতেছেন কি না। এ সকল কথার আলোচনা করিয়া হয়ত আমরা জলধর বাবুর শোকস্মৃতি পুনরুদ্দীপিত করিতেছি, আমাদের বিশেষ অপরাধের কার্য্যই হইতেছে; তবে আমরা জলধর বাবুর অপরিচিত হইলেও তাঁহার বন্ধু, তাঁহার সহিত সমবেদনায় আমাদের হৃদয় পীড়িত হইতেছে। গ্রন্থের উন্নতিকল্পে কোন কোন কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে স্মৃতিপীড়িত করিতে হইল, ইহাতে আমরা বিশেষ দুঃখ [illegible]রিতেছি।

[illegible]একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষের কথা। টপকেশ্বরের গাম্ভীর্য্যের মধ্যে গ্রন্থকার একটী নির্ঝরিণীর বর্ণনা করিতেছেন, বলিতেছেন, "একটী ক্ষুদ্রকায়া নির্ঝরিণী অবিরাম কুল কুল শব্দে নাচিয়া নাচিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া দ্রুতগতিতে নিম্নদিকে চলিয়া যাইতেছে; সে যেন একটী দ্রবস্ফটিকের প্রবাহ।" "নাচিয়া নাচিয়া আঁকিয়া — কয়েকটী শব্দ বাদ দিলে, বর্ণনার মাধুর্য্যের কোন হানি হইত, আমরা এরূপ মনে করি না। বরং এ শব্দ কয়টী বাদ দিলেই

সে গাম্ভীর্য্যের দৃশ্যের সহিত সঙ্গতি রক্ষা হইত। তবে এস্থলে প্রকৃতির অবিকল ছবি ভাষায় অঙ্কিত হইয়া থাকিলে, অবশ্য মনে করিতে হইবে, প্রকৃতিই তাঁহার স্বভাব-বৈচিত্র্য-সংস্থাপন জন্য তাঁহার স্থিরগম্ভীর প্রতিমূর্ত্তির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া এইরূপ চাঞ্চল্য বিকাশ করিয়াছেন। একস্থলে একটী পার্ব্বত্যপথের বর্ণনা করিতে গিয়া লেখক বলিতেছেন, "লোক যাতায়াতের অল্পতা হেতু অনেক অনিমন্ত্রিত কণ্টকলতা রাস্তায় অনধিকার প্রবেশ করিয়া স্থানে স্থানে পুঞ্জীভূতভাবে অবস্থান করিতেছে, এবং পরিব্রাজকবর্গের কঠিন পাদচর্ম্মের সহিত কোমল সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য উদ্‌গ্রীব রহিয়াছে।" সুন্দর ব্যঙ্গের ভাষা, কিন্তু শোকভার হৃদয়ে বহন করিয়া, সন্ন্যাসীর বেশে, যিনি দেশে দেশে ফিরিতেছেন, তাঁহার পক্ষে এরূপ ভাষা উপযোগী কি না বলিতে পারি না, পরিহাসে প্রবৃত্তি চরিত্র-গাম্ভীর্য্যের হানিকর বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ইহাপেক্ষাও লঘুতর ভাষা আমরা স্থানে স্থানে দেখিতে পাইয়াছি, সেই সকল স্থান আমাদের নিকট ভাল বোধ হয় নাই। জলধর বাবুর আর একটী বন্ধুর লেখা বর্ত্তমান সমালোচককে এক সময়ে দেখিতে হইয়াছিল, তাহাতেও ঐরূপ দোষ লক্ষিত হইয়াছিল। জানি না, বার্দ্ধক্যের সময়ে উপনীত শোকদুঃখ-জর্জ্জরিত সমালোচকের সহিত নব্য লেখকদিগের এ সম্বন্ধে একমত হইবে কি না?

মুশৌরীর চিত্রে, একস্থলে লেখক বলিতেছেন, "কোন নির্জ্জন নিকুঞ্জে প্রেমিকযুগল কাষ্ঠাসনে বসিয়া আপনাদের হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন।" অবশ্য এ ইংরেজ যুবক-যুবতীর চিত্র, কিন্তু নির্জ্জন নিকুঞ্জে গুপ্তালাপন জন্য প্রেমিক যুগলের এরূপভাবে মিলন, যখন হিন্দুর ব্যবহারানুমোদিত নহে, তখন ইংরেজ কবির লেখা পড়িয়া ভিন্ন এরূপ ভাবের উপলব্ধি করিতে আমরা সমর্থ নহি। ইহা অনুকরণমাত্র, ব্যবহার-জ্ঞানজনিত হৃদয়ের স্বাভাবিক ভাব হইতে উৎপন্ন নহে।

চন্দ্রভাগা-তীরে গ্রন্থকার একদিন একজন বন্ধুসহ এক কৃষকের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। সরল সুন্দর কৃষক-পরিবারের চিত্রটী সুন্দর। কিন্তু কৃষকের জাতিবিচার না করিয়া, লেখক এবং তাঁহার বন্ধু যে কৃষক-পত্নীর রন্ধন করা জিনিস আহার করিয়াছিলেন, হিন্দুর দেশে, হিন্দুর সাহিত্যে, সে কথার উল্লেখে অন্যরূপ প্রশ্নের উদয় হইতে পারে। আমরা অবশ্য জাতি-

ভেদের পক্ষপাতী নহি, কিন্তু বলিয়াছি হিন্দুর দেশ এবং জলধর বাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হিন্দুর সাহিত্য, হিন্দুপাঠক কি এ প্রশ্ন করিবে না—জলধর বাবুর ধর্ম্ম কি? তিনি কি হিন্দু? না জাতিবিচার-বিবর্জ্জিত ব্রাহ্ম, না অন্যরূপ ধর্ম্মাবলম্বী? জলধর বাবুর গ্রন্থ পড়িয়া তিনি হিন্দু বলিয়াই ধারণা হয়; কারণ, তিনি "পূত নির্ঝরিণীসলিলে আজন্মসঞ্চিত পাপরাশি ধৌত" করিয়াছেন, এবং একদিন এক হিন্দু-সন্ন্যাসীর আশ্রমে মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গাহিয়াছিলেন,—

"কবে সমাধি হ'বে শ্যামাচরণে।"

হইতে পারে, জলধর বাবু হিন্দু হইয়াও উদারনীতি; হইতে পারে, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ব্যবহার এরূপ কার্য্যের বিরোধী নহে। অথবা উদারনীতি লেখক ইচ্ছা করেন, জাতিভেদ উঠিয়া যাউক, সর্ব্বত্র সমভাবে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনের এ প্রতিবন্ধকের নিরাকরণ হউক, যেরূপ ভাব তিনি সুন্দর বলিয়া মনে করেন, তাহা বর্ত্তমান না থাকিলেও, তিনি তাহারই চিত্র করিয়াছেন।

জলধর বাবুর গ্রন্থ পড়িয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। সমালোচনার শেষভাগে যে সকল দোষের আমরা উল্লেখ করিলাম, তাহা গ্রন্থের নিন্দা করিবার উদ্দেশ্যে নহে। সুন্দর জিনিস দেখিলে, সে সৌন্দর্য্যের পূর্ণতা দেখিবার ইচ্ছাও স্বাভাবিক হইয়া উঠে। আমাদের নিকট সে পূর্ণতার যাহা যাহা অভাব বোধ হইয়াছে, তাহাই প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

শ্রীলোকনাথ চক্রবর্ত্তী।

সমাজের ছবি।

(১)

ফাল্গুন মাসের দোল পূর্ণিমার দিন দুইটী বর্ষীয়সী রমণী গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেছিলেন; পথিমধ্যে তাঁহাদের কথোপকথনও চলিতেছিল, আমরা তাঁহাদের কথোপকথনের উপসংহার ভাগ পাঠকগণকে উপহার দিলাম।

প্রথমা। অত বড় মেয়ে আইবুড়ো রেখেছে কেমন করে? একটুকি লজ্জা ভয়ও নাই? হাঁ গা—সতের বছরের মেয়ে?—

দ্বিতীয়া। সাধ ক'রে কি রেখেছে, কুলীনের ঘরে ঐত বিপদ। জাত ঘূচায়ে যাকে তাকে দিতে পারুছে কৈ।

প্রথমা। মরুক্ তোমার জাত, একটা সোমত্ত মেয়েকে তুষের আগুণে পুড়িয়ে পুড়িয়ে মেরে জাত রক্ষে? এতদিন যে পাঁচটা ছেলে হ'ত।

দ্বিতীয়া। তা হ'ত বৈকি, জ্ঞানদাও আমার গরবিণীরই বয়সী, সেও এই ষেটের সতের বছরে প'ড়েছে। যাই হ'ক জ্ঞানদা বড় গুণের মেয়ে, যেমন দেখ্‌তে শুন্‌তে, কথাবার্ত্তাগুলিও তেমনি মিষ্টি।

প্রথমা। তাতেই তো আরও দুঃখ হয়; কুলরক্ষা কর্‌তে গিয়ে অমন সোণার ডালি মেয়ের চ'খের জল পানে চেয়ে দেখ্‌ছনা, ধন্যি মা বাপ্!

দ্বিতীয়া। মা বাপের দোষ নাই। তারা খুঁজতে আর বাকী রাখে নাই, কোনখানেই আর ওদের মেলের বর পাচ্ছেনা।

প্রথমা। মেলের বর যদি আর দশ বছর না পায়, তখন যে মেয়ে বুড়িয়ে যাবে।

দ্বিতীয়া। আমাদের কুলীনের ঘরে জাত যায় দিদি; আমার ননদের যে একুশ বছরে বিয়ে হ'য়েছিল। জাত চাইতে ত আর কিছু বড় নয়।

প্রথমা। ঐ কথাতেই তো আমার সঙ্গে কারও বনে না, কুলীন কি আবার একটা জাত? পুলিন মুখুজ্যে যে কুলভঙ্গ ক'রে বংশজের ঘরে ভাল পাত্র দেখে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, তাতে কি জাত গিয়েছে—না বামুণ থেকে খারিজ হ'য়েছে?

দ্বিতীয়া। তা না হ'ক, আর সে মানটী ত নাই, এখন যদি একটা বেটা থাক্‌তো তাহ'লে তার বিয়ে দিতে একটী কাণাকড়িও পেতেন না।

প্রথমা। তাই বল জাতটাত মিছে, কেবল টাকার লোভে কুলীনগিরি। এমন টাকার কপালেও ছাই, কুলীনের কপালেও ছাই। আহা! সেই যতীনের সঙ্গে যদি জ্ঞানদার বিয়ে দিত, তাহ'লে রাজযোটক হ'ত। মা বাপের আদরের ছেলে, তিনটে পাশ করা, ঘরে টাকাই বা কত?

দ্বিতীয়া। সত্যি দিদি, যতীনের সঙ্গে জ্ঞানদার বিয়ে হ'লনা কেন? যতীনরাও ত ঘরে কম নয়; শুন্‌তে পাই ছোট বেলা হ'তে জ্ঞানদা আর যতীনে বড় ভাব! এ সম্বন্ধ ভাঙ্গলে কেন?

প্রথমা। জানিনে, পোড়ামুখো বাপ মিন্সের আক্কেল, সব ঠিক্‌ঠাক্ ক'রে, শেষে ব'ল্লে কিনা ওরা পাল্‌টা ঘর নয়। আহা! সেই বিয়ে যদি হ'ত, তাহ'লে যতীনও নিরুদ্দেশ হ'তনা, জ্ঞানদাও অমন ক'রে কেঁদে কেঁদে ম'র্‌ত না।

একটী পথ দুইটী পথে বিভক্ত হইয়াছে, দুইপথে দুইজন রমণী গমন করিলেন, তাঁহাদের কথাবার্ত্তাও বন্ধ হইল।

(২)

"এই নিভৃত নিকুঞ্জ নিকেতনে এই চম্পক তরুতলে আসিয়া দাঁড়াইতাম। এমনি মন্থর মলয়হিল্লোলে শ্লথ-বৃন্ত চম্পকদাম বৃন্তচ্যুত হইয়া খসিয়া খসিয়া পড়িত। আমরা দুইজনে কুড়াইয়া কুড়াইয়া লইতাম। পৃথিবীর আর কেহ জানিত না, কিন্তু আমি জানিতাম, তিনি আমাকে ভাল বাসিতেন। আমি যে ভাল বাসিতাম———হতভাগিনী আমি নারীজন্ম লইয়া জন্মিয়াছি—সেকথা কেমন করিয়া বলিব? ভালবাসাও কি পাপ? রমণীজন্মে এ অভিশাপ কে দিল? এ রমণীজীবন কি কেবল আত্মগোপন করিবার জন্য? যাহাকে দেখিলে হৃদয় গলিয়া যায়, নয়ন মুগ্ধ হয়, মনোবৃত্তি বিবশা হয়, তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিব কেমন করিয়া? ভাল বাসিব, কাছে থাকিব, নয়নে দেখিব, ইহাতেই যা পরিতৃপ্তি; আর তো কিছু চাহিনা? তাহাতেই কি কুলমান ভাসিয়া যায়? অবিশ্বাসিনীতো হই নাই, শুনিতে পাই নারীধর্ম্ম চরণে দলিত করা মহাপাপ, তাহাও তো করি নাই? প্রথম—শৈশবের সাথী ছিলাম—ধিক্ আমি, আমার মরণ হয়না কেন—আমি তখন হইতে ভাল বাসি, কৈ সে ভাল বাসায় তো পাপের ছায়া, কলঙ্কের রেখা ছিল না; এখনও তো তেমনি ভালবাসি। কাছে রাখিতে চাই, তেমনি করিয়া অঞ্চলের বাতাস দিতে ইচ্ছা হয়, তেমনি করিয়া এই চম্পকতরুতলে দাঁড়াইয়া বলিতে চাই, "——! তুমি আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব, দেবতা! তুমি ঐ উঁচু ডালের ফুলটী পাড়িয়া দাও, ঐ খঞ্জন পাখীটী ধরিয়া দাও, আর ঐ ধূলার উপর তেমনি করিয়া একসঙ্গে লিখ তোমার আর আমার নাম!" বয়স বাড়িলে কি এসব বলিতে নাই? একজন ভিন্ন আর কাহাকেও শুধু ভাল বাসিলেই কি সতীধর্ম্ম নষ্ট হয়? তাহা হয় হউক—একজন ভিন্ন যখন আর কাহাকে ভাল বাসিতে

ইচ্ছা হইবে, তখনই আত্মহত্যা করিব। ছি ছি নারীজন্ম রাখিয়া কি সুখ? যদি কুলীনের ঘরে না জন্মাইতাম, তাহা হইলে আমার ভাগ্যে কি হইত? এতদিন হয়ত আর একজনের সঙ্গে বিবাহ হইত। তখন আমার নারীধর্ম্ম কোথায় থাকিত? আমার মত অবস্থা হয়ত আরও কতজনের হইয়াছে—তাহাদের কি নারীধর্ম্ম রক্ষা হইতেছে? অকূলের কাণ্ডারী হরি আছেন—তিনি আমার পাত্র জুটাইবেন না। আমার এই কুমারীব্রতই থাকুক, কিন্তু তিনি কেন দেশত্যাগী হইলেন? সেই শেষ বিদায়ের দিন যখন অশ্রুপূর্ণ নয়নে আমার পানে শেষ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, তখন কেন তাঁহার মুখপানে চাহিতে পারিলাম না? মরিলেও তো আমার এ দুঃখ যাইবে না।"

কাম্যবনের গঙ্গাপুলিনস্থ আম্রকাননের মধ্যবর্ত্তী একটী চম্পকমূলে দাঁড়াইয়া কুমারী জ্ঞানদা এই সকল চিন্তা করিতেছিল। প্রণয়ের সাথী পক্ষী-গুলি কলরব করিতেছিল। তরুমূলে জ্ঞানদার প্রথম যৌবনের ললিত লাবণ্যোচ্ছ্বাস দেখিয়া চম্পক-পরাগ-দল পরিম্লান হইয়া তাহার পাদমূলে দুই একটী করিয়া খসিয়া খসিয়া পড়িতেছিল।

(৩)

হরিদ্বারের অনতিদূরে দূর্ব্বাদল-শ্যামল উপত্যকা ভূমিতে একটী সন্ন্যাসীর আশ্রমকুটীর! চারিদিকে পর্ব্বতমালা, চারি ধারে নির্ঝরের অশ্রান্ত কল কল নাদ! স্থানটী বড়ই মনোরম, গম্ভীর এবং শান্ত রসাস্পদ! আশ্রমবাসী সন্ন্যাসী অজিনাসনে উপবিষ্ট, সম্মুখে নিরাসনে আগন্তুক একটী তরুণবয়স্ক সন্ন্যাসী যুক্তকরে প্রবীণ সন্ন্যাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন "প্রভো! আমাকে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করুন।"

প্রবীণ সন্ন্যাসী ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিলেন "এখনও অনেক বিলম্ব আছে। তোমার আশা, আকাজ্ক্ষা, সুখাভিলাষ একটীও পরিতৃপ্ত হয় নাই; এখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তোমার কিছুই ফললাভ হইবে না, লাভের মধ্যে এই সন্ন্যাসাশ্রমের প্রতি লোকের ঘৃণা ও বিদ্বেষ বাড়াইবে।"

নবীন সন্ন্যাসী। কেন প্রভো! তরুণবয়সে কি সন্ন্যাসী হইতে নাই? চৈতন্য তো তরুণ বয়সেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

"চৈতন্যের সন্ন্যাসে আর তোমার সন্ন্যাসে অনেক প্রভেদ, তিনি ভগবৎপ্রেমে আত্মহারা হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তুমি হয়তো সংসারে কোন মনঃপীড়া পাইয়া সন্ন্যাসী হইতে ইচ্ছুক হইয়াছ।"

"প্রভো! এই যে দলে দলে সন্ন্যাসী দেখিতে পাই—ইহারা কি সকলেই প্রেমে আত্মহারা?"

"না—সেরূপ ব্যক্তি কচিৎ দুই একজন দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ সন্ন্যাসীই আশাভঙ্গ বিয়োগবিরহ, না হয় দারুণ দারিদ্র্য, কিম্বা রোগশোকের যন্ত্রণায় সন্ন্যাসী, কেহ বা নরহত্যা, দস্যুতা প্রভৃতি করিয়া আত্ম-গোপন জন্য সন্ন্যাসী।"

"উহাদিগের সন্ন্যাসাবলম্বন কি বিফল হইতেছে?"

"সকলেরই যে হইতেছে তা নয়; অভ্যাস, অনুষ্ঠান ও সংসর্গ দ্বারাও অনেকের চিত্তশুদ্ধি হইতেছে।"

"আমারও তাহাই হইবে, আমিও তাহাদিগের ন্যায় কর্ম্মযোগ অভ্যাস করিব।"

"সন্ন্যাসাশ্রম কর্ম্মযোগ অভ্যাসের স্থান নহে; ত্যাগী না হইলে সন্ন্যাসী হয় না। তুমি তোমার যে সমাজকে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছ, সেই সমাজই প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র। শাস্ত্রমতে গার্হস্থ্য ও বাণপ্রস্থ আশ্রমেই কর্ম্মযোগ অভ্যাস করিতে হয়; সে সব পারিবে না, সমাজরূপ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ কর, কর্ম্মানুষ্ঠান কর, চিত্তশুদ্ধি হইবে, ক্রমে ধর্ম্মে অনুরাগ হইবে; তখন আর দীক্ষিত হইতে হইবে কেন, সর্ব্ব কর্ম্মের ফলাশা ত্যাগ করিতে পারিলেই তুমি সমাজ মধ্যে থাকিয়াও সন্ন্যাসী!"

"মানবসমাজ বড়ই স্বার্থপর, সেখানে সুখের লেশমাত্র নাই।"

"নানাকারণে সাময়িক বৈরাগ্য জন্মিলে কি ব্যক্তিবিশেষের আচরণে হৃদয়ভগ্ন হইলে কিছু দিন সেইরূপ মনে হয়, কিন্তু সেটা তোমার ভ্রম! যদি সুখই না থাকিবে, তবে এখনও তুমি শতবার তোমার সাধের নন্দন পানে ফিরিয়া চাহিতেছ কেন? এখন তুমি ফিরিয়া যাও, কিছুদিন সমাজের হিত সাধন করিয়া অথবা ভিক্ষা মানাপমানে সমতাজ্ঞান, শীতোষ্ণ দ্বন্দসহিষ্ণুতা, সুখে দুঃখে সন্তোষ অভ্যাস করিয়া বিশুদ্ধ চিত্ত লইয়া ফিরিয়া আসিও, তখন দীক্ষিত হইবে।"

তরুণ সন্ন্যাসী আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া প্রবীণ সন্ন্যাসীর নিকট হইতে বিদায় হইলেন।

(৪)

চণ্ডীপুরের রামরত্ন গঙ্গোপাধ্যায় মহারথী কুলীন-স্বভাব। বিবাহ সাতাশটী, বয়স প্রায় ..., পঞ্চম শ্বশুরালয়ে অবস্থান, গৃহে ভাগ্যবতী গৃহিণী আর একটী বালবিধবা কন্যা বর্ত্তমান। কুলভঙ্গ ভয়ে অশীতিপর একটী বৃদ্ধের সহিত অষ্টমবর্ষীয়া কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন, সে আজ দুই বৎসরের কথা, আজ তিন মাস হইল, কন্যাটী বিধবা হইয়াছে।

চৈত্র মাসের শেষ, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণে পৃথিবী সন্তপ্তা। আজ একাদশী তিথি, গাঙ্গুলী মহাশয়ের দশমবর্ষীয়া কন্যার একাদশী ব্রত। মুহুর্মুহুঃ পিপাসা!! সমাজের শাসন—বালিকা সেই দারুণ তৃষ্ণায় জলবিন্দুমাত্র পাইবে না। অঙ্গনের মধ্যস্থ একটী পুষ্পবৃক্ষের ছায়ায় পড়িয়া বালিকা গড়াগড়ি দিতেছে। তাহার কণ্ঠ শুষ্ক, ওষ্ঠাধর শুষ্ক, নয়ন অশ্রুপূর্ণ। গাঙ্গুলী মহাশয় রন্ধনগৃহের বারান্দায় বসিয়া মধ্যাহ্ন আহার সমাপন করিতেছেন। এমন সময় বহির্দ্বারে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন "তৃষ্ণার্থ অতিথি, জল প্রার্থনা করি।"

গাঙ্গুলী মহাশয়ের সর্ব্বাঙ্গ যেন জ্বলিয়া উঠিল, বিরক্তির সহিত বলিলেন "যাও—যাও—ঠাকুর, দুপর বেলায় কে তোমার জল যুগিয়ে রেখেছে, (অনান্তিকে) যত সব হাঘরে!

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন "তথাস্তু, কিন্তু মহাশয়! এ বালিকাটী এ প্রকার ছট্‌ফট্ করিতেছে কেন? ইহার কি কোন গুরুতর পীড়া হইয়াছে?"

উত্তর দিবার জন্য গাঙ্গুলী মহাশয়ের অবশিষ্ট দন্তগুলি প্রায় বহির্গত হইয়াছিল, এমন সময় ব্রাহ্মণী বাহির হইয়া বলিলেন "না গো না, আজ একাদশী তাই—তৃষ্ণায় অমন করিতেছে।"

সন্ন্যাসী "নারায়ণ নারায়ণ" বলিয়া কর্ণে অঙ্গুলি দিলেন, বলিলেন— এ গৃহে জলগ্রহণ করিতে নাই।"

গাঙ্গুলী মহাশয়ের মুখকান্তি বীভৎস ভাব ধারণ করিল, সক্রোধে বলিলেন "বে'র বেটা ভণ্ড আমার বাড়ী হ'তে, রামরত্ন গাঙ্গুলীর বাড়ী

জলগ্রহণ করিতে নাই, একথা বলে, এমন বুকের পাটা কার? বিটলে সন্ন্যাসী লোকের জাত মারতে এসেছেন।"

সন্ন্যাসী বাটীর বাহিরে আসিয়া সম্মুখস্থ একটী বটবৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়াইলেন।

(৫)

গাঙ্গুলী মহাশয় আহার সমাপনান্তে তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে হুঁকা হস্তে বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন—বটবৃক্ষমূলে সেই সন্ন্যাসী! মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন "কি ঠাকুর! বয়স তো দেখ্‌ছি অল্প, এ ভণ্ডামি শিখেছ কতদিন?"

"অল্পদিন।"

"বেশ ক'রেছ, কিন্তু গৃহস্থ বাড়ীতে কেন? বনে যাও, ফল মূল খাও।"

"গৃহস্থ বাড়ী ত দেখিতেছি না, সকলই ত বন বলিয়া বোধ হইতেছে।"

"কেন—চখে কি কম দেখিতে পাও? বাঘ ভালুকও দেখিতেছ না কি?"

"শত শত, আপনাকেই তো একটী হিংস্র রাক্ষস বলিয়া বোধ হইতেছে।"

"ঠাকুর! মুখ সাম্‌লে কথা বল, জান আমি কে? রামরত্ন গঙ্গোপাধ্যায়—স্বভাব—মহা মহারথী কুলীন আমার দ্বারস্থ।"

"সকলেই সমান, আপনি রাক্ষস, তাঁহারা ব্যাঘ্র ভল্লুক!"

"কিসে রে বিট্‌লে বামুণ!"

"হিংস্র জীব অন্য জীবের শোণিত পান করে, মাংস ভক্ষণ করে, আর আপনাদের ন্যায় নররাক্ষস, আপন আপন সন্তান সন্ততির রক্ত মাংস ভোজন করেন।"

"যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা, বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করলি যে?"

"আপনাকে ভয় থাকিলে করিতাম না, রাগ করিবেন না, একটা কথা শুনুন, ঐ যে বালিকাটী বোধ হয় আপনার কন্যাই হইবে—একবিন্দু তৃষ্ণার জল অভাবে ছটফট্ করিতেছে, তাহা দেখিয়াও আপনি সম্মুখে বসিয়া গোগ্রাসে ভোজন করিতেছিলেন কেমন করিয়া?"

"কি করতে হবে, শুভগণ্ডা ক'রে কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেছে, একাদশী ত ওর সঙ্গের সাথী! তা ব'লে কি একাদশীর দিন জল দিতে হবে নাকি?"

"ক্ষতি কি? একাদশী তো স্ত্রী পুরুষ সকলেরই জন্ম। আপনি ত্রিসন্ধ্যা আহার করিবেন, তাহাতে ধর্ম্মনষ্ট হইবে না, আর বালিকাটী দারুণ তৃষ্ণায় একবিন্দু জলপান করিলেই তাহার ধর্ম্মনষ্ট হইবে?"

"ও ঠাকুর! বুঝেছি তুমি ব্রহ্মদৈত্যি! শাস্ত্র দেখগে তারপর এস।"

"শাস্ত্র কিছু কিছু দেখা আছে, বলপূর্ব্বক একজনকে একাদশী ব্রত করাইতে হইবে, ইহা শাস্ত্রের ব্যবস্থা নহে। ব্রহ্মচর্য্য কি অনিচ্ছায় হয়? এই সকল সমাজের ভণ্ডামি।"

"দূর, দূর, নরাধম! তুই শাস্ত্র মানিস্ না, নাস্তিক! তোর মুখাবলোকন করিতে নাই।"

এই বলিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দ্বাররুদ্ধ করিলেন, সন্ন্যাসী বটবৃক্ষমূলে আসন গাড়িলেন।

(৬)

এই ঘটনার তিন দিন পরে দুইজন আগন্তুক গাঙ্গুলী মহাশয়ের দ্বারদেশে দর্শন দিলেন। তাঁহাদের পদযুগল ধূলি ধূসরিত, চিত্ত উদ্বিগ্ন, যেন ভারি ব্যস্ত, যেন কোন বিপদসাগরে নিমজ্জিত! গাঙ্গুলী মহাশয় তাঁহাদের আগমন সংবাদ পাইয়া বাহিরে আসিলেন। এই আগন্তুকদ্বয়ের একজন আমাদের পরিচিতা জ্ঞানদার পিতা, অপরটী প্রজাপতির দূত—ঘটক!

গাঙ্গুলী মহাশয় বাহিরে আসিবামাত্র জ্ঞানদার পিতা নমস্কার করিয়া করযোড়ে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন।

ঘটক বলিলেন "গাঙ্গুলী মহাশয়! কুললক্ষ্মী আপনার গৃহে অচলা! অনেকেরই তো জাত রক্ষা ক'রেছেন, এইবার আমাদের এই মুখুয্যে মহাশয়কে উদ্ধার করতে হবে।"

গাঙ্গুলী। কে ইনি?

ঘটক। কাম্যবনের চণ্ডীদাস মুখুয্যে, মুলের মুকুট, বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান!

গাঙ্গুলী। ম'শায়, ম'শায়, নমস্কার, নমস্কার, কি জন্ত আগমন?

জ্ঞানদার পিতা। কন্যাদায়, সতের বৎসরের কন্যা যোগ্য বরের অভাবে এ পর্য্যন্ত অবিবাহিতা! ঘটক মহাশয়ের মুখে আপনার নাম শুনে শরণাপন্ন হ'লাম, উদ্ধার করুন।

গাঙ্গুলী। অবশ্য অবশ্য কর্ত্তব্য বটে, এ বিষয়ে আমার আপত্তি নাই, কেন না "রাজদ্বারে শ্মশানেচ যতিষ্ঠতি সবান্ধব।" তবে একটা কথা ম'শায় ও স্বভাব, পণগণের ব্যবস্থাটা কিরূপ হবে?

জ্ঞানদার পিতা। সে সব ত ঘটক মহাশয় অবগত আছেন।

গাঙ্গুলী। না ম'শায়, কথার ভাঙ্গচুর ভাল, এখন আর সেকাল নাই; ইংরেজের আমলে ক্রমে আমাদের ব্যবসায় মন্দা হ'য়ে আস্‌ছে, এখন আর সেকেলে পণগণে হবেনা।

জ্ঞানদার পিতা। আমি দরিদ্র! বিশেষ ম'শায় তো আর ভঙ্গ হচ্ছেন না।

গাঙ্গুলী। রাম! রাম! ও কথাটা আর উচ্চারণ কর্‌বেন না। তা না হই জাতি রক্ষা ত কর্‌ছি, এইরূপ জাতি রক্ষা ক'রে সাতাশটী হ'য়েছে, এইবার আটাশটী হবে।

ঘটক। সে সমস্ত আমার জানা আছে, মহাশয় ব্যক্তি, সাতাশটীর স্বামী—সাক্ষাৎ চন্দ্রদেব!!

গাঙ্গুলী মহাশয় হাস্য করিয়া বলিলেন, "সে নিজগুণে যাই বলুন, ইংরেজদের আমলে আর সব উঠে গেল—এখন আমরা দুই একজন যা আছি।"

জ্ঞানদার পিতা। তা নইলে আর আস্‌বো কেন? এক্ষণে যেরূপ অনুমতি হয়।

ঘটক। মুখুয্যে ম'শায়, গাঙ্গুলী মহাশয়ের সহিত ওরূপ সম্বোধন কর্‌বেন না, উনি হচ্ছেন জামাতা, ওঁতে লজ্জা বোধ কর্‌ছেন, আপনি জানেন না তো উনি কত বড় ব্যক্তি!

গাঙ্গুলী মহাশয় বড়ই প্রীত হইলেন, এবং শীঘ্রই বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া, হুঁকা কলিকা (সাগ্নিক) ও একখানি কম্বল লইয়া আসিলেন; পরিশ্রান্ত পথিকদ্বয় কম্বল পাতিয়া তাহাতে উপবেশন করিলেন। ঘটক মহাশয় সহাস্যে বলিলেন, "গাঙ্গুলী মহাশয়! মহৎ ব্যক্তি আপনি, এখন আসল কথাটা হ'ক!"

গাঙ্গুলী। আসল কথা আর কি? এক বেটা পোদ্দার আমার উপরে ডিক্রী জারী ক'রেছে, চারিদিনের মধ্যে আমাকে সেই টাকাটী দিতে হবে, যদি আপনারা তা দিতে স্বীকার হন, তাহলে আমি রাজী হ'তে পারি।

জ্ঞানদার পিতা। সে কত টাকা?

গাঙ্গুলী। অধিক নয়, খায় খরচা পঁচাশি টাকা।

জ্ঞানদার পিতা। যে আজ্ঞা, তাহাতেই আমি রাজী হ'লাম।

গাঙ্গুলী। টাকা দিচ্ছেন কবে?

জ্ঞানদার পিতা। বিবাহ রাত্রিতেই,—

গাঙ্গুলী। দিন স্থির ক'রেছেন কবে?

জ্ঞানদার পিতা। উপস্থিত চৈত্রমাস—এই মাসটার পরে যে দিন হয়।

গাঙ্গুলী। তা হ'বে না। আপনি বাটী যান, তৃতীয় দিনের মধ্যে বিবাহ দিন স্থির করুন, নতুবা আমাকে পাবেন না।

জ্ঞানদার পিতা ঘটকের মুখপানে চাহিলেন, ঘটক মহাশয় ইঙ্গিতে স্বীকার করিতে বলিলেন, মুখুয্যে মহাশয় অগত্যা স্বীকৃত হইলেন।

ঘটক বলিলেন, "তবে আপনি কল্যই বাটী রওনা হউন, যেতেও আপনার তিনদিন লাগ্‌বে, আমি থাক্‌লাম, কাল সন্ধ্যার পর একখানা গো গাড়ী ক'রে গাঙ্গুলী মহাশয়কে নিয়ে রওনা হব। আজ হচ্ছে সোমবার, বৃহস্পতিবারে লগ্নস্থির থাক্‌লো, সেদিনে যে কোন সময়েই হক, আমরা পঁহুছিবই পঁহুছিব।"

গাঙ্গুলী মহাশয়ের গালভরা হাস্য, আর কোন আপত্তি নাই, সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল।

যখন এই সকল আলাপ হইতেছিল, তখন অদূরে সেই নবীন সন্ন্যাসীটী নিমীলিত নেত্রে তাঁহাদের এই আলাপ শুনিতেছিলেন, তাঁহার মুদ্রিত নয়নপ্রান্ত দিয়া অশ্রুবিন্দু ঝরিতেছিল।

(৭)

এতদিনের পর জ্ঞানদার বিবাহের ফুল ফুটিল। বহুকষ্টে যোগ্যবর জুটিয়াছে, চৈত্রমাসের শেষ, হিন্দুমতে বিবাহ নাই, কিন্তু কুলীনের ঘরে শাস্ত্র মানিতে গেলে কি চলে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলায় জ্ঞানদার পিতা গৃহে উপস্থিত হইয়া প্রচার করিলেন, "আজই বিবাহ, ঘটক পাত্র লইয়া আসিতেছে।"

জ্ঞানদার গায়ে হলুদের ধুম পড়িয়া গেল, প্রতিবেশিনীরা হুলুধ্বনি দিতে লাগিলেন। জ্ঞানদা বড় লজ্জাশীলা—সে মুখখানি নামাইয়া হলুদ মাখিতে

বসিল। তাহার অন্তরের ভিতর হইতে একটী অব্যক্ত ধ্বনি উত্থিত হইতে-ছিল, যিনি সর্ব্বান্তর্য্যামী—তিনি তাহা শুনিতে পাইতেছিলেন।

রাত্রি প্রহরেকের সময় ঘটক সঙ্গে গাঙ্গুলী মহাশয় বরবেশে দেখা দিলেন—আর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই সন্ন্যাসী! বর বরাসনে বসিলেন, ঘটক বিদায় ব্যবস্থা হেতু অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, এখনও হিন্দুসমাজে সন্ন্যাসীর সম্মান আছে, তিনিও আদৃত হইয়া একখানি ধুনির কাষ্ঠ প্রাপ্ত হইলেন।

হঠাৎ এই বিবাহ ব্যাপার উপস্থিত; জ্ঞানদা মনে মনে যে পথ খুঁজিয়া রাখিয়াছিল, সে পথে যাইতে আর সময় পাইল না। পিঞ্জরের বিহগী যেমন পথ অন্বেষণ করে, জ্ঞানদাও তেমনি নানা পথ অনুসন্ধান করিল, পাইল না। তাহার নয়নকজ্জল অতি সংগোপনে অশ্রু-নিষেকে ধৌত হইতে লাগিল।

বিবাহ-লগ্নের কিছু পূর্ব্বে পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "পাত্র-কন্যা আশীর্ব্বাদের একটা ব্যবস্থা আছে, হইলে ভাল হয়।" সকলেই সায় দিলেন, পাত্র আশীর্ব্বাদ হইয়া গেল। পাত্রী আশীর্ব্বাদের সময় উপস্থিত, ধানদূর্ব্বা দিয়া সকলেই আশীর্ব্বাদ করিলেন; সন্ন্যাসীটী তখন ধুনি ছাড়িয়া এই আশীর্ব্বাদ ব্যাপার দেখিতে আসিয়াছিলেন; তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "সন্ন্যাসী ঠাকুর! আপনারা সাধু মহান্ত পাত্রীটীকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

কি জানি কেন সন্ন্যাসীর চরণযুগল তখন থর থর কাঁপিতেছে, তাঁহার নয়ন দিয়া যেন এক দিব্য জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। কম্পিতপদে জ্ঞানদার নিকট গিয়া ধান দূর্ব্বা তুলিয়া লইলেন, ভগ্নস্বরে ডাকিলেন "জ্ঞানদা!"

সকলেই যেন চমকিত! জ্ঞানদা যেন কোন অপরিচিত প্রিয়-কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল, বিস্ফারিত নেত্রে সন্ন্যাসীর মুখপানে চাহিল, দেখিল যেন জ্যোতিষ্মান্ দেবমূর্ত্তি!

সন্ন্যাসী বলিলেন "জ্ঞানদা! এই শেষ আশীর্ব্বাদ, শেষ সম্ভাষণ, এতদিনে শেষ বিদায়!!"

জ্ঞানদার সুখের শৈশবস্বপ্ন মনে পড়িয়াছে; দৃষ্টি স্থির, শরীর অবশ, হৃদয় জলন্ত অগ্নিশিখাময়; ক্ষুদ্র অবলার প্রাণ আর কত সহিবে বল, সে সহিতে পারিল না,—মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল।

তখন চারিধারে 'ধর্ ধর্, মার্ মার্' একটা শব্দ উত্থিত হইল, কেহ জ্ঞানদার শুশ্রূষা করিতে লাগিল, সন্ন্যাসী তখন অদৃশ্য, কেহই আর তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

বহু চেষ্টা হইল, কিন্তু জ্ঞানদার সে মূর্চ্ছা আর ভঙ্গ হইল না। সে বিবাহ বাসরে হতভাগিনী কুলীনকুমারী সুখের স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল, তাহার অন্তিম শয্যা কুসুমাবৃত হইল।

পরদিন প্রাতঃকালে কাম্যবনের অনেক লোক দেখিতে পাইল, গ্রামের পূর্ব্বদিকস্থ বৃহৎ দীর্ঘিকার শৈবাল রাশির মধ্যে জটাজূটধারী একটী সন্ন্যাসীর মৃতদেহ ভাসিতেছে। গ্রামের লোকে কাণাকাণি করিতে লাগিল। 'আহা! হতভাগা যতীন্ এতদিন পর্য্যন্ত জ্ঞানদাকে ভুলিতে পারে নাই।'

গাঙ্গুলী মহাশয় শিশুপাল সাজিয়া গৃহে ফিরিলেন, আসিয়া শুনিলেন, দ্বাদশীর দিন রাত্রিতে অভাগিনী ইহসংসার হইতে বিদায় হইয়াছে

হায়! সমাজের কঠোর অত্যাচারে গৃহে এই পৈশাচিক অভিনয় হইতেছে, তাহা কি কেহ দেখিতেছে? বাল্যপ্রেম! তুমি কত কুসুম-কোমল হৃদয় মথিত করিয়া কত হলাহল উদগীরণ করিতেছ, তাহা কে বলিতে পারে!

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অর্জ্জুনোর্ব্বশী।

চিত্রসেন-মুখে শুনি' আপনার বাঞ্ছিত বারতা,
মদভরে তরঙ্গিয়া সুকুমার ক্ষীণ তনুলতা
প্রসাধনে রত, স্বর্গে, স্বর্গপুরে অতুল্যা রূপসী।
ঝলকিত পুলকিত পূর্ণিমার পরিপূর্ণ শশী
অলক্ষ্যে করিতেছিল বক্ষমাঝে কটাক্ষ ক্ষেপণ,
অসম্বৃতা, উর্ব্বশী যখন!

মাণিক্য কিঙ্কিণী রঙ্গে কটিতট নিল আলিঙ্গিয়া;
মুক্তিকার কণ্ঠমালা স্তনমূলে পড়িল মূর্চ্ছিয়া।
আবৃত অম্বরপথে একাকিনী পার্থের সদনে
উন্মত্তা উর্ব্বশী চলে অভিসারে, আকুল গমনে।
ফুলশরে বিমোহিল আচম্বিতে ত্রিলোক অজ্ঞাতে
সেইদিন পূর্ণিমার রাতে।

সভয়ে বিস্ময়ে দ্বারী দ্বার ছাড়ি' গেল দূরে সরি'
পার্থের শয়নকক্ষে উতরিল সুন্দরী অপ্সরী;
সৌরভে মোদিল কক্ষ, উজলিল লাবণ্যকিরণে!
শিঞ্জিনী-শিঞ্জিত রবে জাগি' তন্দ্র, বিমুগ্ধ নয়নে,
মুহূর্ত্তে হেরিলা, যেন মায়াদ্বীপ স্বপন-আগারে,
পরিচিতা মোহিনী বামারে।

সম্ভ্রমে উঠিলা যবে নমিবারে রাতুল চরণে,
সরমে শিহরি' ধনি নিবারিল খলিত বচনে;—
"প্রণম্য নহি গো আমি; যার ভয়ে তৃষিত ভুবন,
যার ভয়ে সুরাসুর বিবাদিল মূঢ়ের মতন,
সে সুধার যমজা যে, সেই আমি; হের, ধনঞ্জয়,
আসিয়াছি সঁপিতে হৃদয়!"

স্তম্ভিত বিস্মিত, সৌম্য দাঁড়াইলা নত করি' শির,
স্নিগ্ধকণ্ঠে আরম্ভিলা সসঙ্কোচে ব্রহ্মচারী বীর,—
"সুরপুরে স্বর্গসুখে বঞ্চি দিন, দেখিছ সতত;
কিন্তু নাহি জান, দেবি, কি আমার জীবনের ব্রত;
প্রসন্ন প্রশান্তমনে আশিষিয়া যাও নিজ ধাম,—
পূর্ণ যেন হয় মনস্কাম!"

কহিল উর্ব্বশী হাসি'—"দেবপুরে হে মুগ্ধ অতিথি,
দেবেন্দ্র প্রেরিলা মোরে তুষিবারে তোমা যথারীতি।
দেবাদেশ পাল, প্রিয়; এই স্বর্গ ভোগের আধার;
জেনো মনে, সুখ-পক্ষী ধরা নাহি দেয় বারবার;
তুষিতে ফিরাও যদি, একদিন এ বিশ্ব-সংসারে
কেঁদে কেঁদে খুঁজিবে তাহারে।"

ঈষৎ রোষাগ্নিরেখা চমকিল নরেন্দ্র-লোচনে;
দেবাদেশ!—শত ধিক্!—উত্তরিলা পরুষবচনে,—
"মোরা দীন মর্ত্ত্যবাসী, নাহি জানি স্বর্গের আচার;
হে অপ্সরা, ফিরে লও তোমাদের অতিথি-সৎকার;
বলিও মহেন্দ্রে তুমি, এই ভিক্ষা মাগি তাঁর পায়—
স্বর্গ হ'তে লইব বিদায়।"

দলিতা ফণিনী যথা দংশি' অরি লুকায় বিবরে,
গর্ব্বিতা উর্ব্বশী শূন্যে মিলাইল সন্তপ্ত অন্তরে;
ধ্বনিতে লাগিল কক্ষে নিদারুণ প্রেম-অভিশাপ।
হ'ল শেষে দৈববাণী,—"হে অর্জ্জুন, ত্যজ মনস্তাপ;
অভিশাপ বরস্বরূপে দেখা দিবে দ্বিগুণ প্রভায়,
মহাকার্য্যে হইবে সহায়!"

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

আমার কাপুরুষতার ফল।

(বিলাতী গল্প।)

"সম্পাদক মহাশয়, নমস্কার; আজ আমার জন্য কাজ আছে কি?"

আমি "সাপ্তাহিক সংবাদ" নামক পত্রে প্রাপ্ত পুস্তকের সমালোচনা করিয়া থাকি। সমস্ত দিন কোন কাজ ছিল না—কেবল আকাশপানে চাহিয়া সময়যাপন বড় কষ্টকর বলিয়া বোধ হইতেছিল, সেইজন্য সম্পাদকের গৃহে গমন করিয়া, কাজ আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিলাম।

সুখের বিষয়, সমালোচনার্থ একখানি পুস্তক ছিল। সম্পাদক মহাশয় তাহা আমায় দিলেন ও হাসিয়া বলিলেন, "এ পুস্তকে লেখকের নাম নাই—কিন্তু আমি তোমায় বলিয়া দিতেছি, এখানি একজন নবীন লেখিকার লেখনীপ্রসূত; যত শীঘ্র পার, সমালোচনা পাঠাইয়া দিও।"

অন্যান্য দু-চার কথার পর, আমি গৃহে ফিরিলাম। পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। সে দিন কি রকম কিছুই ভাল লাগিতেছিল না—আমার আক্রোশ লেখিকার উপর পড়িল। এরূপ তীব্র সমালোচনা পূর্ব্বে কখন লিখি নাই।

সমালোচনা শেষ হইল, একবার পড়িলাম, আপনি হাসিলাম। এক-বার মনে হইল, এত নির্দ্দয় হইব না—শেষে কি জানি কি মনে করিয়া, তাহাই পাঠাইয়া দিলাম।

* * * * *

এক সপ্তাহ অতীত হইয়াছে—আহারান্তে দেখিলাম, সুন্দর চাঁদিনী রজনী—ধূমময় লণ্ডন নগরীতে এরূপ রজনী অতি বিরল; সাধ হইল, লিলির বাড়ী গল্প করিতে যাই।

লিলি রবিনসন আমার ভাবী পত্নী—তিনমাস পরে আমাদের বিবাহ হইবে। এখন আমরা Engaged.

পথে যাইতে যাইতে লিলির সহিত কিরূপে আমার প্রথম আলাপ হইয়াছিল, তাহা ভাবিতেছিলাম। মনে পড়িল, এক বৎসর পূর্ব্বে এই রকম চাঁদিনী রজনীতে অস্তেন্দ নগরীর সমুদ্র-সৈকতে বেড়াইতেছিলাম। লিলি তাহার ভগিনীসহ উপকূলে বসিয়াছিল, চন্দ্রকিরণে তাহাকে দেবীর মত দেখাইতে-ছিল। তাহাদের দেখিয়া, আমিও অদূরে সমুদ্রহিল্লোল দেখিতেছি ভাণ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা যখন গাত্রোত্থান করিল, লিলির রুমাল সেইখানে পড়িয়া রহিল—সে তাহা দেখিতে পায় নাই। আমি সুযোগ বুঝিয়া তাহা তুলিয়া লইয়া, তাহাদের পশ্চাদ্গমন করিয়াছিলাম। "আপনি রুমাল ফেলিয়া যাইতেছেন" বলিয়া তাহার রুমাল ফিরাইয়া দিয়া-ছিলাম। লিলির সেই হাসিমাখা ধন্যবাদ মনে করিলে এখনও কত আনন্দ হয়!

তারপর মনে পড়িল, পরদিন "Kursal"এ তাহাদের সহিত আবার সাক্ষাৎ হয়; আমি টুপি তুলিলাম, তাহারা আমায় চিনিতে পারিয়াছে দেখিয়া আমার কত আনন্দ হইল। তারপর কত কথা হইল, থিয়েটার, দেশভ্রমণ প্রভৃতি কত কি যে বিষয় লইয়া অনর্গল কথা কহিতে লাগিলাম! শেষে আমরা Roulette জুয়াখেলা দেখিতে গেলাম, তাহাদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য আমি সেই প্রথম জুয়াখেলায় যোগ দিলাম, বিস্তর হারিলাম; কিন্তু তাহাতে আমার আনন্দই হইল, কারণ তার জন্য লিলি কত সহানুভূতি দেখাইল।

সেই অবধি প্রত্যহই আমাদের সাক্ষাৎ হইত। শুনিলাম, তাহাদের বাটী আমার বাটীর নিকটে; সুতরাং, লণ্ডনে ফিরিয়া আমাদের আলাপ

ঘনীভূত হইল। কতদিন আমরা বাইসিকেল চড়িয়া একত্রে বেড়াইতে গিয়াছি, সেই সব মনে পড়িতে লাগিল।

শেষে আমাদের বন্ধুত্ব প্রেমে পরিণত হইল। একদিন Kew Gardensএ বেড়াইতে গিয়া লিলির কাছে আমার হৃদয় ব্যক্ত করিলাম। লিলি আমার স্ত্রী হইতে স্বীকৃত জানিয়া আমার কত আনন্দ হইল।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে লিলির বাড়ী পঁহুছিলাম। গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র লিলি আমার কাছে আসিয়া বলিল, "জ্যাক্, তুমি "জিমিজেম্‌স্" নামে কোন লোককে চেন—আমার বড় সাধ, সেই নিষ্ঠুর লোকটাকে একবার দেখি, সে আমার সাধের আশালতা কঠিন চরণে দলিয়া ফেলিয়াছে।" লিলির হাতে "সাপ্তাহিক সংবাদ" পত্র।

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে, সাপ্তাহিক সংবাদে আমার সমালোচনায় নিজ নাম প্রকাশ করি না—"জিমিজেম্‌স্" নামে সমালোচনা লিখি।

প্রথমে লিলির কথা আমি বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু যখন কাগজখানি আমার হস্তে দিয়া লিলি বলিল, "দেখ, আমার পুস্তকের জিমিজেম্‌স্ কিরূপ নিষ্ঠুর সমালোচনা করিয়াছে", তখন আমার সমস্ত মনে হইল।

স্তম্ভিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার পুস্তক লিল্? তুমি পুস্তক লিখিয়াছ, কই, আমায় ত' বল নাই?" আমার তখন যে কি রকম মনে হইতেছিল, লিখিয়া প্রকাশ করা অসম্ভব।

লিলি বলিল, "না জ্যাক, তোমায় বলি নাই; মনে করিয়াছিলাম, সমালোচনা বাহির হইবার পর তোমায় দেখাইব, তোমায় আশ্চর্য্যান্বিত করিব, আমার প্রশংসা কাগজে দেখিয়া তোমার কত আহ্লাদ হইবে, কিন্তু জিমিজেম্‌স্ যে ঐরূপ অশনি সম্পাত করিবে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই।"

লিলির সে বিষাদমাখা মুখ দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হইল; একবার মনে করিলাম, সব কথা বলি, কিন্তু সাহস হইল না। ভাবিলাম, দুদিনেই লিলি সব ভুলিয়া যাইবে, আপাততঃ উহাকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা দেখি।

বলিলাম, "লিলি! এস, ভোদ্‌ভিল থিয়েটারে যাই, মিথ্যা মন খারাপ করিও না।"

লিলি আমার ভাবী পত্নী, সুতরাং আমার সহিত থিয়েটারে যাইতে কেহ আপত্তি করিল না।

*

ভেদ্‌ভিল্ থিয়েটারে "এক রাত্রির বহির্বাস" অভিনীত হইতেছিল। আমার বোধ হয়, পৃথিবীতে এমন গম্ভীর পুরুষ কেহ নাই, যিনি ইহা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন। আমি প্রথমবার যখন দেখি, তখন হাসিতে হাসিতে আমার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, অধিকাংশ দর্শকেরই আমার দশা।

যাহা হউক, লিলি প্রাণ খুলিয়া হাসিতেছে দেখিয়া, আমার আমোদ হইল, হাসির ধূমে লিলির চক্ষে জল আসিল, অতীত কথা বোধ হয় আর ব্যথা দেয় নাই।

অভিনয় শেষ হইলে, আমরা "কাফে রয়েলে" কিছু আহার করিবার মানসে গমন করিলাম। আহারান্তে বাহিরে আসিতেছি, এমন সময় দেখি, অদূরে আমার এক বন্ধু দাঁড়াইয়া। আমার মহা আতঙ্ক উপস্থিত হইল; কারণ, আমার এই বন্ধু কখন আমার নাম ধরিয়া ডাকেন না; আমার সমালোচনায় ব্যবহৃত জিমিজেম্‌স্ নামে ডাকেন।

একবার ক্ষণেকের তরে আশা হইয়াছিল, সে আমায় দেখিতে পাইবে না। কিন্তু সে আশা বৃথা হইল। সে "আরে জিমিজেম্‌স্ যে ?" বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া পশ্চাতে লিলিকে দেখিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। শুধু বলিল, "আমায় ক্ষমা কর, জানিতাম না, তোমার সহিত সাথী আছে।" কিন্তু তখন যা অনিষ্ট হইবার হইয়া গিয়াছে।

জিমিজেম্‌স্ নাম শুনিয়াই লিলি চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আর কেহ সেখানে ছিল না। লিলি একবার আমার বন্ধুর মুখপানে আর একবার আমার পানে চাহিল। আমি চক্ষু নত করিলাম। নিঃশব্দে বাহিরে আসিয়া দু'জনে গাড়ীতে উঠিলাম।

পথে কোন কথাই হইল না। আমার সাহস হইল না, লিলির বোধ হয় ইচ্ছা হইল না।

গাড়ী যখন লিলির বাড়ী পহঁছিল, লিলি আপনি নামিল, আমি অন্যমনস্ক ছিলাম, সাহায্য করিতে ভুলিয়া গেলাম। একবার আমার দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে লিলি বলিল :—

"মিষ্টার শ্রো, আজ এই আমাদের শেষ দেখা, কাল আপনার উপহারগুলি ফেরৎ পাইবেন। আমি কাপুরুষ মিথ্যাবাদীকে বিবাহ করিতে পারিব না।"

আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই লিলি অদৃশ্য হইল।

শ্রীমন্মথকৃষ্ণ দেব।

মোগল সাম্রাজ্যের রাজস্ব।*

যে মোগল সাম্রাজ্য বিশালতা, ধনগৌরব ও সামরিক বলে এসিয়াখণ্ডের অপরাপর সাম্রাজ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিল, এবং যাহার ঐশ্বর্য্যের স্বপ্নকাহিনীতে প্রলুব্ধ হইয়া বৈদেশিকগণ দলে দলে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিল, তাহার রাজস্বের পরিমাণ অবগত হইবার জন্য স্বভাবতঃই কৌতূহল জন্মিয়া থাকে। সুদৃশ্য রাজদরবার, বিপুল সৈন্য, অসংখ্য রাজকর্ম্মচারী, সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ডস্বরূপ আভিজাত সম্প্রদায় এবং রাজ-পরিবারবর্গের ভোগবিলাসের জন্য বাদসাহগণ প্রভূত ধনরাশি ব্যয় করিতেন। তাঁহারা এই প্রভূত ধনরাশি কি ভাবে সংগ্রহ করিতেন, তাহা আলোচনার যোগ্য। ভূমির রাজস্বই রাজস্বের প্রধান অংশ। আমরা এখানে তাহার একটী তালিকা প্রদান করিলাম।

আকবর	১৫৯৪	...	১৬ ৫৬ ৮৮০০০
ঐ	১৬০৫	...	১৭ ৪৪ ৮৮০০০
জাহাঙ্গীর	১৬২৭	...	১৭ ৪৯ ৩৩০০০

---

* Aurangzeb by Stanley Lane-Poole. (Rulers of India Series.)

শাহজাহান	১৬২৮	...	১৬ ৬৬ ৬৬০০০
ঐ	১৬৪৮	...	২২ ০০ ০০০০০
ঐ	১৬৫৫	...	২৬ ৭৩ ৭৭০০০
আওরঙ্গজীব	১৬৬০	...	২২ ৫৮ ৬৬০০০
ঐ	১৬৬৬	...	২৩ ৭৩ ৩৩০০০
ঐ	১৬৬৭	...	২৭ ৪২ ২২০০০
ঐ	১৬৯৭	...	৩৮ ৭১ ১১০০০
ঐ	১৭০৭	...	৩০ ১৭ ৭৭০০০

মোগল শাসনাধীনে ভূমির রাজস্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। আকবর বাদশাহের রাজত্বের শেষভাগে ভূমির রাজস্ব ১৬,৫৭,৮৮,০০০ নির্দ্ধারিত ছিল। কিন্তু আওরঙ্গজীব বাদশাহের চরমোন্নতির সময় উহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া ৩৮,৭১,১১,০০০ টাকায় পরিণত হইয়াছিল। করদরাজ্য সমূহ হইতে বাদশাহগণ যে রাজকর প্রাপ্ত হইতেন, তাহাও এই তালিকাতে গ্রহণ করা হইয়াছে। দক্ষিণাপথের স্বাধীন মুসলমান রাজ্য সকল করদরাজ্যে পরিণত হওয়াতেই ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ভূমির রাজস্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

উল্লিখিত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ১৬৬০ ও ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ভূমির রাজস্ব হ্রাস হইয়াছিল। আওরঙ্গজীবের সিংহাসনারোহণকালে অন্তর্বিপ্লবে সমস্ত ভারতবর্ষ আলোড়িত হইয়াছিল এবং তৎপর ভারতব্যাপী দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল; ইহাই ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে ভূমির রাজস্ব হ্রাস হইবার কারণ। দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহ ও দক্ষিণাপথের অরাজকতানিবন্ধন ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ভূমির রাজস্ব হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। শাসনকার্য্য-সংক্রান্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া রাজকোষে বাদশাহগণের নিজ ব্যয় জন্য কি পরিমাণ অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিত, আমরা তাহা নির্ণয় করিতেছি। মির আত-ই আলম নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থকর্ত্তা বলেন যে, মোগল সাম্রাজ্যের রাজস্ব ২৩,১১,৪২,৯০০ টাকা নির্দ্ধারিত ছিল, তন্মধ্যে বাদশাহগণ নিজ ব্যয় নির্ব্বাহার্থ (খালেসা) ৪,৩১,৯৯,৫০০ মুদ্রা গ্রহণ করিতেন; সৈনিক ও আভিজাত সম্প্রদায়ের জন্য (জায়গীর) ১৮,৭৯,৪৩,৩০০ মুদ্রা নির্দ্দিষ্ট ছিল। রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া রাজকোষে সমগ্র রাজস্বের ষষ্ঠাংশ হইতে পঞ্চমাংশ পর্য্যন্ত সঞ্চিত হইত।

আমরা এ পর্য্যন্ত কেবল ভূমির রাজস্ব সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছি। অন্যান্য উপায়ে কত মুদ্রা মোগল-রাজকোষে সঞ্চিত হইত, তাহা অবধারণ করার সুষ্ঠু উপায় নাই। আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, আকবর বাদশাহ আটত্রিশ প্রকার কর রহিত বা হ্রাস করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজীব বাদশাহের রাজত্বের প্রারম্ভে অন্তর্বিবাদে সমগ্র ভারতবর্ষ আলোড়িত ও ভারতব্যাপী দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে, তিনি আশি প্রকার কর রহিত করিয়াছিলেন। ইতিহাসবেত্তা কাফিখাঁ বলেন যে, ভূমির রাজস্ব ব্যতীত অন্য উপায়েও কোটী কোটী মুদ্রা রাজকোষে আনীত হইত। বাদশাহগণ কর রহিত করিবার আদেশ করিলে, রাজপুরুষগণ তৎসম্বন্ধে কোন মনোযোগ করিতেন না। আকবর বাদশাহ যে সকল রাজকর রহিত বা হ্রাস করিয়াছিলেন, আওরঙ্গজীব তাহার কতকগুলি পুনঃ স্থাপিত বা বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজীব মুসলমান পণ্যজীবীদিগকে শুল্ক হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন। কিন্তু পরে এই নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া হিন্দুরা যে পরিমাণ শুল্ক দিত, তাহার অর্দ্ধেক মুসলমানদের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। ভূমির রাজস্ব ব্যতীত নানা প্রকার হাসিল মাশুল, (Tolls) কর (Tax) ও অতিরিক্ত কর (Cess) হইতে মোগলরাজকোষে প্রচুর অর্থাগম হইত; কিন্তু সাময়িক মুসলমান ইতিহাস-বেত্তাগণ তাহার কোন তালিকা রক্ষা করেন নাই। আওরঙ্গজীব জিজিয়া কর পুনঃ স্থাপিত করিলে রাজস্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তার পর বাদশাহ সর্ব্বদা যে সকল মহার্ঘ্য দ্রব্য উপহার পাইতেন, তাহা হইতেও প্রচুর অর্থ লাভ হইত। যদিও তাঁহারা অন্যান্য বিষয়ক রাজস্ব সম্বন্ধে লেখনী চালনা করেন নাই, তথাপি আমরা বৈদেশিক পরিব্রাজকগণের নিকট হইতে কিছু তত্ত্ব পাইতে পারি। উইলিয়ম হাকিন্স সাহেব জাহাঙ্গীর বাদশাহের সুপরিচিত ছিলেন। তিনি বলেন যে, জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বকালে ১৬০৯ হইতে ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বার্ষিক পঞ্চাশ কোটী টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারিত ছিল। ভূমির রাজস্ব ও অন্যান্য উপায়ে সংগৃহীত অর্থ এই হিসাবে ধৃত হইয়া থাকিলে তাঁহার উক্তি অত্যধিক অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয় না। বৈদেশিক চিকিৎসক কাত্রু বলেন যে, আওরঙ্গজীব বাদশাহ অন্যান্য উপায়ে যে পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন, তাহা

২৫

ভূমির রাজস্ব হইতে ন্যূন ছিল না। কেবল মাত্র এক সুরাট হইতেই আওরঙ্গজীব প্রায় ৫১ লক্ষ টাকা লাভ করিতেন। ডাক্তার জিমিলি কেরারি দক্ষিণাপথে আওরঙ্গজীবের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, মোগলরাজ সমস্ত রাজস্ব বাবদ আশি কোটী টাকা পাইতেন। আমরা পূর্ব্বোল্লিখিত তালিকায় দেখিয়াছি যে, ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ৩৮,৭১,১১,০০০ টাকা ভূমির রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট ছিল। আমরা এই তিনজন বৈদেশিক পরিব্রাজকের বিবরণে ঐক্য দেখিতেছি। তাঁহাদের প্রত্যেকের মতানুসারে ভূমির রাজস্ব যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট ছিল, মোগল বাদশাহগণ সর্ব্বসাকুল্যে তাহার দ্বিগুণ রাজস্ব প্রাপ্ত হইতেন। মোগল-রাজত্বকালে ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বসাকুল্যে ৩৩,১৩,৭৭,০০০ টাকা রাজস্ব স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল; তৎপর ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া এক শতাব্দী পরে উহা ৭৭,৪২,২২,০০০ টাকাতে পরিণত হইয়াছিল। কাত্রু বলেন, "ঈদৃশ বিপুল রাজস্ব বিস্ময়জনক সন্দেহ নাই। কিন্তু এই অর্থরাশি চিরকাল রাজকোষে আবদ্ধ থাকিত না; প্রত্যেক বৎসর অন্ততঃ উহার অধিকাংশ বাহির হইয়া পড়িত ও পুনর্ব্বার সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র শত মুখে বিস্তৃত হইত। বিশাল মোগল-সাম্রাজ্যের অর্দ্ধাংশ রাজকীয় বদান্যতার উপর নির্ভর করিত। অসংখ্য রাজকর্ম্মচারী ও সৈন্য রাজকোষ হইতে প্রাপ্তবেতন দ্বারা তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করিত এবং যে সকল শ্রমজীবী কেবল মাত্র সম্রাটের জন্য পরিশ্রম করিত, তাহারাও রাজকোষ হইতে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ জন্য অর্থ প্রাপ্ত হইত। নগরবাসী অধিকাংশ শিল্পী মোগল কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া কার্য্যে নিরত থাকিত, তাহারাও রাজকোষ হইতে অর্থ শোষণ করিত।" মোগল বাদশাহগণ শত মুখে এত প্রচুর ব্যয় করিতেন যে, তাদৃশ বিপুল আয় সত্ত্বেও তাঁহারা অতি সামান্য সঞ্চয় করিতে পারিতেন। শাহজাহান বাদশাহের সুদীর্ঘ রাজত্বকাল শান্তিপূর্ণ ছিল, এবং বাদশাহ স্বয়ং রাজকোষে অর্থ-সঞ্চয় করিবার জন্য প্রয়াসী ছিলেন; তথাপি তিনি রাজকোষে নগদ ছয়কোটী মুদ্রাও সঞ্চিত করিতে পারেন নাই। আওরঙ্গজীবের মৃত্যুকালে কেবল তের লক্ষ টাকা রাজকোষে সঞ্চিত ছিল।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

পরিত্যক্তা।

সখা গো!

ফেলে দিবে ছিল যদি মনে,
কেন তবে লইলে তুলিয়া?
সাধ যদি দলিবে চরণে,
কেন শিরে রাখিলে ধরিয়া?
বাড়াইতে শুধু কি যাতনা
নাথ, হেন করিলে ছলনা?

বারিহীন ধূলিময় পথে
একপাশে ছিলাম পড়িয়া,
কেহ কভু পথে যেতে যেতে
চাহিত না সে দিকে ফিরিয়া,
জলভরা আঁখি দুটি ল'য়ে
আকাশের পানে ছিনু চেয়ে;

হৃদয়ের ব্যথা সমুদায়
জানাইতে ছিনু পরমেশে,
হেনকালে দীন ললনায়
তুলিয়া লইলে তুমি এসে,
সেই স্নেহ অসীম যতন
মনে হয় নিশার স্বপন!

নিশার স্বপন সম হায়,
ফুরা'য়ে গিয়াছে নাথ সবি';
ছদিনেই গেছে সমুদায়
মিলায়ে সে স্বপনের ছবি।
নরকের মাঝারে আবার
দেখ স্থান হয়েছে আমার।

সুখ পাই ক্ষতি নাই নাথ,
সুখেতে গঠিত অভাগিনী;
নিশিদিন দুখ আছে সাথ;
সে আমার জীবন-সঙ্গিনী;
অন্ধকার ঘোর না ডরাই
কিন্তু, চপলা-খেলায় কাজ নাই।

নাথ গো! শুধাই আবার, যদি মনে
ফেলে দিবে ছিল এ বাসনা,
তবে কেন বল সযতনে
তুলে নিলে দরিদ্র-ললনা?
ভেঙ্গে দিলে হৃদয়-বাঁধন,
শুষ্ক প্রাণ করিলে দহন?

শ্রীমন্মথকৃষ্ণ দেব।

মকর সংক্রান্তি।

মকর সংক্রান্তিটা বঙ্গদেশে পৌষপার্ব্বণ বলিয়াই বিশেষ পরিচিত। কেন, তা কি বলিতে হইবে? পৌষ-পার্ব্বণের সঙ্গে যে রাসনিক সম্বন্ধ আছে! সে পৌষ সংক্রান্তির চন্দ্রপুলি, রসবড়া, ভাজাপুলি হইতে গরীবের আসকে পর্য্যন্ত কি ভুলিবার জিনিস্? তাই আমরা পৌষ-পার্ব্বণই ভাল বুঝি! নামটা শুনিলেই যেন প্রাণটা চমকে ওঠে; আর চোখের সামনে ৫০ রকম পিঠে পুলির স্তূপ দেখি!

যিনি এই পৌষের মকর সংক্রান্তিতে পৌষ-পার্ব্বণের প্রথাটা চালাইয়া দিয়াছিলেন, সেই অজাতনামা মহাত্মাকে প্রণাম করি! তিনি ঠিক সময়টা নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। পৌষে শীত বেশ জাঁকিয়া বসিয়াছে, বেশ 'উপভোগক্ষম' কাল বটে; আবার সংক্রান্তিতেই মকর, "মকরে প্রথমো

রবি!" সুতরাং সূর্য্যতাপ ক্রমে পরে বাড়িয়া যাইবে; এই সংক্রান্তিটা হচ্ছে উত্তরের সন্ধিস্থল। এদিকেও হৈমন্তিক ধান্যের মরসুম শেষ হইয়া গিয়াছে, সকলেই নূতন ধান্য গোলাজাত করিয়া বেশ ফূর্ত্তিযুক্ত আছে, এ সময় একটা পর্ব্বানুষ্ঠান না করিলে কি ফূর্ত্তি থাকে? শীতকাল, বৃহৎ রাত্রি, খেয়ে বেশ আরাম করা যায়—উদরে গরম, বাহিরে গরম করিয়া বেশ ঘুম হয়—সুতরাং আহারের পার্ব্বণই এ সময়ে বেশ প্রশস্ত; সকলেই যাতে আমোদটা পেতে পারে, সুতরাং নূতন চালের পিঠে পুলি—সামান্য কৃষকও বেশ পার্ব্বণটা ভোগ করিতে পাইবে, কারণ সম্প্রতি সে হৈমন্তিক ধান্য গোলা-জাত করিয়াছে, বড় মানুষ যাঁরা—তাঁরাও ত বেশ পারিবেনই। অতএব পাঠক, দেখুন, যিনি পৌষ-পার্ব্বণটা প্রচলন করেছিলেন, তিনি বেশ বুদ্ধিপূর্ব্বক ভাবিয়া চিন্তিয়াই করিয়াছিলেন। এ সময়টা ব্যারাম যদিও বড় হয় না, সুতরাং গুরুপাক জিনিষে আপত্তি হইবার বা ভয় হইবার কথা নাই, তবে তাঁর ভবিষ্যৎ দৃষ্টি খুব প্রখর ছিল না, বোধ হয় তাই তিনি আজকালকার অজীর্ণ ও অম্লরোগদ্বয়ের কথা ভাবেন নাই।

সকল পার্ব্বণেরই একটা পূজা-অর্চ্চনা হয়, পৌষ-পার্ব্বণের পূজা বোধ হয় উদরপূজা—ঢেঁকি আর চাল! গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকায় ছবিতেই তার প্রমাণ দেখুন। দুর্গা পূজায় দুর্গার ছবি, কালী পূজায় কালীর ছবি, আর পৌষ-পার্ব্বণে ঢেঁকিতে চাল গুঁড়া করার ছবি।

বঙ্গে যে এই পৌষ-পার্ব্বণে কেবল পিঠা পুলিই হয়, তাহা নহে, কলা বিদ্যার চর্চ্চাও খুব হইয়া থাকে। সংক্রান্তির পূর্ব্ব দিবস চাউলের গুঁড়া জলে গুলিয়া গোলা প্রস্তুত করা হয়। প্রাতঃকালেই প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীর প্রাঙ্গণ বেশ পরিষ্কার করিয়া গোবরজল দ্বারা লেপিয়া রাখা হয়। তার পর বৈকালে বাটীর রমণীগণ এক একবাটী চাউলের গোলা আর একখণ্ড ছোট ন্যাকড়া লইয়া নিজ নিজ শিল্প-চাতুর্য্যের পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন। ন্যাকড়াটা গোলায় ভিজাইয়া হাতে লইয়া আবশ্যক মত টিপিয়া যথাস্থানে অঙ্গুলির ধারে দিতে থাকেন। কত প্রকার চিত্র বিচিত্র শিল্প-কৌশলই যে প্রদর্শিত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। নানা প্রকার লতা, পাতা, পদ্ম, চতুষ্কোণ, মণ্ডল, বৃত্তমণ্ডল, পূর্ণকুম্ভ ঝাড়, উদ্যান, হাতি, ঘোড়া, কুকুর,

খিড়াল, বাঘ, মহিষ, পালোয়ান, দ্বারবান্, পাকীবেহারা, ডুলিবেহারা, ঢেঁকিশালা, গোশালা ইত্যাদি অসংখ্য চিত্র প্রাঙ্গণের শোভা বৃদ্ধি করে। বঙ্গের সর্ব্বস্থলে ইহার প্রচলন আছে কি না, জানি না, তবে পূর্ব্ব বাঙ্গালার অনেক অনেকস্থলে ইহার বিশেষ প্রচলন আছে, এবং রমণীগণ বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে এই সব আলেপনা দিয়া থাকেন। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থলে ঐ পর্ব্বকে 'গোবর আলেপন' পর্ব্ব বলে। প্রথমে গোবরদ্বারা লেপিয়া, তার পর আলেপনা দেওয়াতেই ঐ নাম হইয়াছে। গোবররঞ্জিত শুষ্ক প্রাঙ্গণে ঐ সমস্ত সুধা-ধবলিত আলেপনাগুলি বাস্তবিকই দেখিতে বড় সুন্দর হয়, প্রাণ মন মুগ্ধ করে। জ্যোৎস্নারাত্রে ঐ সব আলেপনার উপর চন্দ্রকিরণ-সম্পাতে সে শোভা শতগুণ বৃদ্ধি হয়, এবং গুণগ্রাহী সৌন্দর্য্যপ্রিয় ব্যক্তিগণ তাহা দেখিয়া মোহিত হইয়া যান। কৃষ্ণপক্ষের তারামণ্ডিত রজনীতেও ঐ সব আলেপনা শ্বেত ছায়ার মত বোধ হয়।

ঐ দিনে ঐ সব স্থানে গরীবের দ্বারেও দ্বারবান্ দাঁড়ায়, স্বোদর পূরণে অক্ষম ব্যক্তির দ্বারেও "হস্ত্যশ্ব রথ পাদাত চতুরঙ্গবলের" আবির্ভাব হয়, নির্ধনের প্রাঙ্গণেও মুদ্রাপূর্ণ আয়স-সিন্ধুক পড়িয়া থাকে! সে বড় আমোদের দিন! বালক-বালিকাগণতো আনন্দে ছুটিয়া ছুটিয়া এখানে ওখানে নিজ নিজ বিদ্যানুযায়ী মানুষ গরু প্রভৃতির অস্থায়রূপ মানহানিকর আদর্শ অঙ্কিত করিতে থাকে; আর 'মা একটা হাতী দাও,' 'একটা দরয়ান দেওয়া হোলো না' ইত্যাদি রূপ বায়না করিতে থাকে! ২।১ সের চাউলের গুঁড়ার কমে কিছুতেই এ প্রকাণ্ড চিত্রকর্ম্মের অবসান হয় না, কোন কোন সময় রাত্রি হইয়া গেলেও আহারাদির কার্য্য ভুলিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া রমণীগণ এই আলেপনা দিতে থাকেন। পরদিন প্রাতে গ্রামের পাঁচজন বাড়ীর উপর আসিয়া যে সব আলেপনা দেখিয়া প্রশংসা করেন, তাহাদের চিত্র-কারিণীগণের মন তখন আনন্দে পূর্ণ হইয়া যায়, অবরোধের অন্ধকার তাঁহাদের আনন্দ হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। আজকাল এই আলেপনার চর্চ্চা অনেক কমিয়া গিয়াছে। কারণ আজকাল ঊনবিংশ শতাব্দীর নূতন সভ্যতার নিকট ওগুলি হেয় বলিয়া পরিত্যাজ্য হইয়াছে, সভ্য স্বামীর দেখা দেখি সভ্যা স্ত্রী, সভ্য ভ্রাতার দেখা দেখি সভ্যা ভগ্নী প্রভৃতি আর ও সব চিত্র-কর্ম্মে মন দেন না—অপমানই

বোধ করেন—কিন্তু পাঠক মহাশয়! বড় দুঃখে জিজ্ঞাসা করি, এটা কি হেয়—এটা কি পরিত্যাজ্য? এইরূপ আলেপনায় রমণীগণের চিত্রকলাবিদ্যায় কতদূর ক্ষমতা জন্মিত, কতদূর উৎকর্ষতা-বিধান হইত—খোলা প্রাঙ্গণে নিজ সাধ্যানুযায়ী চিত্র করিয়া সেটা সাধারণের নিকট প্রদর্শনীর মত উন্মুক্ত রাখা হইত, আর দশজনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া—দেখিয়া অযাচিত প্রশংসা দ্বারা অজ্ঞাতনাম্নী চিত্র-কারিণীর কত উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়া দিতেন! বলুন দেখি, এটা কি নিরুৎসাহ দিবার উপযুক্ত, কি উৎসাহ দিবার উপযুক্ত কলা? এই চিত্র-কার্য্যে বৃত্ত, সরলরেখা, বক্ররেখা, ডিম্বাকার ক্ষেত্র প্রভৃতির অঙ্কনে বেশ পরিপক্কতা লাভ হইত; এবং এই সব লতা পদ্মাদির অধিকাংশই সমদ্ব্যংশ-বিশিষ্ট (Symetrical) চিত্র হওয়ায়, সে গুলির বিষয়েও বেশ অভিজ্ঞতা এবং চিত্রের অনুপাত সম্বন্ধে বেশ জ্ঞান জন্মিত। চাউলের আলেপনায় মোটা রেখার চিত্রই ভাল হয়, সূক্ষ্মকাজের চিত্র ভাল দেখায় না, কিন্তু সেই মোটা কাজের মধ্যেও সূক্ষ্মকাজ থাকায় চিত্রগুলি বেশ নয়নরঞ্জক হয়—কিন্তু এটা প্রাচীন প্রথা বলিয়া—অসভ্যবোধে আমরা দূর করিয়া বিলাতী Drawing শিখাইতেছি—আমাদের এ Drawing টা যে কিসে এত হেয় হইল, বুঝি না। কুসংস্কারভীতি নামক এক দুরন্ত সংক্রামক ব্যাধি আমাদের মধ্যে আসিয়াই এ সব ঘটাইতেছে। যা কিছু প্রাচীন আমরা দেখি, তাই কুসংস্কার বলিয়া দূর করি—ভিতরে আর ডুবিয়া দেখি না! আমাদের দেশে শুভকার্য্যে পীঠে আলেপনা দেওয়াই প্রথা ছিল; তাতেও চিত্র-বিদ্যার উৎসাহ দেওয়া হইত, এখন তাহা কোন কোন স্থানে উঠিয়াই গিয়াছে, কোথাও কুল-ললনাদের হাত থেকে মালাকর বা চিত্র-ব্যবসায়ীর হস্তে সে পীঠ-চিত্রের ভার পড়িয়াছে, কুল-রমণীগণ না কি উহাতে অপমান বোধ করেন! হা অদৃষ্ট!

পিঠে পুলির কথায় কথায় কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি; পাঠক মাপ করিবেন—আলেপনার ক্রমশঃ লোপ দেখিয়া বড় দুঃখে কথাগুলি বলিলাম। যাহা হউক, বঙ্গের পৌষ-পার্ব্বণ ঐরূপ আলেপনায় আর নানাপ্রকার পিষ্টক পায়সে উদ্‌যাপন হইয়া থাকে। এ ব্রতেরও ব্রতী থাকেন; তাঁহারা সেদিন অন্নাহার করেন না, মুঠা পিঠে ও অন্যান্য পিঠে খাইয়া থাকেন! এটাও যেন একটা কল্পি... যে স্থানটা ভাত ডালে পূর্ণ হইত, তা শুদ্ধ পিঠেতেই

পূর্ণ হয়। তবে মুঠা পিঠাটা বড় সুখাদ্য নহে। চালের আটা প্রস্তুত করিয়া হাতের মুটোয় চাপিয়া একটা একটা ছোট তাল পাকান হয়, তাই দুধে আর মিষ্টিতে পাক করিয়া লওয়া হয়! উপরের দুধ আর মিষ্ট রসটুকু খেতে ভাল বটে, কিন্তু আঁটিটা আর খেতে ভাল লাগ্‌বে না! ফেলে দিতে ইচ্ছা হয়, না মিষ্টি—না কিছু, কেবল পিটুলির আটা! আস্‌কেপিঠে গরম গরম দুধ-রস-মিশ্রিত প্রস্তুত রসে ফেলিয়া রাখিয়া শেষে অনেকক্ষণ পর রস বেশ হাড়ে হাড়ে বিঁধিলে খাওয়ার সময় একটু গরম করিয়া লইলে মন্দ নয়,—বেশ হয়। সরুচুকলি, চন্দ্রপুলি, ভাজাপুলি, এঁদের কথাতো ছাড়িয়াই দিন! তারাতো অমৃত!

বঙ্গে পার্ব্বণ একরূপ শেষ হইল। এখন এই উড়িষ্যা দেশ সম্বন্ধে একটু অলোচনা করা যাউক। এখানেও পৌষ-পার্ব্বণ প্রচলিত আছে, তবে এখানে ইহাকে মাকরী সংক্রান্তিই বলে! পিঠে, পুলি এখানেও গৃহস্থগণ করিয়া থাকেন। উড়িয়াগণ চাউলের গুঁড়ার পিঠেতে কেমন মজবুত, তাহা কলিকাতার পাঠকের অবিদিত নাই—চাউলের গুঁড়া করা তো কলিকাতায় উড়িয়া প্রভুদেরই একচটিয়া! আর তাহাদের প্রস্তুত পিঠেও কলিকাতায় দেখিয়াছেন। সুতরাং এখানেও যে পিঠের বেশ আদর আছে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই, তবে সে সব পিঠের অধিকাংশই অধম অজীর্ণ রোগগ্রস্ত বাঙ্গালীর পক্ষে জারণ অসম্ভব! সে সব "পিঠে খেলে পেটে সয় না!" ভাল পিঠেও না আছে তা নয়, তবে আমাদের দেশের মত যেন বোধ হয় না।

এখানে ময়ূরভঞ্জে জগন্নাথমন্দিরে, পিঠে প্রস্তুত হয়। শ্রীজগন্নাথজীকে এ সময় পায়স পিষ্টক ভোগে পরিতৃপ্ত করা হয়, রামকৃষ্ণাদিও যাঁহারা আছেন, ফাঁক যান না! অধম আমরাই ফাঁকে পড়িয়া থাকি।

ময়ূরভঞ্জে পিষ্টকের প্রধান উপকরণ নারিকেলের বড় অভাব! পাওয়াই যায় না! যদি বা পাওয়া যায়, তবে সে অগ্নিমূল্য—৵০, ৶০ এক একটা! ভাল দুধও স্থানের তুলনায় দুর্ম্মূল্য, সুতরাং পিষ্টকের সুখ কেমন করিয়া হইবে? এখানে চিত্রকর্ম্মের প্রচলন এখনও যথেষ্ট আছে; কারণ বোধ হয়, এখনও ততটা সভ্য হয় নাই! এইবার এ রাজ্যের সাঁওতাল প্রভৃতির কথা বলিব। মকর সংক্রান্তি তাহাদের একটা বড় প্রধান পর্ব্ব!

এ সময় তাহাদের আমোদের সীমা নাই। এই সংক্রান্তিতে তাহারা বিশেষ স্ফূর্ত্তি ও আমোদ করিয়া বেড়ায়। এ যেন বাঙ্গালার দুর্গোৎসবের মত। সহরে তত বেশী দেখা যায় না; কারণ, উহারা সহরে বড় আসে না, কিন্তু তাহাদের গ্রামে গ্রামে এ সময় আনন্দের ঢেউ খেলিতেছে। সকলেই অথবা যথাসাধ্য অধিকাংশই এ সময় নূতন কাপড় কিনিয়া নানারঙ্গে রঞ্জিত করিয়া লয়। হরিদ্রাবর্ণে, বাসন্তীরঙ্গে, সবুজরঙ্গে, লালরঙ্গে--নানারঙ্গে কাপড় রঞ্জিত করিয়া পরিধান করে, বা উষ্ণীষরূপে মাথায় বাঁধে; রমণীগণ পরিধানই করে। রমণীগণ নব নব কিশলয় দ্বারা শিরোভূষণ ও কর্ণভূষণ করিয়া পরিধান করে। আর গীত-বাদ্যের ও নৃত্যের ফোয়ারা ছুটিতে থাকে। প্রাণ ভরিয়া হাণ্ডিয়া মদ্য পান করিয়া, মাদল লইয়া দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ নৃত্য-গীত করিয়া পথে পথে এবং গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বিচরণ করে। বালক বৃদ্ধের সহিত, যুবক বৃদ্ধার সহিত, তরুণী কিশোরের সহিত অবাধে মিশিয়া, প্রাণ খুলিয়া আমোদ করে। আর এই সময় তাহাদের "দেও" অর্থাৎ দেবতার পূজা করে। ইহাদের পুরোহিত একজন থাকে; সেই দেবতাকে আহ্বান করিয়া পূজা করে। আর অন্যেরা মহা স্ফূর্ত্তিতে তথায় নৃত্য-গীত করে। সাঁওতালদিগের দেবতার একটা নির্ণয় নাই বোধ হয়। বড় বড় গাছ তাহাদের এক দেবতা, বড় বড় পাথর—দেবতা। গাছের মূলের কাছে নানারূপ জন্তুর মৃণ্ময়মূর্ত্তিও থাকে, পাথরে সিন্দুর লেপিয়াও তথায় রাখিয়া দেয়। ইহা ব্যতীত সূর্য্যও নাকি তাহাদের এক দেবতা। সূর্য্যকে তাহারা আবাহন ও পূজা করে, আর তাঁহার এবং অন্যান্য দেবতার উদ্দেশে অনেক মুরগী, ছাগল, শূকর উৎসর্গ করিয়া বলিদান দেয়। এই মকর-সংক্রান্তি দেবপূজার এক প্রধান সময়। এই সময় কত পশু-পক্ষীরই যে কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই।

এইরূপ বলিদানের পর দেবপ্রসাদ-জন্তুগুলি লইয়া ঝল্‌সাইয়া, পোড়াইয়া, হাণ্ডিয়া সহযোগে উদরদেবের সেবায় লাগাইয়া দেয়, আর তার-পর দ্বিগুণ উৎসাহে ও স্ফূর্ত্তিতে গীত বাদ্য নৃত্য চলিতে থাকে। চাউলের দ্বারা ইহারাও একরূপ পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া থাকে, তবে তাহার আস্বাদ বা আকৃতি-দর্শনসম্বন্ধে এ ক্ষুদ্র লেখক অপরাধী হয়েন নাই। এই মকর-সংক্রান্তির

সময় এ রাজ্যে স্থানে স্থানে মেলা বসিয়া থাকে এবং ধান্য, চাউল, কলাই ইত্যাদি বেশ সুবিধাদরে যথেষ্ট বিক্রীত হয়। সাঁওতালগণ এই সব মেলায় ধান্যাদি বিক্রয় করিয়া তল্লব্ধ অর্থে এইরূপ স্ফূর্ত্তি করিয়া বেড়ায়। ইহাদের এই মকরের আমোদ প্রায় সপ্তাহকাল স্থায়ী হয়;—কেবল হাণ্ডিয়া পান আর নৃত্য-গীত-বাদ্য। সরল সাঁওতাল জাতি এইরূপে স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়া মকর-সংক্রান্তির উৎসব উদ্‌যাপন করে। আমাদের মকর-সংক্রান্তিরও এই-খানেই উদ্‌যাপন হউক।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

আবাহন।

শুভ্রবেশে স্মিতনেত্রে হস্তে করি স্বর্ণ বীণাখানি
আজি তুমি এসো বীণাপাণি!
তোমার কমল-করে সুকোমল-চম্পক পরশে
জননি, ঝঙ্কার' তার হৃদয়ের বাসন্তী হরষে,—
ফাল্গুন উঠুক জাগি' ধরণীর কেন্দ্রে কেন্দ্রে আজি,
প্রকৃতি ধরুক অর্ঘ্য পুষ্পরচা কাব্যগ্রন্থরাজি
চরণে তোমার—
চক্ষে কণ্ঠে হৃদিতলে এস আজি মাতঃ
চির-সাধনার!

উৎসবে নাচুক আজি নিখিলের চিত্ত-রাজধানী—
ওগো সুধা-সৌন্দর্য্যের রাণি!
তোমার নয়নজ্যোতিঃ হ'ক ব্যাপ্ত নভঃনীলিমায়,
তোমার সুরভিশ্বাস ব্যাপ্ত হ'ক চরাচরময়,

তোমার বিশদ বাস হ'ক ব্যাপ্ত প্রভাত-আলোকে;
তোমার অধর-হাস্য লিপ্ত হ'ক অ-শোক অশোকে
অনিন্দ্য-সুন্দরি।—
স্বর্ণ-শীর্ষ-শস্য হৃদি সঙ্গীত-হিল্লোলে
উঠুক শিহরি'।

সৃষ্টির আদিম সাক্ষী অনাদ্যন্ত সঙ্গীতরূপিণী
ওগো তুমি বেদারাধ্যা বাণি!
অখণ্ড আঁধারে যবে সারাবিশ্ব আছিল মগন—
ভীষণ জীবন-যুদ্ধে কুজ্ঝটির ভীম-আস্ফালন,
তোমারি তরল তানে এল শান্তি, এল সে একতা,
রবি শশী তারা পৃথ্বী জন্মি তবে বহিল বারতা
দূর—দূরান্তরে—
তোমারি মহিমা মাতঃ দিশি দিশি দিশি
অনন্ত অম্বরে!

বিশ্বের বিরাট দেহে ওগো তুমি চিন্ময়ী প্রকৃতি—
বিশ্বময় তোমারি আরতি;
বিকট জীমূতমন্দ্রে উঠে তব ভীষণ বিষাণ,
গম্ভীর জলধি-কণ্ঠে উঠে তব সঙ্গীত মহান,
নির্ঝর ঝর্ঝর গীতে, বিহগের সুতার নিস্বনে,
তটিনীর কল-কলে, মৃদুল মর্ম্মর সমীরণে—
তোমার রাগিণী;
সর্ব্বব্যাপী তুমি মাতঃ প্রসীদ সন্তানে
নিত্য, সুভাষিণি!

নিখিল সৌন্দর্য্য-রাজ্য তোমারি ত বীণার ঝঙ্কার—
বাগেশ্বরি, তুমি বিশ্বাধার।

সুদূর অতীতে কবে নির্জ্জনে আপন মনে বসি'
গেয়েছিলে কোন্ গান, ভিন্ন ভিন্ন তারি তানরাশি
তুষারে সলিলে শৈলে রূপান্তরে রয়েছে জীবিত,
আজো সে সঙ্গীতসুধা প্রাণে প্রাণে হইতেছে পীত
অসীম বিস্ময়ে;
চক্ষে কণ্ঠে বেঁধে দাও—সৌন্দর্য্য সঙ্গীত
ওগো, পরিচয়ে।

অনন্তব্রহ্মাণ্ড দেবি দাও আজি 'আমার' করিয়া—
কণ্ঠ দাও ভাষায় ভরিয়া—
সেই কণ্ঠ ল'য়ে মাগো রত্নাকর রচে রামায়ণ,
যেই কণ্ঠে কালিদাস শকুন্তলা করিল সৃজন,
যেই কণ্ঠে দত্ত কবি মেঘ-নাদে নাদিল দুন্দুভি,
যেই কণ্ঠে বীরগাথা আজিকার বৃদ্ধ অন্ধ কবি
গাহিল অতীতে,—
তারি ক্ষুদ্র ভগ্ন অংশ আজি কর দান
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিতে।

আজিকার উপ্ত বীজ সুপ্তি ছাড়ি' উঠিবে জাগিয়া
কালি' তব প্রসাদ লাগিয়া;
শাখায় পল্লবে পত্রে ফুলে ফলে বিকাশি' আপনা
সাগ্রহসাধনে তব দিবানিশি করিবে যাপনা
তোমারি নিকুঞ্জে, বাণি, ছায়াদানে সুরভিত শ্বাসে
রচিবে নূতন রাজ্য—তাহাদের যতটুকু আসে—
হে বিশ্বরঞ্জিনি!
পরাণের ভাষা দাও বাহিরের করি'
কোকিল-গঞ্জিনি!

আশাময়ী ভাষাময়ী স্বপ্নময়ী স্বর্ণময়ী বাণি—
অন্তরের বসন্তের রাণি!
বীণায় ঝঙ্কার আজি একবার—শুধু একবার,—
দেখি গো পাষাণ টুটি' বহে কি না ফল্গুনীরধার,
দেখি গো সলিল বিনা আছে কি না মঞ্জরী শুকায়ে,
দেখি এ বায়সকুলে আছে কি না কোকিল লুকায়ে,
মৃতসঞ্জীবনি!
আশীর্ব্বাদে আশীর্ব্বাদে শুভ্র কর শির
পতিতপাবনি!

বর্ত্তমান সাহিত্য ও মানসিক ব্যাধি।

"বর্ত্তমান সাহিত্য ও মানসিক ব্যাধি" কথাটী শুনিতে অনেকের নিকট অপ্রীতিকর হইতে পারে; কারণ, সাহিত্য-সেবায় চিত্তের মলিনতা ধৌত হয়, হৃদয় নির্ম্মল হইয়া পবিত্র জ্ঞানের আবাসরূপে গঠিত হয়; সাহিত্য-সেবাতেই জাতীয় উন্নতি ও মনুষ্যত্ব স্ফূর্ত্তি হয়,—এ হেন পবিত্র সাহিত্য হইতে মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব! অসম্ভব সত্য, কিন্তু আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই, জগতে অসম্ভবও সম্ভব হয়, সম্ভবও অসম্ভাবনায় পরিণত হয়।

সাহিত্যকে আমরা তিনটী স্তরে বিভক্ত করিতে পারি, যথা—ধর্ম্ম, ঐতিহাসিক, কাল্পনিক। এই ত্রিবিধ সাহিত্যেরই মুখ্য উদ্দেশ্য মানুষকে মানুষের মত করিয়া গঠিত করা। কিন্তু অধুনা আমরা সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়াছি—অধুনা দুই চারি ছত্র মিলাইয়া লিখিতে পারিলেই কবি হইতে পারা যায়, নিজ মনগড়া দুই চারিটা কথা সাজাইয়া লিখিতে পারিলেই "সাহিত্য-সেবী" নামে পরিচিত হইয়া, দশজনের নিকট হইতে বাহবা পাওয়া যায়। সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্যের ধার বড় একটা কেহ ধারেন না! অন্যের যশঃগৌরব বিধ্বস্ত করিয়া, নিজ নিজ জয়পতাকা

উড্ডীয়মান করিবার জন্য আমাদের মধ্যে অনেকেই লালায়িত; সাহিত্য-সেবার জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব;—বেশ, নূতন অমৃত দ্বারা সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে পার, কর—ক্ষতি নাই, পরন্তু সুখের কথা;—জাতীয় গৌরবের বিষয়। কিন্তু তাহা পারিবে কি? সে মৌলিকতা কোথায়? বর্ত্তমান সাহিত্যে আসল হইতে নকল বেশী, খাঁটি স্বর্ণ কচিৎ মিলিলেও—কেমিকেলই অধিক। 'মেঘনাদ বধ'-প্রণেতা অমর মধুসূদন দত্তের অমর লেখনী যখন অমৃতময় ছন্দোবন্দে সাহিত্য-জগৎ তাহার মধুর ঝঙ্কারে মাতাইয়া তুলিল, অমনই অমৃতাক্ষরের ছড়াছড়ি পড়িল, ক্রমে বালকের স্কুলের খাতায়, ষোড়শীর প্রণয়-লিপিতেও তাহা স্থান পাইল; সকলেই মধুসূদনের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন, চর্ব্বিত চর্ব্বণে অনেকেই উদরপূর্ত্তি করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে তৃপ্তি কোথায়? তাহার আর মূল্য কি? মৌলিকতা রাখিয়া গেলেন অমর মধুসূদন দত্ত।

কবিবর হেমচন্দ্রের নিকট আমরা বহু পরিমাণে ঋণী, সাহিত্য-ভাণ্ডারে তিনি বহু অমূল্য রত্ন দান করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার মৌলিকতা কাব্য-জগতে অতুল সুধা দান করিয়াছে, ইহা মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিতে হয়। এ সম্বন্ধে কবিবর রবীন্দ্রনাথের নিকটও আমরা যথেষ্ট ঋণী, তাঁহার মৌলিকতা অনেকেরই চিত্তাকর্ষক; সেই জন্যই আধুনিক স্ত্রী-পুরুষ উভয় শ্রেণীর কবিগণের কাব্যাবলীতে রবীন্দ্রনাথের ছায়াই দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই বর্ত্তমান কাব্যযুগকে কেহ কেহ "রবীন্দ্রীয় যুগ" বলিতে কুণ্ঠিত হন না, কিন্তু এত অনুকরণে নূতন রত্ন কিছু আবিষ্কৃত হইতেছে কি? যদি তাহাই না হইল, তবে একের মৌলিকতা লইয়া শত শত জনের টানাটানি করিয়া ফল কি?

কাব্য-জগতে মহাত্মা বঙ্কিমবাবু অমর, তাঁহার অনুকরণ পূর্ব্বক সাহিত্যসমাজে যশঃলাভের জন্য অনেকেই লালায়িত, কিন্তু বঙ্কিমবাবুর ন্যায় গদ্য-সাহিত্যে নব যুগ আনয়ন করিতে আমাদের মধ্যে এ পর্য্যন্ত কয়জনের সামর্থ্য হইয়াছে?

এরূপ অনুকরণপ্রিয়তায় কোন ফল নাই, অধিকন্তু এই অনুকরণ-প্রিয়তা হইতেই আমরা মৌলিকতা হারাইয়া ফেলিতেছি। আমাদের মৌলি-

কতা হারাইবার আর একটী কারণ, সম্পাদক ও পাঠকগণের পক্ষপাতিত্ব। আমাদের দেশে "পরের মুখে ঝাল খাওয়া"-ব্যক্তিরই সংখ্যা অধিক। নূতন লেখক-লেখিকাগণ কোনও খ্যাতনামা সাহিত্যসেবীর নিকট হইতে কোন গতিকে একখানি প্রশংসাপত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় রচনার সহিত তাহা সংযোজিত করিয়া সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পাঠাইলেন; সম্পাদক মহাশয়ও তাহার ভাল মন্দ বিচার না করিয়া অবাধে স্বীয় পত্রিকায় স্থানদান করিলেন, তাহার লেখনীর কোন সারবত্বা না থাকিলেও ক্রমে তিনি উক্ত পত্রিকার প্রসিদ্ধ লেখক বা লেখিকারূপে পরিণত হইলেন, ও কালে কতকগুলি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া সাহিত্য-ভাণ্ডারের আবর্জ্জনার মাত্রা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন; এবং সেই সকল সারহীন প্রবন্ধ ও পুস্তকাদির প্রশংসাপত্র দৃষ্টে পাঠকগণও এত মুগ্ধ হইলেন যে, লেখক বা লেখিকার সম্বন্ধে কোনরূপ স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে তাঁহাদের সামর্থ্য রহিল না, তাঁহারাও অবাধে প্রশংসাপত্রদাতার সহিত একমত হইলেন, সুতরাং লেখক বা লেখিকার পক্ষে তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনে (প্রশংসালাভে) কোনরূপ অন্তরায় ঘটিতে পায় না; অধিকন্তু, তাঁহারা প্রশ্রয় পাইয়া মৌলিকতার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, যাহা তাহা লিখিয়া যাইতে লাগিলেন। আবার এমনও দেখা যায়, কোন কোন প্রতিভাবান্ পুরুস বা প্রতিভাময়ী রমণী প্রকৃতরূপে মৌলিকতা-রাজ্যে প্রবেশ করিয়াও তাঁহারা সাহিত্য-জগতে উচ্চাসন প্রাপ্তির প্রকৃত অধিকারী ও অধিকারিণী হইলেও উপযুক্ত সার্টিফিকেট অভাবে সাহিত্যক্ষেত্র হইতে সম্মান প্রাপ্ত হওয়া দূরের কথা, অবজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সুতরাং উক্ত লেখক লেখিকাদিগের বিমল প্রতিভা ভগ্নমনোরথ হইয়া অনুস্তে বিলীন হয়, উদ্যম—উৎসাহ নিবিয়া যায়, মৌলিকতা নষ্ট হয়। এই জন্যই বলিতে হয়, আমাদের মৌলিকতা নষ্টের জন্য লেখক-লেখিকাগণ অপেক্ষা সম্পাদক ও পাঠকগণ অধিক দায়ী। বন্ধুত্ব বা অর্থের খাতিরে কাহারও তোষামোদ না করিয়া প্রকৃত বিচারপূর্ব্বক সাহিত্যসেবীদিগের যথাযোগ্য আসন দেওয়া কর্ত্তব্য; নচেৎ, "বাহবা" পূর্ব্বক উৎসাহ দিলেও সে উৎসাহ কার্য্যকর না হইয়া সাহিত্য-ভাণ্ডারে আবর্জ্জনা বৃদ্ধির কারণ হইয়া উঠে। আমি যখন প্রথম পুস্তক প্রণয়ন করি, আধুনিক নিয়মানুসারে প্রশংসাপত্র

লাভাশার কয়েকজন খ্যাতনামা সাহিত্যসেবীর নিকট পুস্তক প্রেরণ করি; যখন আধুনিক নিয়মই এই, তখন আমিই বা তাহার ব্যতিক্রম করিব কেন? বলা বাহুল্য, একবাক্যে সকলেই পুস্তকের প্রশংসা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কোন মহাত্মা লিখিয়াছিলেন,—"প্রশংসাপত্র দিয়া আপনাকে উৎসাহিতা করিতে চাহি না, প্রশংসাপত্রের আবার মূল্য কি?—আপনি প্রতিভার অনুবর্ত্তিনী হউন, প্রতিভাই একদিন আপনাকে সাহিত্য-রাজ্যের উচ্চাসন প্রদান করিবে।" সে আজ চারি বৎসরের কথা, কিন্তু সেই অমূল্য কথা কয়টী এখনও আমার হৃদয় জুড়িয়া আছে, এখনও মধুর বীণার স্বরে হৃদয়ে ঝঙ্কার দিতেছে, ইহা না হইলে কি উৎসাহ? উৎসাহদাতাগণ এরূপ উৎসাহ না দিয়া কেবল "কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ" বলিয়া গেলে, লেখক বা লেখিকাদিগের লেখনীতে অমৃত বর্ষণ হইবে কিরূপে?—সাহিত্যরাজ্যে নবাগন্তুক ব্যক্তি-দিগকে উৎসাহ দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন, নতুবা তাঁহাদের প্রতিভা নিস্তেজ হইয়া পড়ে, কিন্তু সে উৎসাহ যেন প্রকৃত উৎসাহের কাজ করে; অসার রচনাকারী ও রচনাকারিণীদিগের প্রশ্রয়স্বরূপ না হয়।

আর একটী কথা, স্ত্রীলোক হইলেও তাঁহাদিগকেও উপযুক্ত সমালোচনা বা আসন হইতে বিচ্যুত করাও সম্পাদক বা পাঠকগণের কর্ত্তব্য নহে। কেন না, তাঁহারা স্ত্রীলোক হইলেও সাহিত্যসেবিনী, প্রকৃত বিচার-পূর্ব্বক যদি তাঁহারা উচ্চ আসনের যোগ্যা হন, তবে তাঁহাদিগকে না দিলে সাহিত্যের অবমাননা করা হয়, এবং সাহিত্য-ভাণ্ডারে কতকগুলি অমূল্য রত্নলাভের বিঘ্ন ঘটে। পক্ষান্তরে তাঁহাদের রচনা সকল যদি সারহীন হয়, তবে উপযুক্ত সমালোচনা অভাবে সাহিত্য-ভাণ্ডার আবর্জ্জনাময় হইয়া উঠে। অতএব সাহিত্যসম্বন্ধে কি ভাল, কি মন্দ, স্ত্রী-পুরুষের উভয় পক্ষেরই বিচারে শিথিলতা থাকা কর্ত্তব্য নহে। তাহা থাকিলে ভবিষ্যতে সাহিত্য-ভাণ্ডারের আবর্জ্জনা বিদূরিত করা দুরূহ হইয়া উঠিবে।

আমরা কথায় কথায় প্রস্তাবিত বিষয় ছাড়িয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন প্রকৃত পথানুসরণ করা যাউক। সাহিত্য হইতে মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি কিরূপ? সাহিত্য হইতে আত্মগৌরব বাসনা বড়ই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি, অনেক সময় ইহা ব্যাধির ন্যায় প্রকাশ পাইয়া

আমাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া তুলে। আত্মগৌরব মন্দ জিনিষ, তাহা বলি না, বরং আত্মগৌরবহীন হইয়া পড়িলে জীবন বিষময় হইয়া উঠে, সকল সময় "তৃণাদপি সুনীচেন" এ নীতি সংসারী জীবের পক্ষে খাটে না। কিন্তু যখন আমরা মহা মহা সাহিত্য-রথিগণকে তাঁহাদের প্রাপ্য আসন হইতে বিচ্যুত করিয়া সেই আসনে স্বয়ং উপবেশন করিবার বাসনায়, সেই মহাত্মার নিন্দা-রটনা ও বহুবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া আত্মগৌরব বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা করি, তখনই "আত্মগৌরব" আমাদের মানসিক ব্যাধিরূপে পরিণত হয়।

মহাত্মা বঙ্কিম বাবুর নিকট বঙ্গসাহিত্য যে সমধিক উপকৃত, তাহা অস্বীকার করিলে কৃতঘ্নতা হয়; কিন্তু আমরা তাহা ভুলিয়া গিয়া তাঁহার রচনার, তাঁহার চরিত্রের ত্রুটি অন্বেষণ করিবার জন্যই ব্যস্ত, তাঁহার অসামান্য যশোরাশি বিধ্বস্ত করিয়া নিজ নিজ পাণ্ডিত্য প্রচার করিবার জন্য আমরা লালায়িত।

কবিবর নবীনচন্দ্রের রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, এই তিনখানি গ্রন্থ হইতে আমরা একখানি "মহাকাব্য" লাভ করিয়াছি, আমাদের বঙ্গ-সাহিত্য নূতন ভূষণে ভূষিত হইয়াছে; কিন্তু উক্ত কবিবরের নিকট আমাদের ঋণী বা কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাক, কোথায় তাঁহার কোন ত্রুটি হইয়াছে, তাহাই প্রতিপন্ন করিয়া নিজের উন্নত মস্তক স্ফীত করিতে চাই—নীর ত্যাগ করিয়া ক্ষীর গ্রহণ করিতে আমরা জানি না—পারি না। আত্ম-গৌরব-লাভের জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা ও জাতীয় মর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিতে পশ্চাৎপদ হই না, এরূপ আত্ম-গৌরব-বাসনাকে "মানসিক ব্যাধি" ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? আমাদের সাহিত্যে আর একটী সংক্রামক ব্যাধির সমধিক বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রণয়। প্রণয়ের ছড়াছড়ি ব্যতীত কাব্য, উপন্যাস পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় না, ইহাই আধুনিক ধ্রুব ধারণা। সুতরাং গদ্য, পদ্য, গল্প, প্রহসন সমস্তই প্রণয়ে পরিপূর্ণ—যেন এটা প্রণয়যুগ। প্রকৃতরূপে প্রণয়যুগ হইলে ক্ষতি ছিল না; প্রণয় পবিত্র পদার্থ, প্রণয় মানুষকে দেবতা করে, প্রণয় যদি প্রত্যেক মানবচিত্তে এরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হয়, তবে আমরা এই জগতেই স্বর্গের প্রতিচ্ছায়া দেখিতে পাইতে পারি, কিন্তু এ প্রণয় সে প্রণয়

নহে;—যে প্রণয়বলে সাবিত্রী মৃত-পতি ফিরিয়া পাইয়াছিলেন, সীতা অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, মহাদেব উন্মত্ত হইয়াছিলেন, এ প্রণয় অপেক্ষা সে প্রণয় বহু উর্দ্ধে অবস্থিত। আধুনিক কাব্যোপন্যাসে সেরূপ আদর্শপ্রেম নাই, সে মহাপ্রেমের শিক্ষা নাই, অধিকন্তু সাহিত্যসমূহে আমরা যে প্রেমের চিত্র দেখিতে পাই, তাহা অতীব জঘন্য।

"Greater love hath no man than this,
That a man lay down his life for his friends." (John)

ইহাই আদর্শপ্রেমিক-চরিত্র। প্রেমিক কবি চণ্ডীদাসের মতে যিনি——"আপনা ভুলিয়া পরেতে মিশাতে পারে", তিনিই প্রকৃত প্রেমিক। কিন্তু অধুনা সে আদর্শ প্রেম কোথায়? অধুনা দেখিতে পাই, অমুক নায়িকা অমুককে দেখিয়া ভালবাসিয়া ফেলিলেন, তাঁহাকে একদণ্ড না দেখিলে থাকিতে পারেন না—কিছুতেই তাঁহার শান্তি নাই—অবশেষে স্বয়ং চিত্তচোরের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন, অথবা সেই চিত্তচোর ব্যতীত আর কাহাকেও বিবাহ করিবেন না, এইরূপ একটা ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়া বসিলেন, পিতা মাতা বা অভিভাবকদিগের বংশমর্য্যাদা বা তাঁহাদের শান্তি-প্রীতির দিকে চাহিলেন না, কিংবা যিনি তাঁহার চিত্তচোর, তিনি তাঁহার যোগ্য কি না, এ মিলন সুখের হইবে কি না, তাহা কিছুই ভাবিয়া দেখেন না; পক্ষান্তরে নায়কদিগেরও সেই অবস্থা। ফলকথা, আধুনিক সাহিত্যে যাহাকে প্রণয় নামে অভিহিত করা হয়, তাহা প্রণয় নহে, প্রকৃত-পক্ষে উহা যৌবনসুলভ প্রবৃত্তির মাদকতামাত্র। প্রকৃত প্রেমে উচ্ছৃঙ্খলতা নাই। আত্মত্যাগ আছে,—কর্ত্তব্যের শিথিলতা নাই। মহাত্মা বঙ্কিম বাবুর বর্ণিত "প্রতাপ" প্রেমিকের উজ্জ্বল আদর্শ, কিন্তু আধুনিক সাহিত্যে কয়জন প্রতাপ দেখিতে পাই? শৈবলিনীর সংখ্যাই অধিক, আর সেই সকল সাহিত্যানুশীলন করিয়া সমাজে যে, শৈবলিনীর সৃষ্টি অধিক হইতেছে, তাহা অকপটচিত্তে বলা যাইতে পারে। আধুনিক নরনারীগণ আপনাদের বাস্তব জীবনকে উপন্যাসবর্ণিত কাল্পনিক জীবন করিতে চাহেন। তাঁহাদের জীবনটা যে স্বপ্ন নহে, কল্পনারাজ্যে যাহা সহজলভ্য, বাস্তব জগতে তাহা দুর্লভ; মানবজীবন কাল্পনিক নহে—বাস্তব, সংসারের সহিত যে কঠোর সংগ্রামই

মানবজীবনের অনিবার্য্য লক্ষ্য, তাহা তাঁহারা ভুলিয়া গিয়া নিজ নিজ মনোমধ্যে প্রণয়ব্যাধির সৃষ্টি করিয়া আজীবনকাল যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হন, এবং সংসার, নিরপরাধ সহযোগী ও সহযোগিনীর জীবনকে অশান্তিময় করিয়া তুলেন। আধুনিক সাহিত্যই এই মানসিক ব্যাধির স্রষ্টা, এই জন্যই কর্ত্তারা অনেকস্থলে রমণীদিগকে নাটক নভেল পড়িতে দিতে ভালবাসেন না। সাহিত্য হইতে এই প্রণয়স্রোতের গতি না ফিরাইলে মানবের মানসিক ব্যাধি ও সংসারের অশান্তি ঘুচিবে না।

শ্রীনগেন্দ্রবালা মুস্তোফী।

প্রেম-বৈচিত্র্য।

দশম পরিচ্ছেদ

কথায় বলে, "বয়স যায় না জল যায়", সেটা কিন্তু নিতান্ত মিথ্যা নহে। যখন সিন্ধুর বিবাহ হইল, তখন ত তার সহোদরা চারুর বয়স সবেমাত্র আট। সিন্ধুর পিতা, সিন্ধুকে পাত্রস্থ করিয়া ভাবিয়াছিলেন, 'আঃ, কয় বৎসরের মত ত ভাবনা চিন্তা হইতে বাঁচা গেল!' কিন্তু তিনটা বৎসর যে দেখিতে দেখিতে অতীত হইল! সেই সে দিনকার মেয়ে চারু ইহারই মধ্যে বিবাহের যোগ্যা হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সুপাত্রের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না, পিতা ধীরে সুস্থে চেষ্টা করিতেছেন, আর মা, তাঁর উদ্বেগের কথায় আর কাজ কি—চক্ষে নিদ্রা নাই, আহারে রুচি নাই, গৃহকর্ম্মে—তন্ময়তা নাই, মুখেরও কামাই নাই! কেমন করিয়া জাতি-কুল রক্ষা হইবে, 'ধর্ম্ম থাকিবে, তিনি এই ভাবনাতেই অধীর! বার বছরের মেয়ে যার গলায়,

সে কেমন করিয়া স্থির থাকে, গৃহিণী ত তাহা বুঝিতেই পারেন না, কাজেই বাক্যবাণে কর্ত্তা সর্ব্বদাই জর্জ্জরিত! কর্ত্তা ত আজকাল অন্দরমহলে দিবা-ভাগে বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন প্রায়ই প্রবেশ করেন না, আহারান্তে নথনাড়ার ভয়ে অধিকক্ষণ অন্দরে তিষ্ঠেন না। রাত্রিতে গৃহিণী শয়নগৃহে প্রবেশের পূর্ব্বেই নিদ্রায় অভিভূত হন! সহজে নিদ্রা না আসিলে কপটনিদ্রার আশ্রয় লন! কিন্তু এত করিয়াও গৃহিণীর হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই। মরার উপর খাঁড়ার ঘা চলে না, কিন্তু কন্যাদায়গ্রস্তা জননী সে বিধি-নিষেধের ধার ধারেন না। ঘুমাইয়াও কর্ত্তার নিস্তার নাই। গৃহিণী তাঁহার বচনভাণ্ডের অক্ষয় তূণ হইতে বাছিয়া বাছিয়া এমন এমন বিষাক্তবাণ প্রয়োগ করেন যে, কপটনিদ্রাভিভূত কর্ত্তাটীকে মাঝে মাঝে অন্ততঃ পাশ-মোড়াও দিতে হয়! গৃহিণীর অন্যায় ও অর্থশূন্য কথার প্রতিবাদ করিবার লোভটাও, সময় সময় কর্ত্তার অসংবরণীয় হইয়া উঠে, কিন্তু পাছে, তাঁর এই কপট বিদ্যাটা ধরা পড়ে, তাই কিল খাইয়া কিল চুরি করেন, আর মনে মনে ভাবেন—"কাশী মিত্র বা নিমতলার ঘাট কোনটাই শর্ম্মার অবিদিত নাই, তবে মরে যে আছি, এই দুঃখ!" কিন্তু সব সময়েই যে কর্ত্তার কৌশল খাটে, তা নয়; এক সময় না এক সময় তাঁকে গৃহিণীর হাতে পড়িতেই হয়। তখন গৃহিণীর বচনে জোয়ার বহে, মুখে খৈ ফোটে, চোখে আগুন ছুটে! তখন কোথায় লাগে সুরেন্ বাঁড়ুয্যের "ইলোকোয়েন্স", আর কোথায় বা লাগে কালীবাবুর "রিজনিং"! তা সুরেন্ বাঁড়ুয্যের বক্তৃতাতেও দেশ জাগিল না—আর গৃহিণীর বচনেও কর্ত্তাকে টলাইতে পারিল না। কর্ত্তার কঠিন চর্ম্ম গৃহিণী কিছুতেই ভেদ করিতে পারিলেন না, কারণ কর্ত্তা একটু একেলে লোক, "মেয়ের বার বছর বয়স হলোত কি হলো?—ঐ তোমাদের পুরাকালের 'সাবিত্রীর' বিবাহ কত বয়সে হইয়াছিল?" কিন্তু কর্ত্তার এ সকল যুক্তি কে শুনে! গৃহিণী যখন কিছুতেই আর কর্ত্তাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না, তখন রমণীর যে অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র—অশ্রুকণা তাহাই প্রয়োগ করিলেন!—গিন্নি কাঁদিয়া কেবল যে মাটী ভিজাইলেন, তাহা নহে; কর্ত্তার মনও ভিজাইয়া দিলেন। অবলার বল—চক্ষের জল,—গৃহিণী বুঝি এতদিন তাহা ভুলিয়াছিলেন। তা গৃহিণীরই বা দোষ দিব কি? আমাদের দেশের

বড় বড় রাজনৈতিকেরাও এ কথা ভুলিয়া আছেন। যে দুর্ব্বল, তাহার বচন-বীরত্বে কি লাভ? মুণ্ডমালার দাঁত-খামুটিতে কি কর্ত্তাদের মন টলে? আমাদের সম্বল যে চক্ষের জল! "বালানাং রোদনং বলং।" তা সে কথা যাক্, কথা হইতেছিল, চারুর বিবাহ সম্বন্ধে; কর্ত্তা এক্ষণে বিশেষ করিয়া আত্মীয়-বন্ধুকে সুপাত্রের সন্ধান জন্য লিখিলেন, গৃহিণীর কিন্তু ইচ্ছা, কর্ত্তা স্বয়ং কিছুদিন পাত্রের অনুসন্ধানে ফিরেন। তা কর্ত্তা সে দিক দিয়া যান না, তাঁর কথা, বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি! কিন্তু এতদিনে বুঝি চারুর বিবাহের ফুল ফুটিল! প্রভাত একটী সুপাত্র স্থির করিয়াছেন। পাত্রটী এককালে প্রভাতেরই সতীর্থ ছিলেন, চারি বৎসর পূর্ব্বে, সিন্ধুর সহিত এই পাত্রের সম্বন্ধের কথাবার্ত্তা হয়, কিন্তু তখন, এ পাত্রের বিবাহে মত ছিল না,—তিনি লেখা পড়া শেষ না করিয়া, বিশেষতঃ এগার বার বৎসরের মেয়ে বিবাহ করিতে সম্মত ছিলেন না। 'ল' পাস করিয়া প্রাক্‌টিস্ করিতে করিতে এক্ষণে কিন্তু তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিঞ্চিৎ নগদ অর্থ পাইলে এখন তিনি পাত্রীর পিতাকে গৌরীদানের ফলভোগী করিতেও কুণ্ঠিত নহেন!

পাঁচটা পাশ করা উকিল জামাই পাওয়া গিয়াছে, জানিয়া গৃহিণী আহ্লাদে আটখানা হইলেন—প্রভাতকে রাজ-রাজ্যেশ্বর হইবার বর দিয়া স্বহস্তে পত্র দিলেন—"বাপাজী, সেই পাত্রই স্থির ক'রো, টাকার জন্য আটকাইবে না—কিন্তু এই আষাঢ় মাসেই বিবাহ দিতে হইবে।"

নগদ টাকার পরিমাণ শুনিয়া কর্ত্তা কিছু ইতস্ততে পড়িয়াছিলেন, সভয়ে গৃহিণীকে আপত্তির একটু আভাসও দিয়াছিলেন—কিন্তু তাহাতেই গৃহিণী দলিত ফণিনীর মত গর্জ্জিয়া উঠিলেন। দারুণ ক্রোধের সহিত বলিলেন, "সেইখানেই মেয়ে দেব, দেব, দেব, ওখানে যদি বিয়ে না হয়, তা' কোন বেটী না গলায় দড়ি দেয়।"

সর্ব্বনাশ! ইহার উপর আর কথা চলে না!

* * * * * * * *

সব ঠিকঠাক। আষাঢ় মাসেই বিবাহ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

আষাঢ় মাস। সন্ধ্যা অতীত। যেমন মেঘ, তেমনি বৃষ্টি, বাতাসেরও বড় জোর। সিন্ধু ভগিনী-চারুকে "কনে" সাজাইতে সাজাইতে মাঝে মাঝে যেন অন্যমনস্ক হইতেছে। সিন্ধুর এ ভাবান্তর আর কেহ বুঝিতে না পারিলেও চারু বুঝিয়াছিল; সে তার দিদির মনের ভাব লুফিয়া লইয়া বলিল, "দিদি! কই প্রভাত বাবুত এলেন না?" সে সময় সেখানে আর কেহ ছিল না,—সিন্ধু নিশ্বাসটা একটু জোরে ফেলিয়া বলিল, "তাইত ভাই, আমিও ভাবচি, পথে না জানি কত কষ্টই পাচ্চেন।" সিন্ধু তবু মনের সকল আশঙ্কা খুলিয়া বলিল না। আজ ভগিনীর বিবাহের এ উৎসব, এ আমোদ যেন তার নিকট কেমন ফাঁক ফাঁক মনে হইতেছে, সে যেন প্রাণ ঢালিয়া ইহাতে যোগ দিতে পারিতেছে না! সিন্ধুর মাও দুই একবার প্রভাতের কথা তুলিলেন। চারুর বিয়ে, জামাই এলেন না, এ অভিমানও করিলেন, সিন্ধু কিন্তু জানিত, বিশেষ কোন বিঘ্ন না ঘটিলে স্বামী আসিবেনই, সেই জন্যই তার অধিক চিন্তা।

ক্রমে বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইল, 'কনেকে' বিবাহ সভায় লইয়া যাইতে হইবে। তিন চারিজন আত্মীয় যুবক পীড়ি ধরিতে আসিলেন,—তাহার মধ্যে অতিমাত্র স্নেহের স্বরে, স্মিতমুখে কে বলিল, 'কি চারু!' চারু প্রশ্ন-কর্ত্তার দিকে চাহিয়া একমুখ হাসিয়া যেন লজ্জায় মুখ নামাইল। এমন মিঠে আওয়াজে, চেনা গলায় কে ডাকে ওই? সিন্ধু চাহিয়া দেখিল,—তাইত, এ যে তারই প্রভাত! চারি চক্ষে মিলিল, নয়নে নয়নে হাসি উথলিয়া উঠিল! সিন্ধুর মনের মেঘ কাটিয়া গেল। এতক্ষণে সিন্ধুর হৃদয়ে আনন্দের হিল্লোল দেখা দিল।

এইবার 'কনে' ধরিবার পালা। চারিজন বাহকের মধ্যে প্রভাতেরই কিছু বিপদ! প্রভাত পীড়ি ধরিতে না ধরিতে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে কিল পড়িতে আরম্ভ হইল,—কোমলাঙ্গীদের হস্তের কিলে কোমলত্ব থাকিবে, রসিকেরাই এইরূপ আশা করেন, কিন্তু প্রভাত কিছু অরসিক, তিনি অবলা-বৃন্দের মুষ্টিযোগে তেমন রস উপভোগ করিতে পারিলেন না। প্রভাত

শ্যালাজের সুকোমল কর-পল্লবের মুষ্টি-ফল ভাদ্রমাসের তালের ন্যায় পৃষ্ঠে অনুভব করিয়া সহযোগী সম্বন্ধীকে উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "ভাই, তুমি যাহার কোমল সংস্পর্শে সুখ কি দুঃখ অনুভব করিতে পার না—একেবারে বিভোর হইয়া পড়,—

স এবায়ং তস্মাস্তহিনকর কৌপম্যমুভগো
ময়া লব্ধঃ পাণির্ললিত লবলীকন্দলনিভঃ ॥

কিন্তু আমার ভাগ্যে বিপরীত ফল। তোমার নিকট যাহা "মৃদুনি কুসুমাদপি", আমার কপালগুণে তাহাই 'বজ্রাদপি কঠোরাণি।'

প্রভাত শ্যালাজকেও এই মর্ম্মে বিদ্রূপ করিতে ছাড়িলেন না! তারপর সাত পাক আরম্ভ হইল। প্রভাত চারুর কাণে কাণে বলিলেন, "চারু, আমি আছি, তোমার দাদা আছেন, পাত্রও আছেন, এর মধ্যে সাত পাকের বাঁধাবাঁধিটা কার সঙ্গে হ'লে ভাল হয় বলত?" চারু অনেক কষ্টে হাসি চাপিয়া অন্যের অলক্ষ্যে প্রভাত বাবুর হাতে একটী সোহাগের চিমটী কাটিলেন. এটী কিন্তু কুসুমের মত মৃদুই বটে!

শুভদৃষ্টির সময় আসিল, চারিদিকে লাল আলো জ্বলিয়া উঠিল—পুরাঙ্গনাগণ হুলুধ্বনি দিয়া উঠিলেন—পাত্র মন্মথ বাবু সেই সময় একবার প্রাঙ্গণ হইতে হুলুধ্বনির উদ্দেশে উপরে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন, এক অলোকসামান্য যুবতী, সুন্দর বসন-ভূষণে বিভূষিত হইয়া রমণীমণ্ডলীর অগ্রে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিতেছেন!

সেই হরিণাক্ষীর স্নিগ্ধ চঞ্চল, আঁখির সহিত মন্মথের আঁখি মিলিল! কি মনোমোহিনী মূর্ত্তি! মন্মথ আর একবার সে প্রতিমা দর্শনের লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না, সতৃষ্ণ-নয়নে লোলুপদৃষ্টিতে উপরে চাহিলেন! নয়নে নয়নে মিলিতে না মিলিতে, সে স্থির সৌদামিনী-মূর্ত্তি নয়ন নত করিয়া ত্রাস্তে পশ্চাতে রমণীমণ্ডলে লুকাইল, চপলা যেন মেঘে মিশিয়া গেল! চপলারই মত সেই বিদ্যুৎ-বরণী বামা চঞ্চল প্রভায় দর্শকের আঁখি মন্দ ঝলসিয়া দিল! মন্মথ বড় অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। চারুর সহিত শুভদৃষ্টিটাও তেমন সুবিধামত হইল না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

"নাত জামাই, জল খাও"—বাসর ঘরে ঠাকুরাণী দিদির কথার উত্তরে মন্মথ 'খাই' বলিয়া চঞ্চলদৃষ্টিতে একবার বাসর ঘরে সমাগত বাসির-সুন্দরীদের শোভা দেখিয়া লইলেন, দেখিলেন যেন, শরতের সুনীল আকাশে তারকারাজি উঠিয়াছে, অথবা সরসীর স্বচ্ছসলিলে যেন শত শত কমলিনী ফুটিয়াছে! মন্মথের জল খাইতে বিলম্ব দেখিয়া কোন সুন্দরী বলিয়া উঠিলেন, "কনের মুখ দেখে কি নাতজামাই ক্ষিধে তেষ্ঠা সব ভুলে গেলে নাকি?" উত্তরে মন্মথ কিছু বলিতে না বলিতে, আর এক সুন্দরী বলিলেন, "ক্ষিধে তেষ্ঠা ভুল্‌তে যাবে কেন লো, নাতজামাই ভাবচে—ভোগের আগে প্রসাদ পাই কেমন করে? চারু তুই একটু প্রসাদ করে দে, নইলে নাতজামায়ের মুখে রুচবে না।" কথাটা শেষ হইতে না হইতে আর একটা কণ্ঠস্বর শুনা গেল,—"নাতজামাই আর জল খাবে কিলো—চারুর চাঁদপানা মুখ দেখে সে নিজেই জল হয়ে গেছে।" পশ্চাৎ হইতে কোন ভামিনী যেন একটু বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিলেন,—"বুড়ামাগীদের বাতিক দেখে বাঁচিনে, নাতজামাই জল হয়েছে, সেত ভালই, তোদের বায়ু বৃদ্ধি হয়েছে, তোরা গোটা কত ডুব দিয়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে নে।" এই প্রকার বাক্‌-বিতণ্ডায় বাসরের আসর খুব জমিয়া উঠিল! কিন্তু মন্মথ তখনও মৌন-অবলম্বনে। পাত্রের এই তুষ্ণীম্ভাব অবলোকনে, বাসরের চির-প্রথামত, জামাইয়ের মুখ ফুটাইবার জন্য সুন্দরীদের মধ্যে কেহ কেহ ষষ্ঠীদেবীর নিকট ফুটকড়াই মানিলেন। আর মন্মথকে ইতস্ততঃ দৃষ্টি বিক্ষেপ করিতে দেখিয়া ডাক্তার-গিন্নি, হাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাতজামাই, গো-চোরের মত অমন ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে এদিক ওদিক দেখছ্‌ কি?" মন্মথের চক্ষু সত্যই একজনের সন্ধানে ফিরিতেছিল, সেটী অবশ্য "কনে" নহে, কেন না, কনে চারু আপাদমস্তক নীল চেলিতে আবৃত হইয়া শুধু মুখখানি বাহির করিয়া পাত্রের বামদেশে কলাবৌটীর মত বসিয়াছিল, তাহার সমবয়সীরা মাঝে মাঝে ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া তাহার কাণে কাণে কি বলিতেছিল, আর হাসিয়া কুটি কুটি হইতেছিল, চারুও অবশ্য তাহাতে যোগ দিতেছিল।

বিবাহের রাত্রে বালিকা ‘কনে’ লজ্জার বড় ধার ধারে না। মন্মথের চক্ষুঃ যখন অভিসারে ধরা পড়িয়া গেল, তখন মন্মথ যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু এই অবলা-সমিতির নিকট প্রবল প্রতাপান্বিত পুরুষ-বংশীবতংস মন্মথ একেবারে বোকা বনিয়া যাইতে প্রস্তুত ছিলেন না, কাজেই ডাক্তারগিন্নির পাল্‌টা গাহিলেন; বলিলেন, "এখানে ব্যবসায়ের কোন সুযোগ হয় কি না, তাই দেখিতেছিলাম।" ডাক্তারগিন্নি বিদ্রূপটা গায়ে মাখিলেন না, কথাটা ফিরাইয়া দিলেন; বলিলেন, “ভাই, তোমার মুখ পোড়ানই সার হ’লো, সীতা উদ্ধার হ’লো না, মিছে তোমার কষ্ট ক’রে আসা, এখানে সে ব্যবসায়ের কেউ নেই, তুমি এখন পথ দেখ।" এইরূপে কথা কাটাকাটি বাধিয়া গেল। বাসরের খোলা বড় তপ্ত হইয়া উঠিল, মন্মথের মুখে খই ফুটিতে লাগিল, দু’টা একটা তপ্ত ছিটে সুন্দরীগণের গায়েও পড়িল। সুন্দরীগণ এতক্ষণে বুঝিলেন, ফুটকলাই মানাটা বাজে খরচ হইয়াছে। এইখানে বলিয়া রাখি, বাসরের এই ঠাকুরাণী দিদিরা সকলেই কিছু আসল ‘ঠান্‌দি’ নন। ইহার মধ্যে নকলও আছেন; আছেন কেন, নকলই অধিক। অনেক শ্বশ্রূসম্পর্কীয়া ঠাকুরাণী ও কেহ বা বৈষ্ণব-বৌ, কেহ বামুণ দিদি, কেহ সরকার-গিন্নি নামে ছদ্মবেশে ঠাকুরাণী দিদির দলে মিশিয়াছেন। বিস্তারিত পরিচয় দিব কি? পাঠিকা মহাশয়েরা কি বলেন? না—আর অপ্রতিভ করিয়া কাজ নাই। তবে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইলেই হইল।

সিন্ধু এতক্ষণ পশ্চাতে ডাক্তারগিন্নি প্রভৃতি মহারথিবৃন্দের অন্তরালে বসিয়া, ঠাকুরাণী দিদিদের “কবির লড়াই” শুনিতেছিল। ডাক্তারগিন্নি কিন্তু এতক্ষণের পর তাহাকে আসরে নামিবার জন্য “ছুটে পটে” ধরিয়া বসিলেন। সিন্ধু কিন্তু ঠাকুরাণী দিদির কথা রাখিতে পারিল না। এত লোকের সম্মুখে বাচালতা প্রকাশ করা সিন্ধুর কাজ নয়। বিশেষ ছদ্মবেশী অনেক গুরুজন সেখানে বসিয়া আছেন। ডাক্তারগিন্নি তবু ছাড়েন না— “সিন্ধু, তোর হ’লো ভগিনীপতি—বোনাই। তা আবার যে সে বোনাই নয় লো, সোদ্দর বোনাই, তুই কি না আছিস চুপ্‌ চাপ্‌! তা হ’লে আমাদের কি গরজ, আমরা কেন বাসর জেগে, মুখ ব্যথা করে মরি। “একেই বলে, যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়া পড়শির ঘুম নেই।" সিন্ধু বুঝি ডাক্তারগিন্নির কাণে

কাণে কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে ঠাকুরাণী দিদির দলের কে এক-জন বলিয়া উঠিলেন, "হচ্চে তোমাতে আর নাতজামায়ে পাল্টা-পাল্টি, যার নাম ষাঁড়ে ষাঁড়ে যুদ্ধ, এর মধ্যে গিয়ে সিন্ধু কি ক'রবে বল?" বাসর-গৃহে আর একটা হাসির তরঙ্গ বহিয়া গেল। সিন্ধুর মধুর অধরেও মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল। সেই মৃদু হাস্যে সিন্ধুর প্রফুল্ল মুখ-কমলের উপর যেন জ্যোৎস্না খেলিয়া গেল। বিস্মিত মন্মথ দেখিলেন, এই সেই মূর্ত্তি! শুভ-দৃষ্টির সময়ে, এই স্বর্ণ-প্রতিমার বিকীর্ণ জ্যোতিঃই মন্মথের হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া দিয়াছিল। আর এতক্ষণ ইহারই অন্বেষণে মন্মথের চঞ্চল চক্ষুঃ ইতস্ততঃ ধাইতেছিল। ওই যে মধুমাসের পুষ্পিতা লতা, ওই যে বৈশাখের মুকুলিতা আম্রশাখা, ওই যে হেমন্তের কার্ত্তিকী রাকাবৎ অথবা ততোধিক মনোহর রূপ-মাধুরী, সে কি সিন্ধুর? যে রূপ দেহে ধরে না, ভাদ্রের ভরা গঙ্গার মত যে রূপ উছলি উছলি পড়িতেছে, সে রূপের অধিকারিণী কি তবে মন্মথের ঠাকুর-ঝি সিন্ধু! হায়,—এই সিন্ধুর সহিতই মন্মথের বিবাহের কথা হইয়াছিল। মন্মথ তখন কেন সে বিবাহে সম্মত হয় নাই! চারু সুন্দরী বটে, কিন্তু সিন্ধুর কাছে কি? পূর্ণিমার পূর্ণ-শশধরের মাধুরী-মুগ্ধনয়নে কি দ্বিতীয়ার ক্ষীণচন্দ্রের ম্লান শোভা ধরে? চারু যে শুধু কুসুম-কলিকা, সে রূপ ফুটে ফুটে ফুটে না, আর সিন্ধু যেন বসোরার প্রস্ফুটিত গোলাপ! রূপ-রস-গন্ধে মন্মথের মত্ত মন-ভৃঙ্গ তাহা হইতে উঠে উঠে উঠে না!

মন্মথ ভাবিতেছেন, কেন আমি "ভাঙ্গিনু মঙ্গলঘট নিজ পদাঘাতে!" এদিকে ডাক্তারগিন্নি কিন্তু বলিয়াই চলিয়াছেন,—"সিন্ধু, তোর কি আজ চুপ ক'রে থাকা ভাল দেখায় না? আজ যে তোর পাথরে পাঁচ কিল, খোরায় এক লাথি! তোর যে আজ পতিতে পতিতে ধূল পরিমাণ।" সিন্ধুর সই বলিয়া উঠিল, "দেখনহাসির ও আবার কি কথা! পতির ধূল পরিমাণ কি গো?" ডাক্তারগিন্নি বলিলেন, "কেন, এক নম্বর নিজের পতি, দুয়ের নম্বর ভগিনীপতি, জানিসই ত, ভগিনীপতি হ'লো নিজপতি।" ডাক্তার-গিন্নির বাড়াবাড়ি দেখিয়া ব্রীড়াবনত মুখে সিন্ধু বাসরগৃহ ত্যাগ করিল, তার সইও সঙ্গে সঙ্গে উঠিল, কিন্তু যাইবার সময় ডাক্তার-গিন্নিকে এক খোঁচা দিয়া গেল; বলিল, "দেখনহাসিদের বুঝি ঐ নিয়ম।"

সিন্ধুর শাপে বর হইল। কত দিনের পর, আজ স্বামী আসিয়াছেন, তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য এতক্ষণ সিন্ধুর মনটা আকুলি ব্যাকুলি করিতেছিল—"চঞ্চল চরণ দুটি, যেন যেতে চায় ছুটি", কিন্তু লজ্জা আসিয়া বাধা দিতেছিল—পাছে কেহ বিদ্রূপ করে। এখন সিন্ধু বড় ফাঁকি দিয়া পলাইল, শাপে বর হইল!

* * * * * * *

আহারের জন্য মন্মথের ডাক পড়িল। আহার করিতে করিতে মন্মথ অন্য অন্য কথা-প্রসঙ্গে সিন্ধুর কথা তুলিয়া বাল্য-বন্ধু প্রভাতকে বলিলেন,—"ভাই, তোমারই জিত।" প্রভাত সহাস্যে উত্তর দিলেন,—"কেন? আর আমার চেয়ে তোমারই বা হার হ'লো কিসে?" মন্মথ—"এই ধানে, আর তুষে!"

* * * * * * *

"ছি! ও আবার কি কথা", প্রভাতের আলিঙ্গনাবদ্ধা সিন্ধু ঈষৎ কোপকুটিল-কটাক্ষে তাঁহার কি একটা কথার উত্তরে বলিল, "ছি! ও আবার কি কথা, ও সব ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না কিন্তু।" "ঠাট্টা নয় সিন্ধু, সত্যই তোমার রূপ মন্মথের চক্ষে বড় ধরেছে। সে তাই আমাকে বল্‌ছিল,—তবে শেষ কথাটা আমার বলা বটে।" বলিয়া প্রভাত সিন্ধুর মুখ চুম্বন করিলেন। উভয়তঃ আলিঙ্গন কিছু গাঢ় হইল। কিন্তু সহসা যেন কোথা হইতে দম্পতির সাদা মনে একটা বিষাদের ক্ষণিক ছায়া পড়িল!

* * * *

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মন্মথ বিবাহের প্রায় এক বৎসর পরে শ্বশুর বাড়ী আসিয়াছেন। কিন্তু চারু আজও ছেলেমানুষ। তাকে 'ধরে বেঁধে' মন্মথের ঘরে দিয়া আসিতে হয়। মন্মথ, চারুকে কথা কহাইবার জন্য কত চেষ্টা করেন, চারু কিন্তু কলাবৌটির মত এক হাত ঘোম্‌টা টেনে, 'গুটিসুটি' হ'য়ে, বিছানায়

এক পাশে জড়ের মত পড়ে থাকে! মন্মথ কত ডাকে, কত সাধে, কত অভিমান করে, কখনও রাগও করে, কিন্তু চারু ফিরে চায় না! কত হা'হুতাশ, কত দীর্ঘশ্বাস, নিষ্ঠুর চারু তবু কথা কয় না! চারুর মা ও খুড়ি, দুই একদিন 'আড়ি' পাতিয়া, জামাই বেচারার এই দুর্দ্দশা দেখিলেন। চারুর এই ব্যবহারে জামাই পাছে সত্যই বিরক্ত হন, মা ও খুড়ির এই এক আশঙ্কা জন্মিল; তাই চারুকে কোনরূপে 'জাগান' দিয়া, 'রাতারাতি' যুবতীভাবাপন্ন করিবার জন্য তাঁহাদের বিশেষ চেষ্টা পড়িয়া গেল। চারুকে তাঁরা কখনও বকিতেন, কখনও ভয়, কখনও বা লোভ দেখাইতেন, কিন্তু কেমন 'একগুয়ে' মেয়ে চারু, সে সব কথা সে কাণেই তুলিত না! এজন্য চারুকে এক আধ দিন মার কাছে একটু বেশী রকম লাঞ্ছিতও হইতে হয়; কিন্তু তবু চারু বাগ মানিল না। কিছুতেই কিছু হইল না দেখিয়া, মা ও খুড়ি, হারি মানিলেন। ইতিমধ্যে চারুর দিদি সিন্ধু শ্বশুরবাটী হইতে আসিল। সিন্ধু আসিলে তার মা ও খুড়ি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন; সিন্ধুকে বলিলেন, "আমরা ত চারুকে 'এঁটে উঠ'তে পাল্লেম না, এখন বাছা, তুই যা পারিস কর্। চারু ত তোর কথা শোনে, তুই কেন রাত্রে তাকে সঙ্গে করে মন্মথের ঘরে নিয়ে যাস্নে?" ইত্যাদি।

পিতা মানসিংহ কর্ত্তৃক সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত জগৎসিংহ যেমন উল্লাসে, গর্ব্বে, স্বীয় রণপাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য প্রাণপণে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, সিন্ধুও তেমনই এই ব্যাপারে কৃতিত্ব দেখাইতে, আপনার সমস্ত কৌশল, সমস্ত প্রয়াস নিয়োজিত করিল।

সিন্ধু এখন প্রতিরাত্রে চারুকে মন্মথের ঘরে দিয়া আসে, নানারূপ কথাবার্ত্তায় চারুর মুখ ফুটাইতে ও লজ্জা ভাঙ্গিতে চেষ্টা করে। মন্মথ এক দিন তাস খেলিবার কথা তুলিল; সিন্ধু দেখিল, পরামর্শটা মন্দ নয়, এই উপায়ে, মন্মথের সহিত চারুর ভাবটা সহজে হইতে পারিবে; কেন না, সে জানিত, চারু খেলা তেমন জানুক না জানুক, খেলিতে কিন্তু তার ভারি উৎসাহ। তা হ'লে কি হয়, চারু ত সহজে মন্মথের সঙ্গে খেলিতে 'রাজি' হয় না। "বরের সঙ্গে আবার খেলা, ছি! দিদির যেমন কাজ!" কিন্তু দিদি যে কিছুতেই ছাড়ে না, একে দিদির বকুনি, তাতে মায়ের অপমানের ভয়,

চারু কি মুস্কিলেই পড়েছে গা! চারু মনে মনে মা দুর্গা, কালী, কত দেবতাকেই মানে, "কবে ও তাদের বাড়ী থেকে যাবে", কিন্তু কেমন নিষ্ঠুর দেবতা, তার মিনতি কেহ শুনে না। শেষ আর কি করে, দুই একদিন দেখিয়া," চারু অগত্যা খেলিতে স্বীকৃত হইল, কিন্তু ঘোমটা কিছুতেই কমাইল না। দিদি চলিয়া গেলে, চারুর আর খেলা হইত না, কাজেই সিন্ধুকে বসিয়া থাকিতে হইত। বাজী শেষ হওয়া পর্য্যন্ত সব দিন চারুর ধৈর্য্য থাকিত না! সে খেলিতে খেলিতে প্রায়ই ঘুমাইয়া পড়িত। মন্মথের অনুরোধে সিন্ধু সে বাজীটা শেষ না করিয়া যাইতে পারিত না। রাত্রির এই বন্দোবস্তে কিন্তু সিন্ধুর উদ্দেশ্য সফল হইল না, চারুর মুখ ফুটিল না। দিদি চলিয়া গেলেই আবার যে চারু সেই চারু! বিশেষতঃ চারু মধ্যে মধ্যে প্রায়ই সন্ধ্যা হইতে না হইতে ঘুমাইয়া পড়িত। কাজেই দিনমানেও চারুকে মন্মথের ঘরে আনিবার বন্দোবস্ত করিতে হইল। চারু অনেক কান্নাকাটি আপত্তি করিল, কিন্তু কে তার কথা শুনে বল? শেষ দু'পুর বেলাতেও চারুকে দিদির সঙ্গে ঘরে আসিতে হইত, কিন্তু সে দিদির আঁচল ছাড়িত না! দিদিকে মাঝে রাখিয়াই কোন দিন 'দেখা বিন্তি', কোন দিন বা 'গোলাম-চোর' খেলা হইত। বিন্তিখেলায়, মন্মথ ইচ্ছা করিয়া মাঝে মাঝে খেলার নিয়ম ভাঙ্গিত; চারুর সেটা অসহ্য হইত, সে নিজে মুখ ফুটিয়া মন্মথকে কিছু বলিতে পারিত না বটে, কিন্তু দিদিকে তখনই কাণে কাণে বলিত—"ও কি! অমন কেন?" আবার, গোলাম-চোরে, মন্মথ প্রায়ই সাধ করিয়া "গোলাম-চোর" হইত। চারুর তাতে ভারি আনন্দ, ভারি উৎসাহ। সে সময়, চারুর অজ্ঞাতে, তার ঘোম্‌টা একটু সরিয়া যাইত, কোন দিন হয় ত সেই মুহূর্ত্তে মন্মথের সহিত, তার "চোকোচোকি" হইয়া যাইত, মন্মথের চক্ষে হাসি ফুটিয়া উঠিত। সে হাসি যেন "হেরে গিয়ে হেসে চাওয়া।" চারু কিন্তু তাহাতে বড় অপ্রতিভ হইত। লজ্জায় মুখ নামাইত! অঙ্গুলিস্পর্শে লজ্জাবতী লতা যেমন "গুটিসুটি" হইয়া যায়, চারু তেমনই জড়সড় হইয়া পড়িত, কোন দিন বা পলাইয়া যাইত। বেশী পীড়াপীড়ি ভাল নয় বলিয়া, সিন্ধুও তাহাতে আর আপত্তি করিত না। চারু চলিয়া আসিলেও সিন্ধু মন্মথের সহিত গল্প করিত। তবে প্রায়ই সিন্ধুর দুই একজন 'সমবয়সী' বা

দুই একজন ঠাকরুণ দিদি, সে সময়ে আসিয়া জুটিতেন; নানা রকমের কথাবার্ত্তা, হাসি তামাসা চলিত। মন্মথ বেশ মিষ্টি মিষ্টি মজার মজার গল্প করিতে পারিত; সে গল্প শুনিতে সিন্ধুর বড় ভাল লাগিত। ক্রমে মন্মথের সহিত তাসখেলা ও গল্প করা সিন্ধুর একটা নেশা হইয়া দাঁড়াইল! মন্মথ যদি আহারান্তে দৈবাৎ বাহিরে যাইত, সিন্ধু অমনি মন্মথকে ডাকাইতে পাঠাইত। আসিতে বিলম্ব হইলে, অভিমান করিত। মন্মথ শীঘ্রই ইহা বুঝিল; বুঝিয়া কি জানি কেন, ইচ্ছা করিয়া মাঝে মাঝে আসিতে বিলম্ব করিত। শেষ আবার সাধিয়া ঠাকুরঝির অভিমান ভাঙ্গাইত! কে জানে, এ খেলা খেলিয়া কি লাভ? সরলা সিন্ধু অত শত বুঝিত না, সে অকপটে মন্মথকে বিশ্বাস করিত; মন্মথ যেন তার 'সমবয়সী'। এইরূপে আমোদে আহ্লাদে, হাসি গল্পে দিন কাটিতে লাগিল। এইরূপে মন্মথের প্রতি সিন্ধুর স্নেহ ও বন্ধুত্ব গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইল। সিন্ধু চারুকে ধরিয়া দিবার জন্য জাল বিস্তার করিয়াছিল, এখন ঊর্ণনাভের মত, সে জালে আপনিই জড়িত হইতে লাগিল!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

"কলিকাতা"; নং বেচু চাটুর্য্যের লেন।
২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১।

"সিন্ধু!

"কয় দিন তোমার চিঠিপত্র পাইতেছি না কেন? ভাল আছ ত? বাড়ী হইতে প্রসন্নপুর যাইবার পূর্ব্বে লিখিয়াছিলে, 'সেখানে গিয়া খুব ঘন ঘন পত্র দিব।' কিন্তু এ দুই সপ্তাহ মধ্যে, কেবলমাত্র একখানি চিঠি দিয়াছ, এরই নাম, 'যেবা রোগী ছিল বসে, বৈদ্যে শোয়ালে এসে।'

"তোমার পত্র পাইতে বিলম্ব হইলে যে কত অধীর হই, তা ত তুমি জান? জানিয়াও যে ইচ্ছা করিয়া বিলম্ব করিবে, এ বিশ্বাস ত হয় না! তাই এত ভাবনা।

"শুনিলাম, জামাইষষ্ঠীতে মন্মথ ভায়া তোমাদের ওখানে আসিয়াছেন। চারুকে ত কত দিন দেখি নাই। সে কত বড়টি হয়েছে? মন্মথের সঙ্গে বেশ কথাবার্ত্তা কয় ত?

"সিন্ধু, চাঁর বছর আগে, তুমিও তখন তোমার বোন্‌টীর মত ছিলে, সে দিন মনে পড়ে কি? সে সব কথা মনে হ'লে বোধ হয় এখন তুমি খুব লজ্জিত হও, কিন্তু আমার পক্ষে এখন সে স্মৃতি বড় মধুর! তাই ব'লে আবার তোমাকে পাকাগুটি কাঁচিয়ে বস্‌তে বলিনে, কেন না, সে দিন আর ফির্‌বে না বলেই সে সব স্মৃতি এত মধুর মনে হয়। আবার তেমনি ক'রে, তোমায় ভালবাসার পাঠশালে হাতে খড়ি দিয়ে, অক্ষরপরিচয় করাতে হ'বে, সে আশঙ্কাটা যদি থাকৃত, তবে হয় ত, তার নামেও চম্‌কে উঠতাম। কিন্তু সে ভয় আর নেই, এখন ত তোমার 'গুরুমারা বিদ্যা!'

"তা সে কথা থাক্। আজকাল বোধ হয় তোমরা খুব আমোদে আছ? তা বেশ। কিন্তু দেখো, যেন নূতন আমোদ পেয়ে, পুরানোদের একেবারে ভুলো না। শাস্ত্রের বিধিটা যেন মনে থাকে,—'সেবকান্ন পুরাতনঃ।'

"এখন, তামাসা থাক্। সত্যই তোমার পত্রের জন্য পথ চেয়ে আছি। কেমন আছ? আমি অমনই বেঁচে আছি! এখন বিদায়। ইতি—

"তোমারই প্রভাত।"

চিঠিখানি যে সিন্ধুর স্বামীর, তা আর আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের বলিতে হইবে না।

সিন্ধু পত্রখানি পড়িয়া কি ভাবিতে ভাবিতে উপরের ঘরে যাইতেছিল। চিঠিখানি তখনও হাতে। সেই সময় মন্মথও নীচে নামিতেছিল, সিঁড়ির ঘরে উভয়ের দেখা হইল। মন্মথ হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "ও কার চিঠি ঠাকুরঝি?" "কই, কারু নয়" বলিয়া, একটু হাসিয়া সিন্ধু চিঠিখানি হাতের মুঠায় লুকাইল। মন্মথের প্রথমে যে সন্দেহটুকু ছিল, এখন তাহা দূর হইল। সে আবার হাসিতে হাসিতে বলিল, 'চিঠি দেখাবে বলেছিলে যে, দেখাও।' সিন্ধু, "না না, সে চিঠি নয়," বলিয়া পাশ কাটাইতেছিল, মন্মথ পথ আটকাইল, বলিল, 'চিঠি দেখাও, নইলে কিন্তু ছাড়ব না।' সিন্ধু চিঠির খানিকটা বাহির করিয়া হাত দূরে রাখিয়া বলিল, "এই দেখ।" মন্মথ ক্ষিপ্রহস্তে চিঠিখানি

লইতে গেল, সিন্ধু সেই অবকাশে পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু পারিল না, মন্মথ তার হাত ধরিল! সহসা সিন্ধুর হাসি তামাসা সব বন্ধ হইয়া গেল। সে প্রফুল্ল মুখখানি গম্ভীর হইয়া উঠিল, খুব বিরক্তি ও দৃঢ়তার সহিত সিন্ধু বলিয়া ফেলিল, "ও কি মন্মথ, হাত ছাড়।" মন্মথ অপ্রতিভ হইয়া, তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

মন্মথ সিন্ধুকে হাস্যময়ী চপলপ্রকৃতিই জানিত, বুঝি তাই এতটা সাহস করিয়াছিল; আজ, সেই চপলার ক্ষণিক প্রভাবে, সে একেবারে স্তম্ভিত হইল!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

মন্মথ যখন বাহিরের ঘরে একাকী থাকিত, তখন ছোট ছোট বালক-বালিকার দল বড় মজা পাইয়া যাইত। কেহ একটা বটের পাতায় কতকগুলি ধূলা, দু'খানা খোলামকুঁচি, হ'লো বা গোটাকত তেলাকুচা আনিয়া বলিত, "মন্মথ বাবু, খাও।" কেহ বলিত, 'টুমি নাকি চারু ডিডির নাম করেছ? ওহো! বৌএর নাম করেছ, সব্বাইকে বলে ডেব।' কেহ বা মন্মথের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিত, "টোমায় চারু ডিডি ডাকৃচে।" মন্মথ ইহাদিগকে এক আধবার যে তাড়া তুড়ি না দিত, তা নয়; কিন্তু আসলে সে বিরক্ত হইত না; বরং মাঝে মাঝে সেই ছেলেখেলায় যোগ দিত। মধুর রসের সম্বন্ধ না হইলে বুঝি এতটা মধুর ভাবের প্রবাহ বয় না।

এই সব বালক-বালিকার পশ্চাতে আর এক দল বালিকা থাকিত। তাহারা বাহিরে আসিবার পথে, সদর দরজা ভেজাইয়া, তাহার ফাঁকে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া উকি দিয়া সব দেখিত। আর মাঝে মাঝে হাতছানি দিয়া, সেই ছোটদলকে ডাকিয়া, নূতন নূতন তামাসা শিখাইয়া দিত। মন্মথের সহিত চোকোচোকি হইলেই "ওলো দেখেছে লো" বলিয়া ঝম ঝম্ রবে সেই বালিকার দল অন্দরের দিকে ছুটিয়া যাইত। আবার টিপ টিপি আসিত, হাসিত, পলাইত। ইহারা চারুর অনেকটা সমবয়সী। মন্মথ অন্য দিন এ সব

বেশ উপভোগ করিত। আজ ইহারা অনেকক্ষণ ছুটাছুটি, লাফালাফি করিল, কিন্তু মন্মথ সে দিকে বড় মনোযোগ দিল না। তখন সেই "গৃহ-হারা আনন্দের দল" যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া চলিয়া গেল। মন্মথ অন্যমনস্কভাবে একখানি ইজি-চেয়ারে শুইয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু ঘুম আসিল না। মনটা বড় চঞ্চল। মুদ্রিতচক্ষুঃ মন্মথ, কি একটা ভাবিতেছিল, এমন সময় শুনিল,—

"ঘুমুলে ঘুমুলে পাণ খেলে না,
পাণ সেজেছি এলাচ-দানা;
ছোট ব'লে কি মনে ধরে না,
ছোট কি কখন বড় হবে না!"

মন্মথ হাসিয়া চক্ষুঃ মেলিল। দেখিল, সম্মুখে একটি কৃত্রিম পাণ হাতে দাঁড়াইয়া তাহার অষ্টমবর্ষীয়া শ্যালিকা হেম। মন্মথ তাহাকে যেই হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেল, সে অমনি পাণটি মন্মথের গায়ে ছুড়িয়া হাসিতে হাসিতে একদৌড়ে পলাইয়া গেল। এমন সময় কে ডাকিল, "জামাই বাবু! 'দিদিমণি' আপনাকে ডাক্‌চে।" সে ডাক বীণাধ্বনির মত মন্মথের কাণে বাজিল। মন্মথ তখন কাঁচপোকায় আকৃষ্ট আরসুলার মত ঝির অনুসরণ করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

মধ্যাহ্নের সেই ঘটনার পর মন্মথ বাহিরে চলিয়া গেলে, সিন্ধু মনে মনে বড় অপ্রতিভ হইল। আজ সহসা কোথা হইতে তার এতটা দৃঢ়তা আসিল। সে নিজেই একটু বিস্মিত হইল। ভাবিল, কাজটা ভাল হয় নাই। ভগিনীপতি হাত ধরেছিল, তা সেটা আর এমন দোষের কি হয়েছে? সবারই ভগিনীপতি এমন ধরে! তখন আর কোন কথা সিন্ধুর হৃদয়ে ঠাঁই পাইল না, শুধু মনে হইল, তার এই ব্যবহারে না জানি মন্মথ কত কষ্টই পেয়েছে! ছি! সিন্ধু অপ্রতিভ হইয়া আপন মনে জিভ কাটিল।

সে দিন বৈকালে অন্যদিনের চেয়ে 'সকাল সকাল' মন্মথের জল-খাবারের ডাক পড়িল। অন্যদিন মন্মথের শাশুড়ী তাকে জলখাবার দেন,

আজ সিন্ধু জলখাবার দিতেছে। সিন্ধু জলখাবার দিল বটে, কিন্তু মুখ তুলিয়া মন্মথের দিকে চাহিতে পারিল না। নতমুখে বলিল, "মন্মথ, জল খাও।" মন্মথ প্রথম ভাবিয়াছিল, বুঝি আজ জলখাবারে কিছু ভেল আছে, কিন্তু মধ্যাহ্নের ঘটনায় সে সন্দেহ তার মনে স্থান পাইল না। সে সিন্ধুর মুখের দিকে চাহিল, দেখিল, তখনও সিন্ধু অবনতমুখী। মন্মথ মুগ্ধনেত্রে দেখিল, সেই অপ্রতিভ অপ্রতিভ মুখে আজ এক অপূর্ব্ব শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে। মন্মথ ব্যাপার বুঝিল, মনে মনে হাসিয়া ডাকিল, "ঠাকুর-ঝি!" সিন্ধু মুখ তুলিল, চারিচক্ষে মিলিবামাত্র উভয়েই হাসিয়া ফেলিল। লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। সেখানে আর কেহ নাই দেখিয়া, মন্মথ সপ্রতিভভাবে বলিল, "কই—চিঠি!" চিঠি সিন্ধুর আঁচলে বাঁধা ছিল, একটু হাসিয়া চিঠিখানি খুলিয়া সিন্ধু মন্মথের হাতে দিল। মন্মথ পত্রখানা আগা'গোড়া পড়িল, পড়িয়া ফিরাইয়া দিল। কিন্তু একটা তামাসার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না,—তামাসার মাত্রাটা কিছু বেশী চড়িল—"যাও ছি! অমন কল্লে কিন্তু আর আ'সব না", বলিয়া গমনোদ্যতা সিন্ধু যেন ঈষৎ কোপকুটিল-কটাক্ষে মন্মথের দিকে চাহিল। সে অপাঙ্গে বুঝি একটু হাসিও খেলিয়াছিল।—তখন 'যাই' বলিয়া হাসিতে হাসিতে মন্মথও বাহিরে গেল।

মন্মথ কাল বাড়ী যাইবে, আজ রাত্রে তাই খেলার ধুমটা একটু বেশী। "অনেক রাত হয়েছে, এখন যাই" বলিয়া সিন্ধু একবার উঠিতে চাহিতেছিল, কিন্তু মন্মথ বাধা দিল; বলিল, "রাত আর কই হয়েছে, আর আজকের রাত বই ত নয়।" সিন্ধু ভাবিল, তা বটে। সরলা বালিকা আবার খেলিতে বসিল। চারুর তখন অর্দ্ধেক রাত্রি।

ঝম্ ঝম্ ঝম্, বাহিরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। গুরু গুরু দুরু দুরু গভীর গর্জ্জনে মেঘ গর্জ্জিতেছে। সেই "ঘন ঘোরা বাদল" নিশীথে, সিন্ধু আর মন্মথ খেলিতেছিল, গল্প করিতেছিল, হাসিতেছিল, আর সিন্ধু মনে মনে মন্মথের রসিকতার প্রশংসা করিতেছিল। রাত্রি গভীর, সংসার সুষুপ্ত, কেবল মন্মথ আর সিন্ধু খেলায়, গল্পে, হাসিতে বিভোর! সেই বিভোর অবস্থায় খেলিতে খেলিতে কি একটা কারণে তাস লইয়া উভয়ের মতদ্বৈধ ঘটিল। ক্রমে তাস লইয়া টানাটানি, কাড়াকাড়ি, হাসাহাসি আরম্ভ হইল। সহসা

গৃহমধ্যে প্রচণ্ডবেগে একটি 'দমকা' বাতাস প্রবেশ করিল। প্রদীপ নিবিয়া গেল! গৃহের সঙ্গে সঙ্গে একটি জীবনও অন্ধকার হইয়া গেল!

ধীরে, অতি ধীরে, সিন্ধু সে গৃহ ত্যাগ করিল। উদ্বেলিতকণ্ঠে মন্মথ ডাকিল, 'ঠাকুর-ঝি!' সিন্ধু ফিরিল না। বুঝি সে কথা তার কাণে গেল না।

মন্মথ পরদিন অতি প্রত্যূষে বাড়ী চলিয়া গেল। চারু আবার হাসিয়া খেলিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। কয়েদী যেমন জেলখানা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সিন্ধুাতাসে আপনাকে স্বচ্ছন্দ মনে করে, সে তেমনি হাঁফ ছাড়িয়া বঁ "তুা কিন্তু বড় বিমর্ষ। এই বিষণ্ণ ভাব দেখিয়া লেখাপড়া-জানা এক নবীনা ঠা্ আদিদি, সিন্ধুর মুখের কাছে হাত নাড়িয়া সুর করিয়া বলিলেন,—

"সোণার নাতিনী, এমন যে কেনি
হইলি বাউরি পারা,
সদাই রোদন, বিরস বদন,
না বুঝি কেমন ধারা।
যমুনা যাইতে, কদম্ব-তলাতে,
দেখিলি যে কোন জনে?
যুবতী-জনের ধরম-নাশক
বসি থাকে সেইখানে।"

সিন্ধুর সমবয়স্কারাও বিদ্রূপ করিতে ছাড়িল না। কেহ বলিত, "নে ভাই সিন্ধু, তোর আর বাড়াবাড়ি দেখে বাঁচিনে। ভগিনীপতি তো সবারই আছে লো!" কেহ বা সুর আর একটু চড়াইল, "কি লো, মন্মথ গিয়ে তুই যে একেবারে ব'য়ে গেলি। লোকের বর বিদেশে গেলেও ত এমন হয় না।"

সিন্ধুর মাও ক্রমে সিন্ধুর এ পরিবর্তন লক্ষ্য করিলেন; বলিলেন, "সিন্ধু! তোর হলো কি? দিন রাত অমন করে কি ভাবিস বলতো, দিন্কের দিন যে শুকিয়ে উঠলি।"

সিন্ধু কোন উত্তর দিত না। শুধু নতমুখে, কাঁদ কাঁদ হইয়া থাকিত। কোন দিন বা অন্যের অলক্ষ্যে কাঁদিয়া ফেলিত।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

আজ অনেক দিনের পর প্রভাত সিন্ধুর হস্তাক্ষর পাইলেন, সাগ্রহে তাড়াতাড়ি পত্র খুলিলেন—

"প্রিয়তম!

"সত্যই এ পোড়ারমুখী তোমায় ভুলিয়াছিল, নহিলে এমন গুরুতর পাপ করিবে কেন! আমার এ অপরাধের ক্ষমা নাই! তোমাকে অনেক কথা লিখিব বলিয়া এ পত্র লিখিতে বসিয়াছিলাম কিন্তু আজ আর তা পারিলাম না। সকল কথা পরে লিখিব। কেমন আছ? ইতি—

"পাপিষ্ঠা

"সিন্ধুবালা"

"একি এ! একি আমার সিন্ধুর পত্র! হাঁ, সিন্ধুর হস্তাক্ষরই ত বটে।" প্রভাত একবার দুইবার তিনবার কতবার পত্র পড়িলেন, কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। প্রভাতের মনে কত রকমের অনুমান উঠিতে লাগিল, শেষ পত্র বন্ধ করিয়া প্রভাত ভাবিলেন, ছি! আমি কি পাগল! কিন্তু—কিন্তু সিন্ধু এমন করিয়া পত্র লিখিল কেন? আবার ঐ কথা! শেষ প্রভাত সিদ্ধান্ত করিলেন, আমোদে মত্ত হইয়া আমায় পত্র দিতে বিলম্ব করিয়াছে বলিয়া সিন্ধু নিজেই বড় অপ্রতিভ হইয়াছে। তাই অনুতাপ করিয়া এমনতর লিখিয়াছে। এ সামান্য কথাটাও এতক্ষণ বুঝিতে পারি নাই। আমি কি নির্ব্বোধ! প্রভাত ফেরত ডাকে উত্তর দিলেন—

"আমার সিন্ধু!

"পত্র দিতে বিলম্ব হইয়াছে, তা এত লজ্জা কি? আর এই সামান্য কারণে এমন অপরাধীর মত পত্র দিয়াছ কেন? এ ত অতি তুচ্ছ কথা, যদি প্রকৃতই তুমি না বুঝিয়া কোন গুরুতর অপরাধ করিয়া, এমনই করিয়া অনুতপ্ত হইয়া, আমায় জানাও, আমি তোমার সে প্রথম অপরাধও মার্জ্জনা করিতে প্রস্তুত। যা হোক, এর জন্য এত অপ্রতিভ হবার কারণ নাই। তুমি যে আমায় ভুলিতে পার না, তা আমি বেশ জানি। কিন্তু এমন করে পত্র দিতে আর দেরী করোনা! লক্ষ্মী আমার!

'অন্য অন্য কথার উত্তর দাও নাই কেন ?

"চারুদের কেমন ভাব হলো জানিতে উৎসুক আছি। মন্মথ এখন কোথায় ?"

"কেমন আছ। আমি ছুটীর চেষ্টায় আছি। ছুটী পেলেই তোমায় আনিতে যাইব। আর যদি এর মধ্যে অন্য সুযোগ পাই, তবে ততদিনও অপেক্ষা করিতে হবে না। এ সুখবরের জন্য কি খেতে দেবে দাও। ইতি।"

সিন্ধু যথাসময়ে এ পত্রের উত্তর দিল—

"তুমি আমার অপরাধ যত সামান্য মনে করিতেছ, আসলে তা নয়। পাপিষ্ঠা আমি, তোমার নিকট অবিশ্বাসিনী হইয়াছি, আমায় লইয়া তুমি কি আর সুখী হইতে পারিবে ? একদিন বিস্তারিত জানাইব। আজ থাক।'

পত্র পড়িয়া প্রভাতের মাথা ঘুরিয়া গেল। মিছে কথা এ, সিন্ধু পাপিষ্ঠা, সিন্ধু অবিশ্বাসিনী, অসম্ভব এ।—ঘন ঘন পত্র দিব বলিয়া এত বিলম্ব করিয়াছে, তাই এ কথা! সিন্ধুর কি ছেলেমানুষি! কি সরলতা! "আমায় লইয়া আর কি সুখী হইতে পারিবে ?"—ছেরেপ পাগলামি! কিন্তু তবু প্রভাতের মনের মেঘ কাটিল না। কি এক অজ্ঞাত অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাঁর প্রাণ "আকুলি ব্যাকুলি" করিতেছিল। "সিন্ধু! সিন্ধু! আমার সিন্ধু! সিন্ধু কি পাগল হইল!"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

প্রভাত ছুটী লইয়া সিন্ধুর কাছে যাওয়াই স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু পরদিন তাঁর শ্বশুরের পত্রে জানিলেন, মন্মথ শ্বশুরবাটী হইয়া শীঘ্র কলিকাতায় পড়িতে আসিতেছে। এই সুযোগে সিন্ধুকে আনা সহজে হইবে মনে করিয়া, প্রভাত তখনই শ্বশুরকে পত্র লিখিলেন। উত্তরে শ্বশুরও দিন স্থির করিয়া জানাইলেন। স্থিরীকৃত দিনে যথাসময়ে প্রভাত ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। মন্মথও গাড়ী হইতে নামিল। সিন্ধু কই ? প্রভাত অতিমাত্র আগ্রহে, মন্মথকে শুধাইলেন, "তোমার ঠাকুর-ঝি!" মন্মথ সংক্ষেপে বলিল,

"তাঁর আসা হইল না।" "কেন?"—"ঠিক বলিতে পারি না।" "সব ভাল ত।"—"হাঁ।"

এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে প্রভাতের উদ্বেগ বাড়িল মাত্র। উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে বাসায় ফিরিলেন। বাসায় ফিরিয়া দেখেন, সিন্ধুর একখানি চিঠি। সিন্ধু শুধু লিখিয়াছে, "প্রিয়তম! একবার এস।" প্রভাতের আসন টলিল, সাহেবকে বলিয়া কহিয়া কোনরূপে পাঁচদিনের ছুটী লইয়া সেইদিনই সন্ধ্যার ট্রেণে, "নদী যথা ধায় সিন্ধুপানে", প্রভাত সিন্ধুর উদ্দেশে ছুটিলেন। পরদিন বেলা দশটার পর প্রভাত প্রসন্নপুরে পৌছিলেন। যাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রভাত এত ব্যাকুল, সম্মুখে ওই যে সৌধ, ওই সৌধে প্রভাতের সেই প্রেমপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত। তবে আজ সেই সুখের মন্দিরে প্রবেশ করিতে প্রভাতের মন সহসা এত কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে কেন? দূর হইতে চারু কিরূপে প্রভাতকে দেখিতে পাইয়াছিল। সে অমনি "প্রভাতবাবু এসেছে গো!" বলিতে বলিতে ছুটিয়া বাড়ীর মধ্যে গেল। সিন্ধুর সহিত চোখাচোখি হইয়া চারু একমুখ হাসিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে শাসাইল, "দিদি আজ!" বোধ হয় চারুর তখন মনে হইতেছিল, "দিদি আমায় এবার বড় জ্বালানই জ্বালিয়েছে, এখন আমিও তেমনি দাদ তুল্‌বো," তাই সংক্ষেপে এই শাসন-বাক্য প্রয়োগ করিল। চারুর এই বালিকা-সুলভ কল্পনা বুঝিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল, প্রভাতের আগমন-সংবাদে সিন্ধুর মুখও প্রফুল্ল হইয়াছিল, কিন্তু "দিদি আজ!" এই কথায় কি জানি সহসা কেন সে প্রফুল্ল মুখকমল নিমেষে শুকাইয়া উঠিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

আজ বহু দিনের বিচ্ছেদের পর দম্পতির মিলন হইল। সিন্ধুর সেই বিষাদ-মলিন মূর্ত্তি দেখিয়া প্রভাত ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সিন্ধু, এমন দেখচি কেন?" সিন্ধু কিছু বলিল না, স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া একটু বিষাদের হাসি হাসিল। ছিন্ন মেঘের কোলে সৌদামিনী যেমন হাসে, অনেক

দিনের পর সিন্ধু আজ তেমনই হাসিল। কিন্তু তখনই আবার জলভরা মেঘের মত গম্ভীর হইয়া উঠিল। প্রভাত আগ্রহভরে সিন্ধুকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছিলেন, সিন্ধু সরিয়া গেল; বলিল, "আমায় ছুঁওনা," প্রভাত একটু হাসিয়া সিন্ধুকে কোলে টানিয়া লইলেন। তখন সিন্ধুর হৃদয়ে তুমুল ঝটিকা বহিতেছিল। প্রভাত আবার স্নেহ-কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল সিন্ধু, এমন দেখ্‌চি কেন? অমন করে, অপরাধীর মত চিঠি পত্রই বা লিখ্‌তে কেন? আর মন্মথের সঙ্গে যেতেই বা আপত্তি কল্লে কেন?" প্রভাত দারুণ আগ্রহে, একবারেই তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সিন্ধু আত্মহারা হইয়া, স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া, কাঁদিল। পদস্খলিত ভক্ত যেমন ইষ্টদেবের সম্মুখে লুঠাইয়া লুঠাইয়া কাঁদে, পথহারা শিশু যেমন জননীর কোল পাইয়া মুখ লুকাইয়া কাঁদে, সিন্ধু তেমনি করিয়া কাঁদিল।

তার পর প্রকৃতিস্থ হইয়া, স্বামীর বাহুপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া সিন্ধু সরিয়া দাঁড়াইল। দৃঢ়কণ্ঠে বলিল,—'তবে শোন।'

সিন্ধুর সেই উন্মাদিনী মূর্ত্তি দেখিয়া প্রভাত মহাভীত হইয়াছিলেন, সমস্ত আলোচনা করিয়া, ইহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, নিশ্চয় কি এক অঘটন ঘটিয়াছে। "আর বল্‌তে হবে না—সিন্ধু আমি বুঝেছি", বলিয়া প্রভাত তাড়াতাড়ি আবার সিন্ধুকে বুকে ধরিলেন।

"না—বুঝ নাই। বুঝিলে এ কালসাপিনীকে এমন আদর করিয়া বুকে লইতে না।" বলিয়া সিন্ধু আবার কাঁদিয়া ফেলিল;—"যা বুঝি নাই, তা আর বুঝে কাজ নাই। সিন্ধু! তুমি যে অপরাধই করে থাক, আমি তোমায় ক্ষমা করিলাম।" সিন্ধু প্রভাতের নিষেধ শুনিল না। তবু বলিল,—"না, শোন!" 'না, সিন্ধু না, শুনে আর কাজ নাই! এস, অন্য কথা কই' বলিয়া প্রভাত সিন্ধুর সেই রোদন-লোহিত, অশ্রুসিক্ত, অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি ধরিয়া বার বার চুম্বন করিলেন; তার পর, অতি যত্নে চোখের জল মুছাইয়া, সিন্ধুকে আপনার পাশে বসাইলেন। অতি সাবধানে অন্য প্রসঙ্গ পাড়িলেন, ক্রমে সিন্ধুও সে সকল প্রসঙ্গে যোগ দিতে আরম্ভ করিল, তাহার সেই মলিন মুখ আবার যেন প্রফুল্ল হইল, নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ আবার জ্বলিয়া উঠিল! প্রভাত বুঝিলেন, তবে বুঝি বা এখনকার মেঘ কাটিয়া গেল!

এমন সময় কে ডাকিল, "সিন্ধু, চুল বাঁধবে এস!" "তবে যাই" বলিয়া সিন্ধু উঠিল, প্রভাতও উঠিয়া বিদায়-চুম্বন দিলেন; এবং সিন্ধুও প্রতিচুম্বন করিল; সে চুম্বন বড় তপ্ত, বড় গাঢ়! কিন্তু সহসা কি মনে করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, তার পর স্বামীর পানে চাহিয়া, চাহিয়া, সিন্ধু চলিয়া গেল।

প্রভাত বাহিরে যাইতেছিলেন, সিঁড়ির ঘরে একটু দাঁড়াইয়া শুনিলেন, পাশের ঘরে চেনা গলায় কে বলিতেছে, "সিন্ধু, আয় লো, তোর মাথা বেঁধে দি"; ইহার পরের চরণ প্রভাতের জানা ছিল, প্রভাত একটু হাসিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে পথে, তাঁহার অঙ্গুলিস্থিত হীরকাঙ্গুরীয়ের প্রতি দৃষ্টি পড়িল—এই যে হীরক, ইহা খাঁটি না নকল? ভাঙ্গিয়া দেখিলে হয় না? নকল হয় হোক, ভাঙ্গিয়া কি লাভ? আমি ত জানি, ইহা খাঁটি। তবে সে ভুল ভাঙ্গিয়া কাজ কি? প্রভাত এই ভাবিয়া আবার আপনার মন দৃঢ় করিলেন।

আর সিন্ধু! সিন্ধু চুল বাঁধিতে বাঁধিতে বড় অন্যমনস্ক হইতেছে। সেই নবীনা ঠাকুরুণদিদি, চুল বাঁধিয়া দিতে দিতে অনেক রঙ্গ করিতেছিলেন—কিন্তু সিন্ধু আজ সে হাসি তামাসায় যোগ দিতে পারিতেছে না! সিন্ধু যেন কি এক গভীর চিন্তায় মগ্ন! চুল বাঁধা শেষ হইলে, ঠাকুরুণদিদি,—

"সাদা মনে কালো ফিতের বেঁধে দিলাম চুল,
স্বামীর পায়ে মনটি রেখো হয় না যেন ভুল!"

বলিয়া বেশ করিয়া মুখখানি মুছাইয়া দিয়া, একটি 'টিপ' পরাইয়া, সিন্ধুর মুখে চুমো খাইলেন। সিন্ধু বিষাদের হাসি হাসিল। ঠাকুরুণ দিদি বুঝিয়া গেলেন,—

"মুখের হাসি চাপ্‌লে কি হয়—
প্রাণের হাসি চোখে খেলে!"

বিংশ পরিচ্ছেদ।

সেই দিন সন্ধ্যার পর চারু তার ঘরে গিয়া দেখে—সর্ব্বনাশ! দেখিয়াই সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওগো! তোমরা শীগ্‌গির এসো গো, দিদি কেমন কচ্চে!" চীৎকার শুনিয়া সকলে ছুটিয়া আসিলেন, দেখিলেন,

ছিন্নকণ্ঠ পক্ষিণীর মত সিন্ধু ভূমিশয্যায় পড়িয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। সিন্ধু কখন যে তার ঠাকুরমার কৌটা হইতে আফিং চুরি করিয়া খাইয়াছে, তাহা কেহ জানে না। "ওমা আমার কি হলো গো!" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মা সিন্ধুর মাথা কোলে তুলিয়া লইলেন। তখন ডাক্তার ডাকিতে লোক ছুটিল। সিন্ধু একবার কাতরদৃষ্টিতে মার দিকে চাহিয়া চোখের জল ফেলিল। তার পর চারুকে লক্ষ্য করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "একবার ডাক্ চারু, একবার ডাক্!"

* * * * *

ধীরে ধীরে প্রভাত গৃহে প্রবেশ করিলেন। সকলে উঠিয়া গেল। উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে প্রভাত বলিলেন, "সিন্ধু! সিন্ধু! এ কি?" "বলি" বলিয়া সিন্ধু একখানি চিঠি প্রভাতের হাতে দিল, তার পর প্রভাতের পায়ে মাথা রাখিয়া, কাতরকণ্ঠে বলিল, "আমার বুকে দিন রাত নরকের আগুন জ্বল্‌ছে, এ পাপের বোঝা আমি আর বহিতে পারি নে,—তুমি আমায় ক্ষমা করে চরণে ঠাঁই দিলে, কিন্তু আমার জ্বালা নিভিল কই? আর বলিতে পারি না, চিঠিতে সব রইলো, আমার দশা যেন সবাই শোনে।"

মনের আবেগে, বহু কষ্টে, সিন্ধু এই কয়টী কথা বলিল; তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল, বলি বলি করিয়াও আর কিছু বলিতে পারিল না। সিন্ধু তখন নির্ব্বাক্ হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। বৃন্তভ্রষ্ট ফুল্ল কুসুম যেমন কর্দ্দমস্পৃষ্ট হইয়া আকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া শুকাইয়া যায়, ধরণীলুণ্ঠিতা সিন্ধুও তেমনই কাতরদৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে শুকাইয়া উঠিতেছিল।

ক্রমে মৃত্যুযন্ত্রণায় সিন্ধুর চক্ষুঃ মুদিয়া আসিল। উদ্দামহৃদয়ে আকুল-কণ্ঠে প্রভাত ডাকিল, "সিন্ধু!" বাণবিদ্ধ হরিণী যেমন জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও বংশীরবে শিহরিয়া উঠে, স্বামীর কণ্ঠস্বরে সিন্ধু তেমনই শিহরিল! তার পর ধীরে ধীরে সেই বিবেকবিক্ষত, অনুতপ্ত প্রাণ দেহবিমুক্ত হইল।

(সম্পূর্ণ।)*

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

* শেষের কয়েকটী পরিচ্ছেদ বহুদিন পূর্ব্বে "সাহিত্যে" "ইন্দু" নামে প্রকাশিত হইয়াছিল।
লেখক।

কণিকা।*

অনেক দিনের পরে, এবার রবীন্দ্রবাবুর একখানি কবিতা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। কবির ভক্তেরা তাঁহার প্রসাদলাভে বঞ্চিত হইয়া বড়ই ক্ষুণ্ণ ছিলেন, সম্প্রতি, কবি তাঁহাদের সে আক্ষেপ দূর করিয়াছেন। তবে সে প্রসাদ "কণিকামাত্র"! কিন্তু ভক্তের যে ইহাই যথেষ্ট!

প্রবন্ধ আরম্ভের প্রথমেই বলিয়া রাখি, সমালোচক বলিয়া খ্যাতি লইবার অথবা "কণিকার" প্রকৃত সমালোচনা করিবার স্পর্দ্ধা আমার নাই। কেবল পাঠক মহাশয়ের সহিত একাসনে বসিয়া "কণিকা"র অনেকগুলি কবিতা উপভোগ করিব, এইমাত্র সাধ! আর কেবল এই আশাতেই এ প্রবন্ধের অবতারণা!

গ্রন্থখানির আকার ক্ষুদ্র, কবিতাগুলিও ছোট ছোট। সে হিসাবে গ্রন্থের "কণিকা" নামকরণ সার্থক হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গ-সাহিত্যের এই দুর্ভিক্ষের দিনে কণিকার মূল্য নিতান্ত অল্প নহে। তা ছাড়া, আশা করি, সাহিত্যের সুদিনেও,—যদি ইহা অপেক্ষা কখন হয়,—কণিকার গৌরব কমিবে না। আর সাহিত্যের হিসাব ছাড়িয়া পয়সার হিসাবে দেখিতে গেলেও সত্যের অনুরোধে একথা বলিতে হইবে যে, এ দুর্ব্বৎসরে চারি টাকা মণ চাউলের দিনেও কণিকার আট আনা মূল্য কিছু বেশী! কিন্তু যাক্ সে সকল কথা। কণিকাসম্বন্ধে অন্যান্য কথা বলিবার পূর্ব্বে, পাঠক মহাশয়দিগকে একটী সংক্ষিপ্ত সমালোচনা উপহার দিব, মনে করিতেছি। আমার কোন বন্ধু, নামটী তাঁর পাঁচকড়ি গুপ্ত, অতিরিক্ত গম্ভীর বলিয়া সমবয়স্কমহলে তাঁর অন্য একটী নাম মিঃ আউল। আর এক দিক দিয়াও এ নামটার সার্থকতা আছে, পাঁচকড়ির পরিবর্ত্তে পেঁচো, পেঁচো স্থানে পেঁচা, তথা মিঃ আউল। বন্ধুবর পেঁচা নামে অভিহিত হইলে বড় চটিয়া যান, অজ্ঞাতে হয়ত তাঁর আস্তেনটীও গুটাইয়া আসে, কিন্তু মিঃ আউল বলিলে

* কবিতা গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। এই প্রবন্ধ কণিকা প্রকাশের অব্যবহিত পরেই লিখিত, তখন কথা প্রভৃতি প্রকাশিত হয় নাই।

বন্ধু—আমার ততটা অপমান জ্ঞান করেন না, নামটায় একটু সাহেবি গন্ধ আছে কি না! কথাটা নিতান্ত অভিনব বা অসম্ভব মনে করিবেন না। এমন বাঙ্গালী আজকাল দেখিতে পান না কি, যাঁহারা পিতৃ সম্বোধনে ইতস্ততঃ করেন, কিন্তু Fatherএ তাঁহাদের আপত্তি নাই! বাঙ্গালীর ছেলের এরূপ ইংরাজী রুচি, আজকাল একটা ফ্যাসানের মধ্যে! বাঙ্গলার সমস্তই নিন্দনীয়, বাঙ্গালীর সমস্তই দোষের, এরূপ কথা আজকাল এক শ্রেণীর বাঙ্গালীর মুখে প্রায়ই শুনিতে পাই! ইহাদিগকে আর কি বলিব, কণিকার কবির ভাষায় বলিতে হইলে,—

"কেঁচো কয় নীচ মাটী, কালো তার রূপ,
কবি তারে রাগ করে বলে চুপ চুপ!
তুমি যে মাটীর কীট, খাও তারি রস,
মাটীর নিন্দায় বাড়ে তোমার কি যশ।"

এই সব বঙ্গসন্তান মনে করেন, তাঁহারা বঙ্গভূমির ফল হইলেও আঁটির গাছের টক ফল নহেন! অথবা সে ভূমির সহিত ইহাদের আর কোন সম্বন্ধ নাই। এই সকল অকাল "কুষ্মাণ্ডে"র দুর্গতির কথা ভাবিয়াই বোধ হয় কণিকার কবি বলিয়াছেন,—

"কুষ্মাণ্ডের মনে মনে বড় অভিমান,
বাঁশের মাচাটা তার পুষ্পক বিমান!
ভুলেও মাটীর পানে তাকায় না তাই,
চন্দ্র, সূর্য্য, তারকারে করে ভাই ভাই,
নভশ্চর ব'লে তার মনের বিশ্বাস,
শূন্যপানে চেয়ে তাই ছাড়ে সে নিশ্বাস!
ভাবে শুধু মোটা এই বোঁটাখানা মোরে,
বেঁধেছে ধরার সাথে কুটুম্বিতা ডোরে!
বোঁটা যদি কাটা পড়ে তখনি পলকে,
উড়ে যাবে আপনার জ্যোতির্ম্ময় লোকে!
বোঁটা যবে কাটা গেল, বুঝিল সে খাঁটি,
সূর্য্য তার কেহ নহে, সবি তার মাটী!"

কিন্তু আমরা কথা-প্রসঙ্গে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি।—কথা হইতেছিল, আমার সেই বন্ধুর। বন্ধুটী আমার, রবিবাবুর অনুকরণে কবিতা লেখেন, কিন্তু তিনি আপনাকে কাহারও অনুচিকীর্ষু বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার বিশ্বাস, তাঁহার প্রতিভা-ভগীরথ কল্পনাবলে বাঙ্গালায় নূতন কাব্যস্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন। তাঁহার সেই অপ্রকাশিত কাব্য-গ্রন্থ "প্রতিধ্বনি" যাহা কেবল এতদিন অসহায় বন্ধুবান্ধবদের সহিষ্ণু শ্রবণ-বিবরের পীড়া জন্মাইতেছে, মুদ্রিত হইলেই সাধারণে তাঁহার পরিচয় পাইবেন। আমার এই বন্ধু কণিকা পাঠে সমালোচনা স্বরূপ যে পত্রখানি আমায় লিখিয়াছেন, তাহার কতকাংশ পাঠকবর্গকে উপহার দিবার নিমিত্তই ভূমিকা ফাঁদিয়া এত অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিলাম। পত্রের কিয়দংশ এইরূপ;—

"তুমি বোধ হয় এতদিন তোমাদের প্রিয়-কবি, শেলির শিষ্যানুশিষ্য, রবি বাবুর 'কণিকা' পড়িয়া থাকিবে! কি বুঝিলে? তুমি অবশ্য জান, আমি শান্তি-পুরের প্রসিদ্ধ 'বিবসনা পত্রিকা'য় 'রবি বাবুর রচনা ও রুচি' প্রবন্ধে রবি বাবুকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিয়াছিলাম, প্রবন্ধের নিম্নে অবশ্য আমার নাম স্বাক্ষর ছিল, রবি বাবু এতদিনে, এই অবকাশে মনের সেই ঝাল ঝাড়িয়াছেন,—

"কাণা কড়ি পিঠ তুলি, কহে টাকাটিকে,
তুমি ষোল আনা মাত্র নহ পাঁচ সিকে,
টাকা কয় আমি তাই মূল্য মোর যথা,
তোমার যা মূল্য তার ঢের বেশী কথা।"

দেখদেখি একবার তোমাদের উদার কবির কাণ্ডখানা? পাঁচকড়ির "কড়ি" লইয়াও টানাটানি! আবার সে কড়িগুলোও হলো কাণা! আর রবি বাবু নিজে কিনা পূরোপূরি ষোল আনা। কিন্তু এইখানেই কি শেষ? তোমরা আমায় মিঃ আউল বল, বন্ধুত্বের খাতিরে সেটা না হয় সহ্য করিলাম, কিন্তু রবিবাবুর ব্যবহারটা একবার দেখ দেখি!

"পেঁচা রাষ্ট্র করি দেয় পেলে কোন ছুতা,
জাননা আমার সাথে সূর্য্যের শত্রুতা।"

আমি পাঁচকড়ি গুপ্ত হ'লাম কিনা পেঁচা, আর সূর্য্য, তাহার অর্থ ত পড়িয়াই আছে, পাঁচ বৎসরের শিশুও সহজে অনুমান করিতে পারে, রবি

বাবু—স্বয়ং! এই বুঝি তোমাদের উদার কবির মহত্ব, আর ইহারই নাম বুঝি কবিত্ব!—মহত্বটা ভাল করিয়া দেখিবে?—

"সূর্য্য দুঃখ করি কহে, নিন্দা শুনি স্বীয়,
কি করিলে হ'ব আমি সকলের প্রিয়?
বিধি কহে, ছাড় তবে এ সৌর-সমাজ,
দু-চারি জনেরে লয়ে কর ক্ষুদ্র কাজ!"

সূর্য্যনামধারী ভানুসিংহ ওরফে রবিবাবুর কথাটা শুনিলে ত! এ গ্রন্থের নাম, কণিকার পরিবর্ত্তে "অহমিকা" রাখিলেই ঠিক হইত না কি? আমার অপ্রকাশিত গ্রন্থ "প্রতিধ্বনি"কেও তিনি ছাড়েন নাই—আমাকে তাঁহার অনুকরণকারী মনে করিয়া লিখিতেছেন,—

"ধ্বনিটীরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে,
ধ্বনি কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।"

কিন্তু ইহাই শেষ নহে, তোমাকে বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না, পাঁচ ও পাঁক, শুনিতে প্রায় একই রকম, সুতরাং;—

"তুমি নীচে পাঁকে পড়ি ছড়াইছ পাঁক,
যে জন উপরে আছে তারই ত বিপাক!"

উপরে কিনা আকাশে, আকাশে থাকেন সূর্য্য অর্থাৎ রবি। আচ্ছা, ইহাতে মানহানি চলে না? আবার দেখিবে? এবার কিন্তু একেবারে চরম,—

"কে লইবে মোর কার্য্য, কহে সন্ধ্যা রবি,
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।
মাটীর প্রদীপ ছিল সে কহিল স্বামী,
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি!"

ইহার অর্থটা একটু তলাইয়া বুঝিতে হইবে—এই কয় ছত্র কবিতার ব্যপদেশে রবিবাবু বলিতেছেন, আমি বঙ্গসাহিত্যে যা করিলাম, তা আর কেহ পারিবে না, আমার মত এত বড় কবি হয় নাই, কখনও হইবে না,—এক "প্রদীপ"-প্রণেতা শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার বড়াল, তা তার ক্ষমতা আর কতটুকু। আর তার "প্রদীপ"ও ত মাটীর, কত দিনই বা টিকিবে? সুতরাং আমার অস্তের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গ-সাহিত্যের কাব্য-ক্ষেত্র অন্ধকার।

সাধ করিয়া কি বলিয়াছি, "কণিকা"ত "অহমিকা"। এই প্রকারে কণিকার অধিকাংশ কবিতাই যে বন্ধু পাঁচকড়িকে উপলক্ষ করিয়া লিখিত, এবং কতক কবিতায় রবিবাবু যে, নিজের জয়ডঙ্কা বাজাইয়াছেন, তাহা তিনি এই পত্রে, মায় নজির ও টীকা সহ প্রমাণ করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে আর অধিক উদ্ধৃত করিলাম না। আমরা কিন্তু জানি, আমার এই বন্ধুটীকে রবিবাবু জানেন না, এবং ইঁহার প্রকাশিত অপ্রকাশিত কোন রচনা পাঠ করার সৌভাগ্যই রবিবাবুর হয় নাই, তথাপি বন্ধুবরের এই ধারণা, কিন্তু কেবলই যে আমার বন্ধুবর একাই সহৃদয় কবি রবীন্দ্র বাবুর অসামান্য প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ স্বরূপ এই কণিকার কবিতাগুলির মর্ম্ম এই ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নহে, আর তাহা নহে বলিয়াই অন্য দুই চারি জন লেখক ও সমালোচক কণিকার কবিতার মর্ম্ম অন্য প্রকারে গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়াই, আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের এই মুখবন্ধে এতটা সময় অতিবাহিত করিলাম।

কণিকার এক একটী কবিতা-মুক্তা, যেন নিদাঘের দেবতার বারিবিন্দু,——

"শ্রাবণের মোটা ফোঁটা বাজিল যূথীরে,
কহিল, মরিনু হায়, কার মৃত্যু-তীরে,
বৃষ্টি কহে শুভ আমি নামি মর্ত্ত্যমাঝে,
কারে সুখরূপে লাগে কারে দুঃখ বাজে।"

কিন্তু যেখান হইতে এ সুধা-বৃষ্টি, সে মেঘের উক্তি শুনিবেন,—

"মরু কহে অধমেরে এত দাও জল,
ফিরে কিছু দিব হেন, কি আছে সম্বল?
মেঘ কহে কিছু নাহি চাই মরুভূমি,
আমারে দানের সুখ দান কর তুমি।"

মেঘের স্বভাবের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইলেন,—এখন কুয়াশার কথা শুনুন;—

"কুয়াশা নিকটে থাকি তাই হেলা মোরে,
মেঘ ভায়া দূরে রন থাকেন গুমরে,

কবি কুয়াশাকে কয়, শুধু তাই নাকি,
মেঘ দেয় বৃষ্টিধারা, তুমি দাও ফাঁকি।”

হায়! আমরা আপন আপন ক্ষমতা বুঝি না, যাঁহার খদ্যোতের আলোক সম্বল নাই, সেও' চন্দ্রমার সমকক্ষ হইতে চায়! মহতের সম্মান, প্রতিভার পূজা আমরা জানিনা, সকলেই স্ব স্ব প্রধান, Every one to command, but none to obey. সেই জন্যই প্রধানতঃ আমাদের এতটা অধোগতি, তাই কণিকার কবি বলিয়াছেন,—

“ছাতা বলে ধিক্ ধিক্ মাথা মহাশয়,
এ অন্যায় অবিচার আমারে না সয়,
তুমি যাবে হাটে বাটে দিব্য অকাতরে,
রৌদ্র বৃষ্টি যত কিছু সব আমা'পরে।
তুমি যদি ছাতা হ'তে কি করিতে দাদা,
মাথা কয়, বুঝিতাম মাথার মর্য্যাদা;
বুঝিতাম তার গুণে পরিপূর্ণ ধরা,
মোর একমাত্র গুণ তারে রক্ষা করা।”

এদিকে আমাদের প্রতিভা পূজার প্রবৃত্তি নাই, অন্যদিকে ঘরে ঘরে পরস্পরে চুলাচুলি, কিসে অন্যকে খাট করিয়া নিজে বড় হইব, এই চিন্তাতেই ব্যস্ত। আত্মশক্রতায় দেশ উচ্ছন্ন যাইতেছে, তাই কবি ইঙ্গিতে বলিতেছেন,—

“খোঁপা আর এলোচুলে বাধিল বচসা,
জুটিল পাড়ার লোক দেখিতে তামাসা।
খোঁপা কয়, এলোচুল কি তোমার ছিরি!
এলো কয়, খোঁপা তুমি রাখ বাবুগিরি।
খোঁপা কহে, টাক ধরে হই তবে খুসি,
তুমি যেন কাটা পড়, এলো কয় রুষি!
কবি মাঝে পড়ি বলে, মনে ভেবে দেখ,
দুজনেই এক তোরা দুজনেই এক।
খোঁপা গেলে চুল যায়. চুলে যদি টাক,
খোঁপা তবে কোথা রবে, তব জয়ঢাক!"

কণিকার ছত্রে ছত্রে এই প্রকার সহজ সরল ভাষায় সুনীতি ও সুশিক্ষার সমাবেশ। কবি কিন্তু "বেত হাতে গুরুমহাশয়ের" মত শিক্ষা দিতে বসেন নাই। যে সকল দোষ আমাদের মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে, সেগুলি—পরনিন্দা, অনধিকার চর্চ্চা. অকৃতজ্ঞতা, অবিনয়, গর্ব্ব, নীচতা প্রভৃতির প্রবৃত্তি, যাহাতে নিবৃত্তি হয়, যাহাতে হৃদয়নিহিত নষ্টপ্রায় সৎবৃত্তির অঙ্কুরগুলি আবার সঞ্জীবিত হইয়া উঠে, কবি তাহার জন্য প্রকৃতির কেমন সুন্দর সুন্দর ছবি আমাদের চক্ষে ধরিয়াছেন! সে সৌন্দর্য্যে মনঃ মুগ্ধ হয়, হৃদয় উচ্চতা লাভ করে। নীচতা, অন্ততঃ ক্ষণেকের জন্যও ঘুচিয়া যায়। এই দেখুন না,—

"নারদ কহিল আসি, হে ধরণী দেবি,
তব নিন্দা করে নর, তব অন্ন সেবি" ?
বলে মাটি, বলে ধুলি, বলে জড় স্থূল,
তোমারে মলিন বলে, অকৃতজ্ঞকুল!
বন্ধ কর অন্ন জল, মুখ হোক চূণ,
ধুলা মাটি কি জিনিষ বাছারা বুঝুন।
ধরণী কহিল হাসি, বালাই বালাই,
ওরা কি আমার তুল্য শোধ লব তাই?
ওদের নিন্দায় মোরে লাগিবে না দাগ,
ওরা যে মরিবে যদি আমি করি রাগ।"

মহতের মহত্ত্ব ত এইখানে, কিন্তু সে কথা কয়জনে বুঝি! কয়জনের মনেই বা এ আদর্শ উদয় হয়? আবার,—

"বাবলা শাখারে বলে আম্রশাখা ভাই,
উনানে পুড়িয়া তুমি কেন হও ছাই?
হায় হায় সখি তব ভাগ্য কি কঠোর।
বাবলার শাখা বলে, দুঃখ নাহি মোর,
বাঁচিয়া সফল তুমি ওলো চ্যুতলতা,
নিজেরে করিয়া ভস্ম মোর সফলতা!"

আত্মত্যাগের কি সহজ আদর্শ! কথাটা যেন হৃদয়ের সঙ্গে গাঁথিয়া যায়।

অন্যত্র—

"চন্দ্র কহে বিশ্বে আলো দিয়েছি ছড়ায়ে,
কলঙ্ক যা আছে, তাহা আছে মোর গায়ে!"

মহতের এ উক্তির উদারতা কয়জনে উপলব্ধি করেন? তাহা হইলে কি আর নর্টনকে লইয়া এত গোলযোগ হয়? না বড় লোকের চরিত্রের ছিদ্রান্বেষণে লোকের প্রবৃত্তি জন্মে?

নম্রতার আদর্শ দেখিবেন?—

"কহিল কঞ্চির বেড়া, ও গো পিতামহ,
বাঁশ-বন নুয়ে কেন পড় অহরহ?
আমরা তোমারি বংশে ছোট ছোট ডাল,
তবু মাথা উচু করে থাকি চিরকাল!
বাঁশ কহে, ভেদ তাই ছোটতে বড়তে,
নত হই, ছোট নাহি হই কোনমতে!"

ভরসা করি, কঞ্চি-প্রকৃতি উদ্ধত মানব ইহা হইতে কিছু শিক্ষা-লাভ করিতে পারিবেন। প্রকৃত গুণী ও গুণজ্ঞের ব্যবহার শুনুন,—

"তপন-উদয়ে হবে মহিমার ক্ষয়,
তবু প্রভাতের চাঁদ শান্তমুখে কয়,
অপেক্ষা করিয়া আছি অস্তসিন্ধুতীরে,
প্রণাম করিয়া যাব, উদিত রবিরে।"

এই স্বত্বপ্রধান দিনে, কবে আমরা কবির উক্তির মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিব? কবে গুণীর নিকট নত হইতে শিখিব! কবির সহৃদয়তার দৃষ্টান্ত দেখিতে চান?—

"প্রাচীরের ছিদ্রে এক নাম গোত্রহীন,
ফুটিয়াছে ছোটফুল, অতিশয় দীন,
ধিক্ ধিক্ করে তারে, কাননে সবাই,
সূর্য্য উঠি বলে তারে ভাল আছ ভাই?"

এইরূপ মহত্বের আদর্শে কণিকা পূর্ণ, কোন্‌টী রাখিয়া কোন্‌টী উদ্ধৃত করিব? মহত্বের উক্তি আরও দুই একটী উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতেছি না।

ভিক্ষা ও উপার্জ্জন।

"বসুমতী! কেন তুমি এতই কৃপণা,
কত খোঁড়াখুঁড়ি করি পাই শস্যকণা,
দিতে যদি হয় দে মা প্রসন্ন সহাস,
কেন মা মাথার ঘাম পায়েতে বহাস?
বিনা চাষে শস্য দিলে কি তাহাতে ক্ষতি?
শুনিয়া ঈষৎ হাসি, কন বসুমতী,
আমার গৌরব তাহে সামান্যই বাড়ে,
তোমার গৌরব তাহে একেবারে ছাড়ে!"

এ সকল কবিতার টীকা অনাবশ্যক! আমরা সময়ে সময়ে মহতের মহত্ব অনুভব করিতে পারি না! মহতের আত্মত্যাগে, অনেক সময় বিজ্ঞতার হাসি হাসিয়া সেটা বেকুবিরই নামান্তর মনে করি, কবি তাহাও লক্ষ্য করিয়াছেন,—

"বীর কহে, হে সংসার, হায়রে পৃথিবী,
ভাবিস্‌নে মোরে কিছু ভুলাইয়া নিবি!
আমি যাহা দিই, তাহা দিই জেনে শুনে,
ফাকি দিয়া যা পেতিস্‌ তার শতগুণে।"

ক্রমে আমাদের প্রবন্ধ বড় দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে, কণিকার কবিতাও আর উদ্ধৃত করিতে সাহস হয় না, তাই অনিচ্ছা-সত্ত্বেও আমাদিগকে হাত গুটাইয়া আনিতে হইতেছে! সংক্ষেপে কণিকার সহিত হীরক-খণ্ডের তুলনা করা যাইতে পারে। গ্রন্থখানি অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু হীরকের মত উজ্জ্বল, আবার হীরকেরই মত বহুমূল্য, ধারেও হীরকের তুল্য, স্পর্শমাত্রে ক পৃষ্ঠে দাগ বসে, কোথাও বা কাটিয়াও যায়।

"ধূলা কয়, কলঙ্কিত সবার শুভ্রতা,
সেটা কি তোমার নয় কলঙ্কের কথা!"

আবার—

"কত বড় আমি! কহে নকল হীরাটি,
তাইত সন্দেহ করি, নহ ঠিক খাঁটি!"

অন্যত্র—

"শক্তি যার নাই নিজে বড় হইবারে,
বড়কে করিতে ছোট তাই কি সে পারে?

কণিকার কবিতার সৌন্দর্য্যের ছায়ায় যে কেবল এই প্রকারের নীতিই প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা নহে, যিনি সৌন্দর্যের সার, সেই সারাৎসারের তত্ত্বও ইহাতে পাওয়া যায়।—

"রজনী গোপনে বনে ডালপালা ভরে,
কুঁড়িগুলি ফুটাইয়া নিজে যায় সরে।
ফুল জাগি বলে, মোরা প্রভাতের ফুল,
মুখর প্রভাত বলে, নাহি তাহে ভুল!"

আর এক ভাবুকও গাহিয়াছেন,—

"তোমার কার্য্য তুমি কর মা,
লোকে বলে করি আমি?"

কে যে আমাদের চালাইতেছেন, তাহা আমরা জানি না! কাহার বংশীরবে আমরা আকৃষ্ট, মুগ্ধ, কে সে বাঁশী বাজায়? কবিও বলিতেছেন,—

"বাঁশী বলে, মোর কিছু নাহিক গৌরব!
কেবল ফুঁয়ের জোরে মোর কলরব।
ফুঁ কহিল, আমি ফাঁকি শুধু হাওয়া খানি।
যে জন বাজায় তারে কেহ নাহি জানি।"

'ভক্তিভাজন' কবিতায় বলিতেছেন,—

"রথযাত্রা লোকারণ্য মহাধূমধাম,
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে, আমি দেব, রথ ভাবে, আমি,
মূর্ত্তি ভাবে, আমি দেব, হাসে অন্তর্যামী।"

এই চারি ছত্রে কবি বক্তব্য বিষয়টী কেমন সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন! কিন্তু এইখানে একটী সন্দেহ থাকিয়া যায়, ভক্ত ত সেই আদি রহস্যজ্ঞানেই প্রণাম করিতেছে, আর তাহা ত অন্তর্যামী বুঝিতেছেন তাহা হইলেই যে ভক্তের বাঞ্ছা সফল হইল! অন্তর্যামী যদি আমার

কামনা বুঝিয়া হাসিলেন, তবে আমি সাকারবাদীই হই, আর শালগ্রাম শিলাকেই ভগবানজ্ঞানে ভক্তি করি, আমার মুক্তির জন্য ত আমার অথবা নিরাকারবাদীর চিন্তার কারণ নাই!

শিশুর 'খেলানা' হইতে কবি কত উচ্চ ভাব সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন দেখুন,—

"ভাবে শিশু বড় হলো শুধু যাবে কেনা,
বাজার উজাড় করি সমস্ত খেলেনা,
বড় হ'লে খেলা যত ঢেলা বলি মানে,
দুই হাত তুলে চায় ধনজন-পানে!
আরো বড় হবে নাকি যবে অবহেলে,
ধরার খেলার হাট হেসে যাবে ফেলে।"

কবির আশা কি সফল হইবে না! এমন সোজা ভাষায় অল্প কথায়, এমন বড় কথা বঙ্গ-সাহিত্যে আর শুনিয়াছি, মনে হয় না।

তার পর মৃত্যুর কথা। "মৃত্যু" কথাটা শুনিলেই বুকটা যেন কেমন করিয়া উঠে! "মনে কর, শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর" এবং "কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে" ইত্যাদি সঙ্গীতে মৃত্যুর মূর্ত্তি আরও বিভীষিকাময় করিয়া তুলিয়াছে, মৃত্যু-নামেও প্রাণটা যেন চমকিয়া যায়, মৃত্যুর কিন্তু রূপ কি প্রকার ফুটিয়াছে দেখুন,—

১—মৃত্যু।

"ওগো মৃত্যু, তুমি যদি হ'তে শূন্যময়,
মুহূর্ত্তে নিখিল তবে, হয়ে যেত লয়!
তুমি পরিপূর্ণ রূপ, তব বক্ষঃ কোলে
জগৎ শিশুর মত নিত্য কাল দোলে!"

অন্যত্র—

২—চির নবীনতা।

"দিনান্তের মুখ চুম্বি রাত্রি ধীরে কয়,
আমি মৃত্যু তোর মাতা, নাহি মোরে ভয়!